কাশীধাম

প্রথম-সংস্করণ

শ্রীশ্যামলাল দেবশর্ম্মা
প্রকাশক।

কলিকাতা।

সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

যিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, যাঁহার পদ-কোকনদ
আমার তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী, যাঁহার কাশীবাস
ও কাশী-দর্শনের জন্যই আমি সুপবিত্র
বারাণসীর নানাস্থান পরিদর্শন করিতে
পুনঃপুনঃ অবসর পাইয়াছিলাম, সেই
পরম আরাধ্যা অন্নপূর্ণা-সদৃশা
স্নেহ-করুণাময়ী জননী-দেবীর
শ্রীচরণপঙ্কজে আমার এই
অকিঞ্চিৎকর অঞ্জলি
"কাশীধাম"
ভক্তি-সহকারে সমর্পিত।

কাশীধাম,
সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

মন্মথনাথ

প্রকাশকের নিবেদন

-:০:-

কয়েক বৎসর অতীত হইল "কাশীধামের" কতিপয় অংশ "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়, অনন্তর কাশীবাসী ও কাশী-দর্শনাভিলাষী অনেকের বিশেষ অনুরোধে ইহা এক্ষণে তাহা হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে পরিণত হইল।

পুরাকাল হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশবাসী বহু মহানুভব ব্যক্তি কাশী তথা বারাণসী-সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকেও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর দৃষ্টিতে সুপবিত্র কাশীর ঐতিহাসিক সৌন্দর্য্য লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই বিস্তৃত ভাবে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই, বিশেষ বাঙ্গালা-ভাষায় কাশী-সম্বন্ধে আদৌ কোন প্রামাণ্য পুস্তক না থাকায়, মদীয় অগ্রজ-মহাশয় প্রায় ১৫।১৬ বৎসর কাল যাবৎ অনেক সময় কাশীতে অবস্থান করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহাই সাধ্যমতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের সেই পুণ্যতীর্থ কাশীর দর্শনার্থী জন-সাধারণ ইহা পাঠে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ করিলে, আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

কালনা।
সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্যামলাল দেবশর্ম্মা
প্রকাশক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

-:o:-

"কাশীধাম" প্রথম-সংস্করণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইলে বহু লোকের আগ্রহ সত্ত্বেও এতদিনে পুনর্ম্মুদ্রণের সুযোগ করিতে পারি নাই। সাংসারিক নানা বাধাবিঘ্ন ও দুর্ঘটনাই এতাধিক বিলম্বের কারণ। যাহাহউক বাবা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মায়ের কৃপায় ইহার দ্বিতীয়-সংস্করণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজজী ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া ও যথেষ্ট পরিশ্রম-সহকারে ইহাতে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতাপূর্ণ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধার্ম্মিক নানা বিষয় নূতন ভাবে সংযোজনপূর্ব্বক ইহার বিপুল উন্নতিবিধান করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশক্রমে এই সংস্করণে কাশীধামের একখানি আধুনিক মানচিত্র ও বহু নূতন নূতন চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার এইরূপ স্নেহ-কৃপায় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি সজ্জন পাঠকগণ ইহা পাঠে নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত ও আনন্দলাভ করিবেন। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে, প্রথম সংস্করণের অপেক্ষা এই বারে 'কাশীধামের' আকার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত এবং নূতন চিত্রাদি প্রদানে যথেষ্ট ব্যয়াধিক্য হইলেও, সাধারণের সুবিধাকল্পে ইহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অতি সামান্য মাত্রই বর্দ্ধিত হইল।

কলিকাতা।
১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

বিনীত—
প্রকাশক।

সূচীপত্র

বিষয়।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাশীর উত্তর ও দক্ষিণাদি যাত্রা।

কাশীর পশ্চিম দক্ষিণ যাত্রা।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চিত্র-সূচী

বর্ত্তমান কাশীর সাধারণ দৃশ্য।

সচিত্র

কাশীধাম।

প্রথম অধ্যায়।

কাশীধাম ভারতের অতি প্রাচীন, পবিত্র মহা পুণ্য-আশ্রয়স্থান এ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, বিধি নিয়ম নিত্য কর্ম্মে পতিত হইয়াও কাশীর সেই মহামহিমান্বিতা চির-শান্তিপদা সুশীতলবাহিনী গঙ্গা, সেই পবিত্র মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা-দশাশ্বমেধ, সেই ত্রিভুবন-বিশ্রুত সত্যনিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশান, বাল্মীকি ব্যাস-বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতির সেই অলৌকিক সাধন-সামর্থ্য, যাহা কাশীর প্রতি অণু পরমাণুর সহিত চিরদিন বিজড়িত, যাহা জগতের সকল জাতির ইতিহাসেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য, চিত্ত হইতে এখনও তাঁহারা বিচ্যুত করিতে পারেন নাই তাই এখনও যাঁহার ধমনীতে আর্য্যশোণিত অতি ক্ষীণভাবেও প্রবাহিত আছে, তাঁহার হৃদয় জীবনে একবার মাত্র কাশীদর্শন ও অন্তে কাশীতলবাসিনী গঙ্গার পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে অভিলাষ করে; তাই এখনও ভারতের প্রান্তচতুষ্টয়ের প্রত্যেক প্রদেশ, প্রতি পল্লী, প্রতি গৃহ হইতে দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া কাশীবাস করিতেছে কাশীদর্শন করিয়া চলিয়া

যাইতেছে। এমন পবিত্র তীর্থ জগতে আর বুঝি নাই! কেবল সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী হিন্দুদিগেরই যে ইহা প্রধানতম তীর্থ, তাহা নহে, ইহা এসিয়া মহাপ্রদেশ বা প্রাচ্যভূখণ্ডের একমাত্র মহাতীর্থ বলিয়া জগৎ প্রসিদ্ধ। চীন, জাপান, তিব্বত ও সিংহল প্রভৃতি দেশবাসী পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে সেইরূপ গবেষণা ও অত্যন্ত আকাঙ্খার স্থান। মহামুনি শাক্যসিংহ ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার সুপবিত্র মত এইস্থান হইতেই প্রথম প্রচার করেন। কাশীর প্রাচীনত্ব ও ইহার চিরপ্রতিষ্ঠিত একছত্র-ধর্ম্ম-সিংহাসন সম্পর্কীয় নানা প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না। তবে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত আভাষ সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

কাশী কত দিনের ?

কাশী কত দিনের, এই প্রশ্ন লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশের কত পুরাতত্ত্ববিদ্ কত কথাই যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি আর্য্যবংশসম্ভূত, বেদাদি সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাহাকে এই অনাদি লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরের অতি প্রীতিপ্রদ কৈলাসসম আদি তীর্থ এই 'কাশীধাম' যে দিনের, তাহা আর বলিতে না—কত সত্য ত্রেতা দ্বাপর কাল, কত কল্প কত মহাকল্প যে, ভাগিরথীর ঐ কল-কল-প্রবাহিত তরঙ্গমালার ন্যায় কাশীর পবিত্র বক্ষ বিধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার কত যুগ যুগান্তর চির [illegible] প্রবাহিত হইবে, কে তাহার [illegible]

করিবে? সেই অনাদি ও অনন্ত কালভৈরবই 'কোতোয়াল'-রূপে কাশীর চির-শান্তিপ্রদ অন্নপূর্ণার সিংহদ্বারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালের গণনা করিবেন। এ সংবাদ তোমার আমার রাখিবার সাধ্য নাই, সামর্থ্যও নাই। আবার যাহাদের এ বিশ্বাস নাই, জগতের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই যাহারা খৃষ্ট জন্মের দুই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারাও কাশীর জন্মকাল অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পণ্ডিতবর রেভাঃ ডাঃ এম, এ, শেরিং 'বেনারস-লণ্ডন-মিশনারী-সোসাইটীর' আচার্য্যরূপে বহুকাল কাশীবাস করিয়া সন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে "The Sacred City of the Hindus" নামক যে সুবৃহৎ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কাশীর প্রাচীনত্ব বিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "কাশী বা বেনারসের পূর্ব্ব-ইতিহাস সুদূর অতীতের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন, হিন্দুদিগের এই পবিত্র নগর গভীর অবিরোধী পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত। যখন আর্য্যগণ উত্তর ভারতের নানাস্থানে অতি ধীরে ধীরে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, বোধ হয় তখনই তাঁহাদিগের দ্বারা এই কাশী-নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। দুর্ভেদ্য কুহেলিকাচ্ছন্ন বা বা ঘনঘোর মেঘমালায় সমাবৃত বৈদিককাল বা আর্য্য-ইতিহাসের মধ্য দিয়া কাশীর সেই পুরাতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্তই দুরূহ। সে যাহাহউক ইহা যে, আর্য্যদিগের 'আর্য্য' নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রদ স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্রাদি আলোচনায় সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"এই প্রাচীন

নগর 'বেনারস' বহু পুরাতত্ত্বের আধার, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সময় সময় নানা দৈব ও রাষ্ট্রীয় দুর্ঘটনায় ইহার বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতল অতীতের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে শাক্যমুনি হইতে ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেশ জানিতে পারা যায়।"

"পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে যখন আসিরীয়, কালদীয়, বাবেলন্, টয় ও মিসর সবেমাত্র আপন আপন নবোদিত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিল, যখন রোম, গ্রীস প্রভৃতি তাহাদের জরায়ু-শয্যায় শয়িত, তাহাদের নাম গন্ধও কেহ যখন জানিতে পারে নাই, সেই প্রাচীনযুগে কাশীনগরী আপন বিদ্যা ও বৈভবে আর প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি সগর্ব অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া নিজ পুর[illegible] ত্বের পরিচয় দিতেছিল।* এতদ্ব্যতীত কালের এই বিষ ঘাত-প্রতিঘাতে কত দেশ, কত জনপদ, কত জাতি শতাব্দী কয়েকের জন্য উত্থিত হইয়া আবার অতীতের অতল গর্ভে কোথা ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাদের চিহ্ন মাত্রও নাই; কিন্তু কাশীর— সেই অবিনশ্বর ভাব চিরদিন সমানভাবেই বিরাজিত, কাশীর ভাগ্যসূর্য্য কোন দিনই অস্ত হয় নাই, কাশীর শান্ত-স্নিগ্ধ যশঃ সৌরভ কোন কালেই মলিন হয় নাই। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বংশপরম্পরায় তাহা একভাবে চলিয়া আসিতেছে, কাশীনগরী ভারতের অধিশ্বরীরূপে চিরদিন নিজ সমান আধিপত্য বজায় করিয়া আসিতেছে, কাশী যেমন পুরাতন তেমনি চির নূতন।"

* যজুর্ব্বেদের 'শতপথ ব্রাহ্মণ' ও 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণ' উপনিষদেও কাশী একটি বিস্তৃত জনপদ ও যজ্ঞভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "বারানসী ও কাশী [illegible] নগরীর নগরকিরণ' অংশে [illegible] বহু পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মহাত্মা কেন্ সাহেবও তাঁহার 'Picturesque India' নামক গ্রন্থের ৩০২।৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আর্য্যদিগের ভারতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'বেনারস' বা কাশীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। কাশী জগতের অতি প্রাচীন সহর।"

শাক্যসিংহ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্বলাভ করনান্তর খৃঃ পূর্ব্ব ছয়শত শতাব্দীতে আত্মমত প্রচারোদ্দেশ্যে ভারতের বিধি-নিয়ম ও ধর্ম্মচক্র-পরিচালক কাশীর সিদ্ধ-সাধু ও বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হন ও প্রাচীন প্রচলিত মতের খণ্ডন করিয়া নিজমতের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন। মহামুনি বুদ্ধদেব তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদ্যপি কাশীর মধ্যে একবার তাঁহার মত কিয়ৎপরিমাণেও প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করা অতি সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। এইরূপ ভাব কেবল যে তিনিই পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, জগতের যে কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমূহ এখনও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচারীমণ্ডলীর পার্শ্বেই সেইভাবে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব অভিমত প্রচার করিয়া থাকেন। এই হেতুই হিন্দুর মন্দিরের পার্শ্বে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মোসলমানদিগের মন্দির, মঠ, গীর্জা ও মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। এইভাবেই শাক্তের প্রতি বৈষ্ণবের নিন্দাবাদ, বৈষ্ণবের প্রতি শৈবের শ্লেষোক্তি প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক ভগবান বুদ্ধ যখন আর্য্যের আচার-ভ্রষ্টতা দেখিয়া কাতর হইলেন, তখনই তিনি সাময়িকভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি-নিয়ম প্রচার করিতে

আরম্ভ করেন এবং সেই প্রচার কার্য্য কাশী হইতেই আরব্ধ হওয়ায় কাশীর সহিত তাঁহার ঐতিহাসিক জীবন জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মা কেন' বলিয়াছেন "কাশী হইতে ভগবান বুদ্ধের যে পবিত্র মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাধিক মনুষ্য-সমাজের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

উদার-হৃদয় 'কেন্' সাহেব এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি বোধ হয় জগতের সকল ধর্ম্মচক্রের আদি প্রবর্ত্তন-ভূমি এই "কাশীধাম।" এইস্থান হইতেই যেন সেই পুরাকালে সদ্ধর্ম্মের বহির্বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছিল! আমাদিগের দুর্ভাগ্য আজকাল বুদ্ধ বা তৎপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মকে, এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মপুষ্ট কতিপয় বর্ষ-নিবদ্ধ কালকেও "বৌদ্ধযুগ" বলিয়া আর্য্যের বিরাট অঙ্গ হইতে এই বৌদ্ধ-সম্পর্ককে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই যেন অনেকের ধর্ম্ম, গবেষণা বা পুরাতত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদিত হয়! বুদ্ধ যে, আর্য্যগৃহস্থেরই কৃতী সন্তান, ভারতের বৌদ্ধমাত্রই যে আর্য্যবংশসম্ভূত, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সাধনার বিধি-নিয়মও যে, আর্য্য-দর্শন ও যোগতন্ত্রাদিসম্মত, তাহারা সেকালে বর্ত্তমান সময়ের শাক্ত ও বৈষ্ণবাদির ন্যায় অতি সামান্য ভিন্নমত পরিপুষ্ট, আর্য্যাচারশিথিল ইদানীন্তন আর্য্যেরই নামান্তর মাত্র, তাহা চিন্তা করিতেও অনেকে এক্ষণে অসমর্থ। তাঁহাদের কৃত ধর্ম্মবিধি, শিল্প ও সাহিত্যাদি সৎ হউক অসৎ হউক সে সকলই আমাদের, তাহাতে নিন্দা খ্যাতি যাহা আছে, তাহাও আমাদের বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক

তাহারা সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে আসেন নাই, অথবা আচম্বিতে আকাশ হইতেও এদেশে নিপাতিত হন নাই। অপিচ তাঁহারা আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণের অতি অন্তরঙ্গ জ্ঞাতি বা কুটুম্ব ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। তাঁহারা ভারত ও ভারতের বাহিরে যে জ্ঞান, যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য মুনি-ঋষিদের বিদিত ভাবের একাংশ মাত্র।

সম্প্রতি একাধিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব আলোচনায় সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন যে, মহামতি জেসাইষ্ট বা যিশুখৃষ্টও কিয়ৎকাল কাশীধামে অবস্থান করিয়া রীতিমত আর্য্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিব্বতে অধীত বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে সনাতন ধর্ম্মের অতি সরল ও লৌকিকভাবের উদার-মতগুলিই তাঁহার স্বদেশের অনুকূল হইবে ভাবিয়া তিনি আরও কিছুদিন কাশীর কোন বৌদ্ধ-বিহারে অবস্থানপূর্ব্বক নিজ পাঠ সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধানের অনুমোদিত মন্দির বা গির্জ্জাগুলির গঠন-প্রণালী তুলনা করিলে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হইবে যে, কাশীর শিবালয়, মন্দির বা বুদ্ধগয়ার মন্দিরাদির অনুকরণেই তাহা পরিগঠিত। ইহা ব্যতীত গির্জ্জা-মন্দিরের দ্বারে বা উপরে প্রাচ্য আদর্শের অনুরূপ ঘণ্টা-রক্ষা, তাহাও সনাতন ধর্ম্ম-বিধানের যে অদ্ভুত-প্রভাব-পরিপুষ্ট সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতের বাহিরে তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলিও [illegible]

অনেকে হয়ত শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন যে, আর্য্যের বৈদিক ক্রিয়াসিদ্ধতত্ত্ব বা সাধন-প্রণালী যোগাদি শাম্ভবী-বিদ্যার আধার অতি গুহ্য তন্ত্র-শাস্ত্রের কতিপয় প্রাথমিক উপদেশ অতি প্রাচীন 'মিশরে' বা মিশ্রদেশে পুরাকালেই "তেও" ।সম্ভবতঃ তান্ত্রিক ধর্ম্ম বলিয়া শিবশক্তির উপাসনা-বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। তাই অসঙ্কোচে বলিতে হয়, ভারত বা ভারতের অনাদি ধর্ম্মপীঠ এই কাশী হইতেই সকল ধর্ম্ম উদ্ভূত বা বিস্তার লাভ করিয়াছে। আবার কালে কাশী ক্রমে সর্ব্বধর্ম্মেরই লীলাভূমিরূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছে। বাস্তবিক জগতে বোধ হয় এমন কোন ধর্ম্মই নাই যাহা কাশীতে দেখা যায় না। "কাশীর উপাসক-সম্প্রদায়" অংশে সে কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

'ফা-হিয়েন' ও 'হিউয়েন্থ-সাং' প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-চীন-পর্য্যটকদ্বয় খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৭ম শতাব্দীতে ভারতের বৌদ্ধতীর্থসমূহ পর্য্যটন করিতে আগমন করেন। তাঁহাদের লিপিবদ্ধ বর্ণনাবলী হইতে জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে কাশী ভারতের একটী প্রধান রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। তখন তাহার পরিধি প্রায় ছয়শত সাতষট্টী মাইল ছিল। সেই বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিম পার্শ্বে গঙ্গার নিকটেই কাশীরাজ্যের রাজধানী দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইলের উপর এবং প্রস্থে অনুমান এক মাইল হইবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার আনুসঙ্গিক বহুজনাকীর্ণ অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম-গুলিও সংবদ্ধ ছিল। এস্থানের জনমণ্ডলী যেমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, তাঁহাদের গৃহাদি যেরূপ বহু দুর্লভ ও মহামূল্য সামগ্রী-[illegible] সুশোভি[illegible] সৌন্দর্য্যশালী ছিল, তাঁহারাও সেরূপ সুসভ্য,

ভদ্র, অমায়িক ও মার্জ্জিতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষ যাঁহারা বিদ্যানুশীলনেই জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাঁহাদের সৌজন্য ও মহানুভবতা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। কাশী-রাজ্যের অধিবাসীমধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং অতি অল্পসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এস্থানের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ, প্রচুর শস্য-সম্ভার, ফল-ফুল ও শাক-সব্জীতে সকল ক্ষেত্রই যেন সমাচ্ছাদিত। এখানে ত্রিশটী বৌদ্ধবিহার বা মঠ প্রায় তিন সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ ছিল এবং শতাধিক হিন্দু মন্দির ও মঠে প্রায় দশ সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী পূজারী ও তাঁহাদের শিষ্য-সেবক বাস করিত। এই মন্দিরশতকের মধ্যে বারানসীর মধ্যে মাত্র কুড়িটী এবং অবশিষ্ট নিকটস্থ গ্রামের অন্তর্গত ছিল।*

মহানুভব হিউয়েন্থ-সাংএর এই বর্ণনা হইতে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীপূর্ব্বে কাশীর কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইল।

বর্ত্তমান সময়েও কাশীর অবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সৌন্দর্য্য-সমন্বিত। এখনও গঙ্গাবক্ষ হইতে দেখিলে কাশীনগরী প্রকৃতই যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গপুরী বলিয়া মনে হয়! "মিঃ মেকলেও" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "বাস্তবিক কাশী সর্ব্ব

* Narrative of Fa-Hian, concerning his visit to Benares and Saranath. Extracted from the Foe Kaue Ki, by M. M. Remusat, Klaproth and Landresse. Paris 1836 Ch. XXXIV., pp. 304, 305 And Narrative of Hiouen-thsang. Translated by Dr. Shering from the "memoites surles coutrees Occidentales de Hiouen-thsang" of M. Stanislas Julien, translator of the original Chinese Work. Vol. I., pp. 353-376.

বিষয়েই এসিয়া খণ্ডের মধ্যে একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য স্থান।" (Macauley on Warren Hastings.)

ডাঃ প্রাইম, একজন আমেরিকান পর্য্যটক কাশী দর্শন করিয়া বিমোহিত চিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি, ভারতের দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরও দেখিয়াছি, কিন্তু কাশীর সেই ধারাবাহিক সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে হৃদয়ে কি যে এক অভিনব ভাব ও কল্পনার স্রোত প্রবাহিত করে, তাহা বাস্তবিক আমার বর্ণনাতীত। সেই সমুচ্চ মন্দির-চূড়া, সেই গগনস্পর্শী মিনারেট, সেই অগণ্য সোপানশ্রেণী-পরিশোভিত-গঙ্গাতট, সেই সংকীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে পঞ্চতল ষড়তল বিশিষ্ট অসংখ্য সৌধরাজি, আবার সেই সোপান ও পথগুলি সততই কেমন অদ্ভুত জনতাপূর্ণ, তাহার মধ্যে মধ্যে ভীষণ-দর্শন বিশ্বনাথের বৃষ ও অন্নপূর্ণার গাভীগুলি কেমন গম্ভীর-ভাবে বিচরণ করিতেছে, কাহারও প্রতি যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, চারি-দিকে অগণ্য বানর অসঙ্কোচে লাফালাফি করিতেছে, যাত্রীর বস্ত্র ধরিয়া খাবার চাহিতেছে, অনতিবিস্তৃত পথে উষ্ট্র, হস্তী, এক্কাগাড়ী নিরন্তর গমনাগমন করিতেছে, এই সকল প্রাচ্য-প্রদেশ-সুলভ দৃশ্যাবলী কাশীতে যেন একাধারে সন্নিবেশিত। যখন আমি নৌকারোহণে গঙ্গার বক্ষ হইতে ঘাটগুলি ও হিন্দু-স্থাপত্যের অদ্ভুত কলা-কৌশল লক্ষ্য করিতেছিলাম, বলিতে কি—তখন আমার মনে হইতেছিল, আমি বুঝি কোনও স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" (Benares Guide Book, pp. 14-15.)

ডাঃ প্রাইম, মিঃ মেকলে, ডাঃ সেরিং, মহানুভব ফা-হিয়েন

ও হিউয়েন্থ-সাং প্রভৃতির আধুনিক ও প্রাচীন কাশীর বর্ণনা হইতে কাশীর বিদ্যা ও বৈভব সম্বন্ধে যেমন বিবিধ বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ কাশীর বর্ত্তমান ও প্রাচীন নগর সম্বন্ধেও এক নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে, যাহা এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। এখন আমরা যে স্থানে নগরের এই গৌরবময় বিকাশ দেখিতেছি, প্রাচীন সময়ে ঠিক এই স্থানেই কাশীরাজ্যের রাজধানী, নগর বা সহর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বর্ণনা ও বংশপরম্পরায় কাশীর অধিবাসী অনেক বৃদ্ধের মুখেও এখনও তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশীরাজ্যের রাজধানী।

প্রাচীনকালে কাশীরাজ্যের রাজধানী বা সহর এবং কাশী তীর্থ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। রাজধানী ও তীর্থের এইরূপ পৃথক স্থান-নির্ব্বাচন আর্য্য-ঋষিদিগের যে প্রকৃতই দূরদর্শিতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাদিগের লিখিত শুক্রনীতি আদি গ্রন্থাদির মধ্যেও গ্রাম ও নগর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে সে বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। 'মানসার' প্রভৃতি স্থাপত্য-উপবেদানুমোদিত গ্রন্থাদির মধ্যেও সে কথা স্পষ্ট লিখিত আছে। যাহাহউক কাশীর রাজধানী সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাশীর সেই প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমানের এই সহর হইতে অনুমান দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে কাশী, বারাণসী অথবা 'বেনারস' এই স্থান বলিয়া

বুঝিয়া থাকি, সেকালে ঠিক তাহা ছিল না। তখন কাশী রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এবং এই কাশীক্ষেত্র বা বারাণসী তাহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই পরিচিত ছিল।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে ৩৯০৫-৩৯১৮ শ্লোকের পাঠানুসারে জানিতে পারা যায়, মহারাজ পুরুর পূর্ব্বে মহারাজ নহুষাত্মজ যযাতি কাশীরাজরূপে রাজধানী "প্রতিষ্ঠানে" রাজত্ব করিতেন।

"ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতি র্নহুষাত্মজঃ।
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশীরাজ্যে মহাযশাঃ॥"

বিম্বিসার-পুত্র মহারাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালে কাশী রাজ্য পরিচালক নরপতিগণের মধ্যে অনেকেই পুর্ব্বোক্ত "প্রতিষ্ঠান" নামক রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

"কথাসরিৎসাগর" পাঠেও জানা যায়, "প্রতিষ্ঠান" কাশী-রাজ্যের রাজধানী ছিল। গঙ্গা ও বরণার উত্তরতটে ও গোমতীর দক্ষিণ দিকে এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয় মনে হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ফা-হিয়ান ও হিউয়েন্থ-সাং চীন পর্য্যটকদ্বয়ের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। প্রথম ব্যক্তি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশী পরিদর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণ-

মেণ্ট যাহাকে জেলা বেনারস (Dist. Benares) রূপে বিভাগ করিয়াছেন, পূর্ব্বে প্রায় তাহাই কাশীরাজ্যরূপে পরিচিত ছিল, এবং সেই বিভাগের অধীশ্বর তখন কাশীরাজ নামে বিদিত হইতেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বের একাধিকশততম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—মহামতি ভীষ্ম সেই কাশীরাজের কন্যাগুলিকে হরণ করিয়া তদীয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত দুইটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। গীতার ১ম অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকের মধ্যেও সকলে দেখিতে পাইবেন যে, কুরুক্ষেত্রের মহাবণে বীর্য্যবান্ কাশীরাজ পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীরাজ সেকালে "মহারাজ অফ্ বেনারস" বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। এক্ষণে আমরা যাঁহাকে কাশীরাজ বলিয়া অভি-বাদন করি, বস্তুতঃ তিনি ঠিক কাশীরাজ নহেন, তিনি "মহারাজ অফ্ বেনারস," তাঁহাকে সম্পূর্ণ বারানসীরাজও বলিতে পারা যায় না, কারণ বারাণসী এক্ষণে বৃটীশ শাসিত সহর। এই সহরের মধ্যে তাঁহার কতিপয় গৃহ ও ভূমি আছে মাত্র। তিনি জেলা বেনারসের অন্তর্গত রামনগরাদি কয়েকখানি পরগণার অধিপতি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাঁহাকে সামন্তরাজের অধিকার দিয়া সেই সকল পরগণা শাসন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বারাণসী-তীর্থের মধ্যেও তিনি বৃটীশের অধীন প্রধান জমীদার ও ক্ষমতাশালী পুরুষ, সেই সকল কারণে বেনারস মহারাজের সম্মান যথেষ্ট।

বহু পূর্ব্বযুগে অন্ততঃ মহাভারতের যুগেও কাশীরাজ্যের কতদূর বিস্তৃতি ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা না যাইলেও, পূর্ব্বোক্ত চীন-পর্য্যটকদ্বয়ের বর্ণনা হইতে কাশীরাজ্যের পরিধি

যে ৬৬৭ মাইল ছিল এবং তাহার রাজধানী বা সহরও অনুমান তিন চারি মাইল মাত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইংরাজ-চিহ্নিত জেলা বেনারস, অধুনা "ইউনাইটেড-প্রভিন্সের" অন্তর্গত। ইহার উত্তরসীমা জোনপুর ও গাজীপুর জেলা এবং গোমতী নদী, দক্ষিণে মির্জাপুর জেলা এবং কর্ম্মনাশা নদী, যাহা ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গবিভাগের অন্তর্গত ছিল অধুনা বিহার বিভাগের অন্তর্গত আরা এবং সাহাবাদ জেলা হইতে ইহাকে পৃথক করিতেছে, পূর্ব্বে সাহাবাদ জেলা ও গাজীপুর জেলার কিয়দংশ এবং পশ্চিম সীমা জোনপুর এলাহাবাদ ও মির্জাপুর জেলা। এই নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের পরিমাণ সম্ভবতঃ অধিক ছিল, কারণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেকালের পরিমাণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিমাণ হইতে অনেক বড় ছিল, কিন্তু সেকালের রাজধানী অপেক্ষা বর্ত্তমানের কাশীসহর যে, অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহা পূর্ব্বলিখিত পরিমাণ হইতেই জানিতে পারা যায়। যাহাহউক এক্ষণে সেই প্রাচীন সহরের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

ফা-হিয়েন, সারনাথের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশী-সহরের অনুমান দুই মাইলের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিম কোণে সেই স্তূপ অবস্থিত এবং হিউয়েন্থ-সাং বলিয়াছেন, কাশীরাজ্যের রাজধানী হইতে কিছু কম দুই মাইলের মধ্যে উত্তর-পূর্ব্বদিকে সেই স্তূপ ও মন্দির দেখিয়াছি। এক ব্যক্তি সহরের উত্তর-পশ্চিম এবং অন্য ব্যক্তি সহরের উত্তর-পূর্ব্ব বলিয়াছেন; যিনি উত্তর-পশ্চিম বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রায় সার্দ্ধদুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছিলেন, তখন সহর সারনাথ-স্তূপের

পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—এক্ষণে যথায় রাজঘাট বা কাশী-ষ্টেসন হইয়াছে, সেইস্থান হইতে বরুণার ধারে ধারেই তখন সহর ছিল। কর্ণেল উইলফোর্ডও বলিয়াছেন "The old city of Benares, north of the river Buruna," বরুণার উত্তরপার্শ্বেই প্রাচীন সহর অবস্থিত ছিল। (Asiatic Researches, vol. XII., P. 199.) এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সহর হইতে সারনাথের দিকে সকল পথ-ঘাটই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। খুবই সম্ভব ফা-হিয়েনের পরিদর্শনের পর—আড়াই শত বৎসরের মধ্যে কোনও দৈব-দুর্ঘটনা দ্বারাই হউক বা আংশিক হিংসা ও বিরুদ্ধভাবপুষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইয়াই হউক নগরের পূর্ব্ব অংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ক্রমে পশ্চিমদিকে নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। যে সময় হিউয়েন্ত-সাং আসিয়াছিলেন, তিনি সেই নব প্রতিষ্ঠিত নগর বা সহরই তখন দেখিয়া থাকিবেন এবং সেই কারণ তাহারই উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সারনাথের স্তূপ ও সঙ্ঘারামের কথা তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে বানার নামক একজন মহাপ্রতাপান্বিত রাজা কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (Benares Illustrated.) কেহ কেহ বলেন তাঁহারই নামানুসারে কাশী রাজধানীর নাম 'বানারস' হইয়াছে। সে যাহা-হউক, তাঁহার সময়েও যে, সেই সহর রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেই ছিল, কাশীর বহু প্রাচীন অধিবাসীর বংশধরের মুখে

এ কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। হোসেন-নিজামীর ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায় যে, ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়চাঁদ কাশীর অধীশ্বর ছিলেন, (Murrey's Hand-Book, Bengal. P. 204.) তাঁহার দুর্গও রাজঘাটের নিকট ছিল এবং সেই কারণ গঙ্গার ঐ ঘাটটী এখনও রাজঘাট বলিয়া পরিচিত। সেই অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা ও ইষ্টক-স্তূপ এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে যে, রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেধারেই কখন বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবং কখন বা পশ্চিমে রাজঘাটের নিকটেই সেই সহর অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত আর এক কথা আছে, তাহাতেও সহর যে, ঐ দিকেই ছিল তাহা প্রমাণিত হইবে।

বুদ্ধদেব যখন ভারতের প্রচলিত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মত প্রচার করিবার মানসে গয়া হইতে এস্থানে উপস্থিত হন, তখন তিনি যে সহর ছাড়িয়া বা ভারতের ধর্ম্মচক্র-পরিচালক কাশীবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সম্মুখীন না হইয়া দূরে নির্জ্জন পল্লীর মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে তাঁহার গয়া পরিত্যাগ করিবারই আবশ্যকতা ছিল কি? তিনি যে, কাশী সহরের অন্তর্গত অথবা তাহারই প্রান্তভাগে নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও বরুণার উত্তর অংশেই কাশীরাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান ছিল। এই আধুনিক সহর, বিশ্বনাথের রাজধানী পঞ্চক্রোশী-বারাণসীর কেন্দ্রস্থল তখন নির্জ্জন বা কেবলমাত্র সাধু-

সন্ন্যাসী-সেবিত তপোবন-স্বরূপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞভূমি ও তীর্থরাজরূপে বিরাজিত ছিল। আশ্রম-পীড়াকর ও তপোবিঘ্ন-কর সহরের সে অবিরাম কোলাহল এখানে আদৌ প্রবেশ করিত না। তপোবনস্বরূপ বারাণসী ক্ষেত্র গৃহস্থ লোকের বাসভূমি-রূপে তখন পরিগণিত ছিল না, সুতরাং বিষয়কর্ম্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্যও সে স্থলের আদৌ উপযোগী ছিল না। কিন্তু ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় তখন কাশীরাজ্যের রাজধানীতে প্রায় দশ হাজার বাসগৃহ ছিল এবং তথায় বণিক-গণেরও অত্যন্ত কোলাহল ছিল। সেই কারণ আর্য্য-আচার-পুষ্ট ও আর্য্য-রীতির নিতান্ত অনুগত কাশীরাজ্যের অধিরাজগণ মুনি ঋষি ও সাধুদিগের শান্তিতে সাধন ভজন করিতে দিবার জন্যই চিরদিন দূরে নগর স্থাপন করিয়া তথায় বসবাস করিতেন। কেবল বিশ্বনাথ-দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণ সময় সময় বারাণসী মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন ও সাধু সজ্জন মহান্তদিগের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন।

মিষ্টার জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেনারস সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার দশম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, "কাশীর আদিম অধিবাসী গঙ্গাপুত্রগণের নিকট তিনি শুনিয়াছেন, কাশীর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ মণিকর্ণিকাঘাট চিরকাল জঙ্গলের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।" তিনি স্বচক্ষেও তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত বহু প্রাচীন বৃক্ষাদির অস্তিত্ব দেখিয়াছেন। অনেক বাটীর পুরাতন পাট্টা পত্রও তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে বনকাটা জমী বলিয়া বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন—হিন্দীর প্রসিদ্ধ রামায়ণী কবি সাধু তুলসী-

দাস গোস্বামীজী ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকট বনের ধারে অবস্থান করিতেন। তখন চতুর্দ্দিকেই এইরূপ বহু তপোবনস্বরূপ স্থানে সাধু সজ্জনগণ অবস্থান করিয়া সাধন ভজন করিতেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব-কাল হইতে এই সহরের নূতন ঘাট মন্দির ও প্রথম অট্টালিকাদির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়।

এতদ্ব্যতীত যে কোনও প্রাচীন সহর, নগর বা গ্রাম দেখিলে এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কোন স্থলেই শ্মশান-স্থান, গ্রামের মধ্যস্থলে বা তাহার অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল স্থলেই গ্রাম হইতে বহুদূরে নদীতটে কোন নির্জ্জন স্থানে অথবা বিশাল প্রান্তর প্রান্তেই শ্মশান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মণি-কর্ণিকার পার্শ্বস্থিত মহাশ্মশান রাজবল্লভ ঘাট কিম্বা পুরাণ প্রসিদ্ধ কাশীর আদি শ্মশান হরিশ্চন্দ্র-ঘাট কখনই সহরের অন্তর্গত ছিল না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত হরিশ্চন্দ্র-ঘাটের চিত্র দেখিয়াছি, বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বচক্ষে হরিশ্চন্দ্র-ঘাট দেখিয়াছি, নিকটে তেমন কোনও বাসভবন ছিল না, তখনও শ্মশানের নির্জ্জন গাম্ভীর্য্য ও ভীষণতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই গঙ্গাতীরে বরণাসঙ্গম হইতে দাক্ষিণা-ভিমুখে ক্রমে অসিসঙ্গম-সমীপে এত দ্রুত ঘন-পল্লীরূপে লোকের বসবাস হইতেছে যে, কাশীর ভূমি প্রায় কলিকাতার ন্যায়ই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক এই শ্মশানদ্বয় দেখিয়াও বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এইস্থানে কখনই কোন গৃহী লোক স্ত্রী পুত্র কলত্রাদি লইয়া বাস করিতেন না। আবার শাস্ত্রীয় প্রমাণে জানিতে পারা যায় যে, বিশ্বনাথের অন্তর্গৃহীক

যাত্রার মধ্যে গৃহস্থের বাস করিতে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই নিষেধবাণী সত্ত্বেও আজকাল অন্তর্গৃহীর মধ্যেই লোকের বসবাস অধিক—এখন আচণ্ডাল সকলেরই সাধ বিশ্বনাথের নিকট, গঙ্গার নিকট একটী বাড়ী পাইলেই ভাল হয়, তাহা হইলে নিত্য গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন হয়। এই উদ্দেশ্যেই ক্রমে বিশ্বনাথ সমীপবর্ত্তী স্থানসকল বহুজনতাপূর্ণ হইয়াছে ও দিন দিন সে জনতা বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন কাশীবাসী জনগণ কেহই প্রকৃত কাশীর আদিম অধিবাসী নহেন, সকলেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগমন করিয়া এখানে বংশপরম্পরায় বাস করিতেছেন এবং এক এক প্রান্তীয় হিন্দু, পরস্পর আত্মীয়তা সূত্রে এক এক মহল্লা বা পল্লী করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীরা বহুদিন হইতেই বাঙ্গালীটোলা, নেপালীরা নেপালীখাপরা ও রামঘাট, পাঞ্জাবীরা লাহারীটোলা বা লহরীটোলা, মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্চগঙ্গা ও রামঘাট, মাদ্রাজীরা কেদারঘাট প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও বারাণসী ক্ষেত্রে এই অভিনব বেনারস সহরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল স্থানে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন আমরা পল্লীবাসীর সেই সেই প্রদেশেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। লোক সমাগম সেখানে, ব্যবসা-বাণিজ্য শাসন ও বিচারস্থানও সেইখানে। ধর্ম্মান্তর বিশ্বাসী বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবে আশঙ্কায় কোন কথাটী বলিবেন না, ফলে বারাণসীতে তীর্থ-মাহাত্ম্য অপেক্ষা এখন সহর বা সিটী-মাহাত্ম্যই প্রবল হইতে বসিয়াছে। যাহাহউক অন্তর্গৃহীক ও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসমূহ হইতে সপ্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন সময় হইতে কোন রাজার রাজত্বকালেই

কাশীর প্রধান সহর এই স্থানে ছিল না। এমন কি বর্ত্তমান বেনারস মহারাজের স্বধর্ম্মপরায়ণ পূর্ব্বপুরুষও কাশীর তীর্থ-মাহাত্ম্য ও শান্তি অটুট রাখিবার জন্য পরপারে রামনগরেই রাজভবন ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বারাণসী।

'বারাণসী' এই শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে যাইয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার এত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহাতে অমূলক বা মাত্র প্রবাদসমূহ আদৌ শুনিতেই ইচ্ছা হয় না। প্রথমতঃ 'বারাণসী' শব্দের শব্দার্থ ধরিয়া অধ্যাপক উইলসন্ তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে 'বর' শব্দের উত্তর 'অনস্' প্রত্যয় যোগে বারাণসী সিদ্ধ হয় এইরূপ বলিয়াছেন এবং 'বর' অর্থে শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র এবং 'অনস' অর্থে অপ্ বা জল অর্থাৎ পবিত্র জল অথবা পতিতপাবনী গঙ্গা; তাহারই তীরে অবস্থিত বলিয়া তীর্থরাজ বারাণসী নামে কল্পিত হইয়াছে। (Murry's Hand-Book of Bengal. P. 203.) এই শব্দার্থ প্রমাণ ফা-হিয়ানের অনুবাদক ও মিঃ প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি সকলেই উইলসনের অভিধান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য, বিষ্ণুপুরাণ, বামনপুরাণ প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বরণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী উত্তর-প্রবাহিতা গঙ্গাতটস্থিত ভূভাগ অবিমুক্ত "বারাণসী" নামে খ্যাত। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডেও ঐ কথা লিখিত আছে।

বারাণসীতি যৎখ্যাতং তন্মানং নিগদামি বঃ।
দক্ষিণোত্তরযোর্নদ্যৌ বরণাসিশ্চ পূর্ব্বতঃ॥

"সর্ব্বান সর্ব্বে সমালোক্য রক্ষাং চক্রুঃ পুরা পুরঃ।
অসিংমহাসিরূপাঞ্চ প্রাপ্যাসন্মতি খণ্ডনীম্॥
দুষ্টপ্রবেশং ধুম্বানাং ধুনীং দেবা বিনির্ম্মমুঃ।
ববণাঞ্চ ব্যধুস্তত্র ক্ষেত্রবিঘ্ন নিবারিনাম্॥
দুর্বৃত্ত সুপ্রবৃত্তেশ্চ নিবৃত্তি করণীং সুরাঃ
দক্ষিণোত্তর দিক ভাগে কৃত্বাসিং বরণাং সুরাঃ॥
অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে॥
বারানসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ ববণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥"

বরণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী স্থানই বারাণসী ক্ষেত্র বা তীর্থ। এই বরণা ও অসি সম্বন্ধে বামনপুরাণে (৩।২৪।২) ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রয়াগ-তীর্থে আমার অংশ-সম্ভূত যোগশায়ী নামে যে বিখ্যাত বিরাট অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করিতেছেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী শুভঙ্করী বরণা এবং বাম পদ হইতে অসি নামক নদীদ্বয় নিঃসৃত হইয়াছে। এই দুই নদীর মধ্যে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্ব-পাপ-বিনাশক ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ যে তীর্থক্ষেত্র বিরাজিত, তাহারই নাম অবিমুক্ত "বারাণসী"। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোদ্ধৃত কাশীমাহাত্ম্য মতে বিশ্বেশ্বরের তিন যোজন পশ্চিমে পুষ্পপুর নামক গ্রাম হইতে বরণা এবং দেড় যোজন দূরে ভীম চণ্ডীর নিকট বিমলকুণ্ড হইতে অসি উদ্ভূত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদাদি আর্য্য-শাস্ত্রের সকল স্থানেই অসি ও বরণার মধ্যবর্ত্তী বারাণসী এই একই কথা লিখিত রহিয়াছে। তবে কোন কোন উপনিষদ ও তাহার টীকাকার (শঙ্করানন্দ প্রভৃতি) 'বরণা ও অসি' না

বলিয়া 'বরণা ও নাশী' বলিয়াছেন। জাবালোপনিষদে লিখিত আছে—"এই স্থানে জীবের মৃত্যু হইলে স্বয়ং রুদ্র তাহাকে তারকব্রহ্ম নাম শুনান, সেই কারণ জীব অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সতত বাস করা কর্ত্তব্য, ইহা পরিত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়া জানিবে। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বরণা ও নাশীর মধ্যে অবস্থিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ নিবারণ করে বলিয়া একের নাম বরণা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপরাশি নাশ করে বলিয়া অপরের নাম নাশী হইয়াছে।" কেহ কেহ বলেন প্রাচীন বৈদিক-যুগে 'নাশী' নামই প্রচলিত ছিল, পৌরাণিক যুগে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অসি বা অসী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ উহার আধ্যাত্মিক ভাবে বরণা অর্থাৎ পিঙ্গলা এবং অসী অর্থাৎ ইড়া, ইহাদের মিলনে বারাণসী হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন। স্থূলতঃ বরণা ও অসির মিলনে বারাণসী ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, এই বারাণসীই সেকালে কাশীপুরী বা কাশীতীর্থ ছিল। 'দশকুমার চরিত্র' ও 'রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে' কাশীপুরীকেই "বারাণসী" বলা হইয়াছে।

বারাণসীর স্থান-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান, গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ভারতখণ্ডের মধ্যে পবিত্র গঙ্গাতটে এমনই এক অদ্ভুত স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যথায় ভগবতী ভাগিরথী হিমগিরি হইতে প্রবলবেগে বিনির্গতা হইয়া দক্ষিণ সাগরাভিমুখে সমতল আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিবার সময়, কি জানি

কি চিন্তা করিয়া, একবার বুঝি উত্তরদিকে নিজ পিত্রালয় দর্শন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মুখেই নিজপতি গঙ্গাধর কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরকে এবং তদসহ চতুর্দ্দিকে পুষ্পাঞ্জলি-হস্তে পরমভক্ত সন্তানমণ্ডলীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া মা আমার, সে অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন; তাই সাধ্বী, পতিচরণতল পরিপ্লুত করিয়া পূতসলিলা পতিতপাবনী পাপীকুলের উদ্ধার-মানসে পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখেই চলিতে লাগিলেন। মায়ের সেই উত্তর-প্রবাহ, এই কাশীতলে এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। গঙ্গার এরূপ অভিনব প্রবাহ ভারতের আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। কেবল পিতৃক্রোড়েই পিতা মাতাকে শেষদেখা দেখিবার জন্যই বুঝি মা আমার উত্তরাখণ্ডে উত্তর কাশীতে সেই একবার উত্তরাভিমুখী হইয়াছিলেন, আর সমতলভূমিতে আসিয়া এই একবার। আর্য্যঋষিগণ মায়ের কৃপায় বারাণসীক্ষেত্রের জন্য প্রকৃতই এই অতুলনীয় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বারাণসী অসি ও বরণার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতটস্থিত এক অত্যুন্নত পার্ব্বত্যভূমির উপর অবস্থিত। সেই কারণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় গঙ্গার এই তটভূমি কখনও গঙ্গা-গর্ভ-গত হইতে পারে নাই। অথচ গঙ্গার প্রবাহ কাশীতট ছাড়াও হয় নাই। কাশীর দিকে গঙ্গার কখনও চড়া পড়ে নাই অথবা পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। সেই আদিকাল হইতে এখনও সমানভাবে একই স্থানে ইহা স্থির হইয়া আছে। বর্ত্তমান কাশী-সহরের উচ্চ-নিম্ন অসমতল পথ-ঘাট দেখিলে এখনও তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এ বিষয় পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীও লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হন নাই। মহানুভব "কেন" বলিয়াছেন, "বারাণসীতীর্থ উক্ত গঙ্গাতটে জন-

তল হইতে প্রায় শত ফুট উচ্চ এক পর্ব্বত-চূড়ার উপর চিত্রিতবৎ শোভিত রহিয়াছে। ভারতে এমন সুন্দর সহর আর দ্বিতীয় নাই।” দশাশ্বমেধান্তর্গত “প্রয়াগঘাট” সংস্কারকালে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কাশীর নিম্নস্তরভূমি গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্যকঙ্কররাশীতে সমাকীর্ণ।

প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচন বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিলেও তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ বরণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে, অথবা এই বারাণসীর কেন্দ্রস্বরূপ সেই সমুচ্চ পর্ব্বতের চূড়ার উপরেই যে পুরাকালে বিশ্বনাথের আদি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও সে আদি মন্দির বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার সন্নিধানেই বা প্রায় সেই স্থানেই আদি বিশ্বনাথের এই বর্ত্তমান মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কাশীর মধ্যে এই স্থানটী যথার্থই এখনও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভূমি বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের বর্ত্তমান প্রধান পথগুলি বেনারস মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক যথাসাধ্য সমতলীকৃত হইলেও আদি বিশ্বনাথ বা পরবর্ত্তী সময়ের বিশ্বনাথের মন্দির যাহা অধুনা “আওরঙ্গজেব মস্ক” রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার উত্তর পার্শ্বস্থ কারমাইকেল লাইব্রেরীর সম্মুখস্থল হইতে ক্রমে উভয় দিকে এত অধিক নিম্নগামী হইয়াছে যে, অতি সহজেই তাহা অনুভূত হয়। সহরের মধ্যে এই স্থান অপেক্ষা উচ্চতর ভূমি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত প্রবাদ আছে, বারাণসীর মধ্যে কখনও ভূমিকম্প হয় না। ইহাও ঋষিদিগের সাধারণ দূরদর্শিতার কথা নহে। প্রকৃত পক্ষে

বারাণসীর জন্য একপ স্থান নির্ব্বাচন, তাহাদের বহুদিনের পরীক্ষা ও গভীর গবেষণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একাল পর্য্যন্ত বারাণসী বা কাশীক্ষেত্রমধ্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা কখনও অনুভূত হয় নাই। "সিস্‌মোগ্রাফ" যন্ত্র-সাহায্যেও অতি ক্ষীণ ও ধীর আন্দোলন মাত্র কদাচ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল নানা কারণেই বারাণসী বিশ্বের মধ্যে 'তীর্থরাজ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কাশী বারাণসীর সর্ব্বপ্রথম স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে আরও এক অপূর্ব্ব কথা জানিতে পারা যায়। "এক সময় মহাপ্রলয়ান্তে পুনরায় নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দেখিলেন, তিনি একার্ণব-মধ্যে যোগনিদ্রায় শায়িত বিষ্ণুর নাভিকমলের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি যোগমায়ার কৃপায় বহুদিন সাধনার ফলে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? বিষ্ণু বলিলেন, আমি তোমার সৃজনকর্ত্তা, 'বিষ্ণু'। ব্রহ্মা তাহাতে হাসিয়া বলিলেন—বাঃ, তুমি ত যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলে, আমিই তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করাইলাম, তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা না আমার 'বাহনস্বরূপ'! উভয়ের মধ্যে এইরূপে আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হইলে, সহসা তাহাদের সম্মুখে এক অনাদি ও অনন্ত মহালিঙ্গের আবির্ভাব হইল এবং তাহার মধ্য হইতে উচ্চারণ হইল—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তোমরা কেহই শ্রেষ্ঠ নহ, আমিই সকলের প্রধান।" ইতিমধ্যে একটী কূর্ম্ম ও একটী হংস তথায় উপস্থিত হইল। সেই অনাদি লিঙ্গ হইতে পুনরায় আদেশ হইল—"বিষ্ণু, তুমি কূর্ম্মবাহনে আমার আদি অন্বেষণ কর এবং ব্রহ্মা, তুমি হংস বাহনে আমার অন্ত অন্বেষণ করিয়া আইস।" সেই আদেশ পাইয়া বিষ্ণু

সমুদ্র-মধ্যে এবং ব্রহ্মা আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। বহুদূর যাইয়াও ব্রহ্মা সেই লিঙ্গের অন্ত না পাইয়া নামিয়া আসিলেন; বিষ্ণু তখনও আসেন নাই। তিনি ভাবিলেন—বিষ্ণু উপরে উঠিতে পারিবে না, অতএব আমি এমন একটী বর্ণনা করিব যাহাতে বিষ্ণু চমৎকৃত হইবে। বহুদিন পরে বিষ্ণু আসিয়া বলিলেন—"বহু অনুসন্ধানেও আমি আদি দেখিতে না পাইয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিলাম।" ব্রহ্মা ত কল্পনা-বলে চমৎকার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সেই লিঙ্গ মধ্য হইতে পুনর্বার উচ্চারণ হইল "ব্রহ্মা, তুমি ত আমার অন্ত পাও নাই।" সঙ্গে সঙ্গে সেই লিঙ্গ ভেদ করিয়া রুদ্রদেব 'শিব' বহির্গত হইলেন। তখনই সম্মুখে একখানি বিমান উপস্থিত হইলে, অন্তরীক্ষ হইতে আকাশবাণী হইল—"তোমরা বিমানে আরোহণ কর।" তাহারা সেইরূপ করিলে, বিমান অত্যন্ত বেগে ছুটিতে লাগিল, পর পর কত সূর্য্যাদি সমন্বিত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া কত কাল পরে একস্থানে দেখিলেন—সম্মুখে মণিময় এক দ্বীপ রহিয়াছে, তাহাতে কল্পবৃক্ষতলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবরূপ পঞ্চশিবের উপর পরশিব শয়িত রহিয়াছেন, তাঁহার নাভি-কমলের উপরে ত্রিপুরাসুন্দরী সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী ষোড়শীমূর্ত্তিতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, চারিদিকে কুমারীগণ ছত্র, চামর ও ব্যজন ধারণ করিয়া সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই মহামায়ার ইঙ্গিতে তথায় অবতীর্ণ হইবামাত্র তিনজনেই কুমারীরূপে পরিণত হইলেন এবং ছত্র, চামর ও ব্যজনহস্তে দেবীর পার্শ্বে নীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—প্রত্যহই তাঁহাদের ন্যায় এক এক প্রস্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আসিতেছেন

ও তাঁহাদেরই মত কুমারীরূপে দেবীর সেবায় নিয়োজিত হইয়াছেন। এবং নিত্যই তাঁহাদের মধ্য হইতে এক এক প্রস্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র দেবীর আদেশে নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য চলিয়া যাইতেছেন। শত বৎসর পরে তাহাদের সময় সমাগত হইলে তাঁহারা স্ব স্ব স্বরূপে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দেবী নিজ নিশ্বাস-বায়ুদ্বারা তাঁহাদিগকে নিজ অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তাহাতে ব্রহ্মা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, বিষ্ণু শিশু মূর্ত্তিতে বট পত্রের উপর দেবীর অন্তরাস্থিত মহার্ণবে ভাসিতে লাগিলেন। রুদ্র সজ্ঞানে অন্তরের সমুদায় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রশ্বাসবায়ু সহযোগে পুনরায় তাঁহাদের বাহিরে আনিয়া, তিনি ব্রহ্মাকে নিজ অংশ হইতে ব্রাহ্মীশক্তি, বিষ্ণুকে বৈষ্ণবীশক্তি এবং রুদ্রকে রুদ্রাণীশক্তি প্রদান করিলেন ও বলিলেন—"ব্রহ্মা, তুমি অনন্তলিঙ্গের অন্ত অন্বেষণ করিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমার কল্পনা প্রসূত মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছিলে। তুমি রজোগুণ প্রধান, তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি কল্পনারই কার্য্য দিলাম, কিন্তু তুমি প্রথমে মিথ্যা কথা বলায় তোমার সৃষ্টিক্রিয়া কাহারই দৃষ্টিগোচর হইবে না এবং তুমি অন্য দেবতাদের মত সাধারণভাবে পূজা প্রাপ্তও হইবে না, তবে যজ্ঞেই তোমার প্রধান আরাধনা হইবে। বিষ্ণু, তুমি অনাদি-লিঙ্গের আদি অন্বেষণে সত্য কথা বলায় তোমাকে ব্রহ্মাণ্ডের পালন কার্য্য দিলাম, তুমি সত্ত্বগুণপ্রধান। আর রুদ্র, তুমি আমার অন্তরের মধ্যে সমস্ত দর্শন করিয়াছ, তুমি কিছুতেই সংজ্ঞাশূন্য হও না, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের লয়ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। এই লয়ক্রিয়াই 'মুক্তি'। তুমি মুমুক্ষুদিগকে যোগোপদেশ দিবে। শুদ্ধ-তমোগুণই নির্ব্বাণের

কারণ।" অতঃপর তাঁহারা দেবীর স্তব করিয়া পুনর্বার বিমানা-
রোহণে তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ক্রিয়া সম্পাদনে
বহির্গত হইলেন। তাঁহারা সেই একার্ণব মধ্যে যথায় সর্ব্বপ্রথম
অনাদি ও অনন্ত লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থানকে
কেন্দ্র করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদিক্রিয়ায় রত হইলেন। এবং
সেই পবিত্র স্থানের উপরেই এই অনাদি কাশীধামের জন্য স্থান
নির্দ্ধারণ করিলেন। কাশীশ্বর সেই অনাদি ও অনন্ত লিঙ্গরূপে
বিচিত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্রের উপর বিশ্বনাথরূপে সতত অবস্থিত
রহিয়াছেন। ভক্তিমান্ কাশীসেবীর পক্ষে এই রহস্য-কথা
প্রকৃতই অত্যন্ত আনন্দপ্রদ।

ইহা শিবের ত্রিশূলের উপরিস্থিত বলিয়াও শাস্ত্রে বর্ণিত
আছে। "কাশীখণ্ডে" লিখিত আছে—দেবাদিদেব শম্ভু দেবী
পার্ব্বতী ও বিষ্ণুর নিকট এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে বারাণসী, কাশী,
রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও আনন্দকানন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
যে কোন জীব এই স্থানে বাস করিলে শিবানুকম্পায় জীবশ্রেষ্ঠ
ও রুদ্রের রূপ বলিয়া পূজিত হয়, সেই কারণ ইহা 'রুদ্রাবাস'
বলিয়া খ্যাত। আবার শব্দশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা বলেন—শ্মন্
শব্দের অর্থ শব এবং শান্ শব্দের অর্থ শয্যা, সুতরাং 'শ্মশান' শব্দে
শবের শয়নস্থান হইল। মহাভূতগণ কল্পান্তকালে এই কাশীতে
মহালিঙ্গে শবরূপে শয়ন করিয়া থাকে, এইজন্য কাশীকে 'মহাশ্মশান'
বলে। মহাপ্রলয়কালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই শেষ ভূতত্ত্ব-বীজরূপে
জলে, জলবীজ তেজে, তেজোবীজ বায়ুতে, বায়ুবীজ আকাশবীজ-
রূপ পঞ্চম তত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাহারপর সেই আকাশবীজ
অহঙ্কার তত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্ব ষোড়শ বিকারের সহিত বুদ্ধি সংজ্ঞক

মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হইয়া যায়। পরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নির্গুণ পুরুষে লীন হইয়া থাকেন। উক্ত পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। তিনিই আবার এই পিণ্ড মধ্যে শুদ্ধ জীবরূপে একমাত্র অধিপতি হইয়া থাকেন। হে মুনে, ইহাকেই প্রলয় বলে। এই প্রকৃতি-প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কেহই বিদ্যমান থাকেন না, পরে মহাকাল মূর্ত্তি সেই শুদ্ধ জীব পুরুষকেও স্বকীয় রূপের অন্তর্নিহিত করেন। উক্ত মহাকাল মূর্ত্তি আদ্যন্তহীন পরমপুরুষই পরমেশ্বর মহাবিষ্ণু মহাদেব বলিয়া উক্ত হন। দৈনন্দিন প্রলয়কালে বিনষ্ট জীবগণের অস্থিমালায় বিভূষিত হইয়া দেবাদিদেব বিশ্বনাথ নিজ বিহার-নগরী আনন্দকানন বারাণসী বা কাশীপুরীকে নিজের ত্রিশূলের অগ্রভাগে ধারণ করিয়া সতত রক্ষা করেন। এইহেতু বারাণসীতে জীবের কালভয় নাই। ইহা সংসার বহির্ভূত অবিমুক্ত-ক্ষেত্র 'বারাণসী'। যাহাহউক বারাণসী যে জগতের শ্রেষ্ঠ অনাদি সাধন-ভূমি বা অবিমুক্ত সাধন ক্ষেত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কাশীরাজ্যের নৃপতিবৃন্দ।

কাশীরাজ্যের নৃপতিবৃন্দের ধারাবাহিক কোনও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে পুরাকালের বহু নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রথম ঋগ্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে কাশীরাজ দিবোদাস ও 'প্রতর্দ্দনের' বিষয় জানিতে পারা যায়। অনন্তর পরবর্ত্তী অন্যান্য শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতর্দ্দন আবার দিবোদাসের পুত্র, ইঁহারা কাশীরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

'কাত্যায়ন' তাঁহার 'ঋগ্‌বেদ-অনুক্রমণিকায়' দ্বিতীয় ব্যক্তিরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুইজন দিবোদাসের বিষয় বর্ণিত আছে। একজন হর্য্যশ্ব কেতুমান্ বা বধ্র্যাশ্বের সন্তান এবং অন্য ভীমরথের সন্তান, আবার প্রতর্দ্দনের পিতা দিবোদাসই কাশীরাজ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন, হর্য্যশ্ব বা বধ্র্যাশ্ব ও ভীমরথ একই ব্যক্তি হইবেন। (English Vishnu-Purana, Vol. IV, PP, 33 and 145, 146,) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব হইতেও এইরূপ জানিতে পারা যায়।

আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় পুরুরবা-পুত্র আয়ুর বংশে ধার্ম্মিক-প্রবর ক্ষত্রশর্ম্মার বা ক্ষত্রবৃদ্ধের উৎপত্তি হয়। তাঁহারই কীর্ত্তিমান পুত্র সুহোত্র বা সুনহোত্রের ঔরসে 'কাশ' নামক এক পুত্র বা দেবতার উদ্ভব হয়। ত্রিভুবন-বিশ্রুত এই কাশীনগরী তাঁহারই নামানুসারে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই কাশীর সর্ব্ব-প্রথম ক্ষত্রিয় রাজাবলীর আরম্ভ হইয়াছে। এই বংশে ক্রমে আর্ষ্টি, সেন, কাশ্য, কাশ্যপ, দীর্ঘতপা, ধন্ব, ধন্বন্তরি, কেতুমান, ভীমরথ, দিবোদাস ও প্রতর্দ্দন প্রভৃতি বেদ-পুরাণ-প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান নৃপতিবৃন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীরাজ্য পরিচালনা করিতে-ছিলেন। এই আয়ুবংশেই নহুষপুত্র 'যযাতিও' কাশীশ্বর বলিয়া মহাভারতে উক্ত আছে।

পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থন কালে সাগর হইতে তেজঃপুঞ্জবপু ধ্যানরত ধন্বন্তরিদেব সম্ভূত হন, তিনি তখন 'অব্জ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোদ্ধৃত সুনহোত্র-বংশোদ্ভব কাশীরাজ

ধন্ব পুত্র-কামনায় দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলে, ভগবান অব্জদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন, এইরূপ বর দিলেন। অনন্তর ধন্বের গৃহে সর্ব্বরোগ-নাশক ধন্বন্তরিরূপে তিনি এই সংসারে আবির্ভূত হইলেন।

মহারাজ ধন্বন্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র বা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে অষ্ট অঙ্গে বা আট ভাগে বিভক্ত করেন। সেই কারণ তিনি 'বৈদ্য' নামে প্রসিদ্ধ হন; এবং আদিবংশসম্ভূত ধন্বন্তরি এই বেদের প্রচারক বলিয়াও বোধহয় সমগ্র চিকিৎসা-শাস্ত্র 'আয়ুর্ব্বেদ' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। দেবাদিদেব বৈদ্যনাথ শঙ্কর আয়ুর্ব্বেদের আদি আবিষ্কারক—সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ স্থান কাশী হইতেই শঙ্করাদেশে কাশীরাজ ধন্বন্তরিদেব কর্তৃক ইহার প্রচার হইয়াছে। হর্য্যশ্ব বা কেতুমান্ এই ধন্বন্তরির পুত্র। হরিবংশের মতে কেতুমানের পুত্র ভীমরথ এবং ভীমরথের পুত্র দিবোদাস। কিন্তু মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়, দিবোদাসের পিতার নাম সুদেব এবং সুদেবের পিতা হর্য্যশ্ব। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে সুদেব ভীমরথেরই নামান্তর হইবে। কেতুমান বা হর্য্যশ্বের রাজত্ব সময়ে যদুবংশীয় হৈহয়পুত্রগণ কাশীরাজের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তাহাতে হর্য্যশ্ব গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে নিহত হন। অনন্তর সাক্ষাৎ ধর্ম্মসদৃশ সুদেব সিংহাসনারূঢ় হন, কিন্তু তিনিও হৈহয়-গণ কর্তৃক অনতিকাল মধ্যে নিহত হইলে, উক্ত বংশের একমাত্র বংশধর দিবোদাসই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

"দিবোদাস ইতিখ্যাত বারাণস্যাধিপো ভবেৎ।"

দিবোদাস বারাণস্যাধিপ হইয়া বারাণসীর অন্তর্গত বরণার উত্তরদিকে কাশীরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া শত্রুভয়ে তাহা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হৈহয়গণ কাশীরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই হৈহয়বংশীয় নৃপতি ভদ্রশ্রেণ্যই বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন, দিবোদাস তাঁহাকে সপুত্র বিনাশ করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাত্মা নিকুম্ভের অভিশাপে ও ক্ষেমক-রাক্ষসের উৎপাতে এই সময় বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইল, দিবোদাস সেই কারণ পূর্ব্ব হইতেই গোমতীর দক্ষিণ তটে এবং গঙ্গা ও বরণার উত্তর দিকে কাশীরাজ্যের নূতন রাজধানীরূপে এক সুদৃঢ় দুর্গবিশিষ্ট মনোহারিণী নগরী স্থাপনা করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। হৈহয়বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের একমাত্র শিশুপুত্র দুর্দ্দমকে দয়া করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দম ক্রমে বর্দ্ধিত ও মহা পরাক্রান্ত হইয়া পিতৃহন্তা দিবোদাসকে পরাজিত করিয়া বারাণসী পুনরধিকার করেন। তখন দিবোদাস দৃষদ্বতী নগরে পলায়ন করেন। তথায় মহর্ষি ভরদ্বাজের যজ্ঞ-প্রভাবে মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কালে মহাপরাক্রান্ত হইয়া দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কাশীরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ইনি যেমন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ স্বধর্ম্মপরায়ণ ও পরম যাজ্ঞিক বলিয়া উপনিষদাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, ইনি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার বৎস ও ভর্গ নামে দুই পুত্র জন্মে। বৎস—ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত হন। জগৎ-প্রসিদ্ধ

পরম জ্ঞানশীলা ও তত্ত্বদর্শিনী 'মদালসা' এই কুবলয়াশ্বের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মহা বীর্য্যবান্ মহারাজ অলর্ক ইঁহাদেরই পুত্র, ইনিই কাশীর শাপান্তকাল উপস্থিত হইলে ক্ষেমক-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া বারাণসীকে পুনরায় সুশোভিত করেন। লোপা-মুদ্রার প্রসাদে ইনি বহুকাল জীবিত ছিলেন ও একাদিক্রমে ষাট হাজার ষাট শত বৎসর রাজত্ব করেন। অথচ তাঁহার যৌবন চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। কথিত আছে, পূর্ব্বকালেও কোন ভূপতি এতদিন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর যথাক্রমে সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, কেতুমান্, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু (ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) বেণুহোত্র, মহামান্য ভর্গ জন্মগ্রহণ করেন। অলর্কের পিতা বৎস হইতে বৎসভূমি এবং বৎসের ভ্রাতা ভর্গ হইতে ভর্গভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গ ও তৎপুত্র ভার্গভূমি বোধ হয় ভার্গের বংশধর হইবেন। যাহাহউক এই সকল প্রাচীন কাশবংশীয় নরপতি কাশীতে বহুদিন রাজত্ব করেন। মৎস্য-পুরাণে চতুর্বিংশতিজন কাশবংশীয় নরপতির উল্লেখ আছে। ভার্গভূমির পর সম্ভবতঃ কাশীর সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। অনন্তর হৈহয়বংশীয় অষ্টবিংশতি ব্যক্তি কাশীর রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের পর প্রদ্যোৎবংশীয় কয়েকজন নরপতি ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। 'ব্রহ্মাণ্ডউপোদ্ঘাতপাদে' লিখিত আছে, তৎপরে শিশুনাগ ইহাদিগকে নিহত করিয়া তৎপুত্র দর্শকে বারাণসীতে অভিষিক্ত করিয়া গিরিব্রজে গমন করেন। বুদ্ধদেবের সময় ইনিই কাশীর মহা পরাক্রান্ত অধিপতি

ছিলেন। ইনি ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বিপুল সহায়তা করিয়াছিলেন। শিশুনাগের বংশ তিনশত সাতষট্টী বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়—৭ম তীর্থঙ্কর ভগবান সুপার্শ্ব মহারাজ প্রতিষ্ঠের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীতে জৈন-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করেন। আর্য্যশাস্ত্রানভিজ্ঞ অনেকে মনে করেন, প্রতিষ্ঠ-রাজের নামানুসারেই কাশীরাজ্যের অন্যতর রাজধানী 'প্রতিষ্ঠানের' প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে বর্ণিত আছে—মহারাজ যযাতি কাশীরাজ্যের 'প্রতিষ্ঠান' নামক রাজধানীতে অবস্থান করিতেন। তদনন্তর খৃঃ পূঃ প্রায় ৮০০ অব্দে কাশীপতি অশ্বসেনের ঔরসে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দেব জন্মগ্রহণ করেন। তখন কাশীতে জৈনধর্ম্মের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার নির্ব্বাণলাভের প্রায় দুইশত বৎসর পরে মহামুনি শাক্যসিংহ বারাণসীতে পদার্পণ করেন।

বৌদ্ধ আধিপত্যসময়ে বহু রাজা কর্ত্তৃক কাশীরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম 'ভীমশুক্ল,' ইনি একজন মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। (Der Budhisims translated from the Russian of Professor Wassiljew, Part 1, P. 54.)

বোধ হয় পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিদিগের মধ্যে দিবোদাস নামে কোনও স্বতন্ত্র রাজা হইয়া থাকিবেন। সেই কারণ অনেকে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক দিবোদাসকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে কাশীরাজ্য পাটলিপুত্রের অধীন হইয়াছিল। তৎপুত্র প্রিয়দর্শী অশোক সারনাথে বহু স্তূপ ও বুদ্ধদেবের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। অশোকের পর তদীয় পৌত্র দশরথের সময় জৈন আজীবকগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। অনন্তর ক্রমান্বয়ে চৌরাশিহাজার রাজা কাশীর রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, 'দিগবংশে' এইরূপ বর্ণিত আছে (Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1838, P. 927.)

মৌর্য্যরাজাদিগের রাজত্বকালে কাশীরাজ্য পাটলিপুত্রের অধীনে ছিল। শুঙ্গমিত্র ও কাণ্বায়নদিগের সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। মহারাজ অগ্নিমিত্র এই সময় অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব-উদ্ধারে যত্নবান হইয়াছিলেন।

চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন্থ-সাং, ভারতে আসিবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্য নরসিংহগুপ্ত কাশীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময় হূণপতি তোরমাণ্ ও মিহিরকুল ভারতাক্রমণ করেন। মালবপতি যশোবর্ম্মার সাহায্যে মহারাজ বালাদিত্য হূণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে সমানভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার পুত্র প্রকটাদিত্য কিছুকাল কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়ে সারনাথেও হিন্দু দেবমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন কাশীর

অধীশ্বর ছিলেন। তৎপরে পুনরায় মগধের রাজারা কিছুদিন কাশীর নৃপতি হয়েন। অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধীশ্বর যশোবর্ম্মা মগধাধিপকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজ্যকে কনোজ-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে কান্যকুব্জ ও কাশীধাম বৈদিকাচারের কেন্দ্রস্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর ক্রমে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র—চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ কনোজের অধিপতি হন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন না। ইন্দ্রায়ুধের সময় পালবংশীয়গণ প্রবল হইয়া উঠেন। ধর্ম্মপাল কিছু কালের জন্য কান্যকুব্জ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ভোজ ও তাঁহার বংশধর এই পাল উপাধিধারী রাজগণ বারাণসী ও শ্রাবস্তীর মধ্যে রাজধানী স্থাপনা করিয়া বারাণসীক্ষেত্রে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এসিয়াটিক রিসার্চের পঞ্চমখণ্ডে এক প্রস্তরখোদিত শাসন-লিপির উল্লেখ আছে—সেখানি ১৭৯৪ খৃঃ বেনারসের নিকটই সারনাথ গর্ভের কোন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা গিয়াছে, গৌড়-রাজগণও কিছুদিন কাশীরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থিরপাল ও বসন্তপালের পিতা মহীপালের রাজত্বকাল ১০৮৩ বিক্রম অব্দে বা ১০২৬ খৃঃঅব্দে শেষ হয়। এই প্রস্তর-ফলক খানির খোদিত অক্ষরগুলি অতি জীর্ণ হইয়া ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই কারণ কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উহার লিখিত কাল সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে আরও প্রাচীন সময়ে ইহাঁরা কাশী-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

মিঃ জেমস প্রিন্সেপ্ (Mr. James Prinsep F.R.S.)

তাঁহার "বেনারস" নামক পুস্তকের ৯ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কোন মোসলমানী ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসী বনার নামক কোন নরপতির দ্বারা শাসিত হইয়াছিল, সেই সময় ভারতবিজয়ী মামুদের কোন সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক কাশীপতি বনার পরাজিত হইয়াছিলেন। আবার "আইনি আকবরি" পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, মামুদ নিজেই বারাণসী বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে "ফেরিস্তাতে" মামুদের কাশীবিজয়ের কোন কথাই লিখিত নাই। কর্ণেল ষ্টুয়ার্টও সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেন নাই এই সকল বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, মামুদ কনৌজ পর্যন্ত জয় করিয়া মথুরার দিকে যমুনার পশ্চিমপার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, ১০২৭ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজ্য সুবিস্তৃত গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সে সময় মহারাজ মহীপালই কাশীরাজ্য শাসন করিতেছিলেন এবং তিনি সারনাথ স্তূপটীর একবার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীরাজ্য কিছুদিন রাষ্ট্রকূটবংশীয় গাহড়বাল নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহাদের যত্নে বহু হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজসূয়-যজ্ঞকর্ত্তা কনোজাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্র এই বংশেরই বংশধর।

মোসলমান ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মোসলমান-আধিপত্য সময়ে বেনারস এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ কনোজের অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; এবং কনোজের শেষ রাজা মদনপাল হইতে জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত

বেনারসের রাজত্ব করিয়াছিলেন।

হোসেন নিজামীর ইতিহাস এবং Colonel Briggs's translation From Farishta, Vol. I. P, 179 হইতে জানিতে পারা যায় যে, "সিহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক ১১৯৯ খৃঃঅব্দে কাশীরাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ জয়চাঁদ পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুতব সেই সময় সুলতান সহ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্রাধিক মন্দির ও মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। পরে সেই মন্দিরাদির ইষ্টক ও প্রস্তরগুলি লইয়া সেই সকল স্থানে মস্‌জিদ্ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে কাশীরাজ্য মোসলমান রাজাদিগের দ্বারা শাসিত এবং এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র অনাদিলিঙ্গ ও দেববিগ্রহ-ধ্বংসকারী কুতবের কিঞ্চিৎ পরিচয় এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি, কারণ বোধ হয় অনেকেই কুতবের প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন। কুতব মোসলমান ঔরসজাত খাঁটী মোসলমান ছিলেন না। তাহার প্রকৃত নাম রামপ্রসাদ; পাঞ্জাব প্রদেশবাসী একজন অতি নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়-সন্তান। গজনীপতি সিহাবুদ্দিন মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া প্রথমে তাঁহার গোলামরূপে নিযুক্ত হন; পরে বাধ্য হইয়া মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর 'কুতবুদ্দিন' নাম ধারণ করেন। ক্রমে নিজ কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন ও তাঁহার প্রধান সেনাপতিরূপে ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। এই সময় অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম্ পর্য্যন্ত কুতব নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে,

কুতব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠাবান আর্য্যবংশ সম্ভূত হইয়াও কোন্ পাপে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, নিজে তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মূর্খ দেব-দ্বিজের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাহার ধ্বংস সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। বোধ হয় কুতব মোসলমান ঔরসজাত প্রকৃত মোসলমান হইলে এতাধিক অত্যাচার করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! কেবল কুতবই যে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকজন কাশীর যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বেলোললোদীর সেনাপতি 'মহম্মদ ফর্ম্মুলি' বা প্রসিদ্ধ 'কালাপাহাড়' অন্যতর। কুতবের পর এক এই কালা-পাহাড় হইতে হিন্দুর যে অনিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সমস্ত মোসলমানের সকল অত্যাচার একত্র করিলেও তাহার সমান হইবে না। কুতবের ন্যায় এটীও গৃহের শত্রু বিভীষণ— এটীর পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকগণের আরও জানিবার বিষয়, কারণ এটী আমাদের খাস বাঙ্গালার কুলাঙ্গার। ইহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত একটাকিয়ার ভাদুড়ী-রাজা জগদানন্দের বংশজাত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খান্দা থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে তাহার জন্মস্থান। অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যু হইলে মাতামহ কর্তৃক কালাচাঁদ লালিত-পালিত হইয়া তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতে বেশ বলবান, শস্ত্র-চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার দুই বৎসর পরে, গৌড়-সম্রাটের অধীনে ফৌজদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

পরে দৈব-দুর্ব্বিপাকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে সম্রাট-কন্যার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারিয়া, মনের দুঃখে পুরী-জগন্নাথ দেবের নিকট সপ্তাহকাল অনাহারে ধরণা দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও প্রত্যাদেশ না পাইয়া অধিকন্তু পাণ্ডাগণের কর্ত্তৃক অযথা তিরস্কৃত হইয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইলেন ও মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, পরে নিজ মোসলমান শ্বশুর গৌড়-সম্রাটের অনুমতি লইয়া উড়িষ্যা-বিজয় করেন এবং জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডাদিগকেও জোর করিয়া মোসলমান করিতে থাকেন। তাঁহার ভীষণ অত্যাচারে লোকে তাঁহাকে বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া 'কালাপাহাড়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। যে যে [illegible] কালাপাহাড় গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেরই দেব-বিগ্রহ [illegible] চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া [illegible] দিয়াছিলেন। ভারতের এমন [illegible] ন নাই যথায় কালাপাহা[ড়] হিন্দুর অনিষ্ট করেন নাই। বাব্বাকসাহ যখন জৌনপুরের [অধি]পতি, তখন বেলোললোদি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন, উভয়ের মধ্যে সাতাইশ-বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে ছিল। বাব্বাকসাহ [ব]াঙ্গালার অদ্বিতীয় বীর কালাপাহাড়ের অতুল বিক্রমের ক[থা] শুনিয়া তাঁহাকে নিজ সেনাপ[তি] করিতে আমন্ত্রণ করেন, [কিন্তু] পথিমধ্যে হইতে বেলোললোদি কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দী [হ]ইয়া তিনি দিল্লীতে নীত হইলে, তথায় সম্রাট কর্ত্তৃক অ[তি] সমাদরে গৃহীত ও অল্পদিনের মধ্যে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে [তাঁহা]র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার পর ১৪৯৩ খৃষ্টা[ব্দে] এই নূতন শ্বশুরের সহিত যাইয়া জৌনপুর সাম্রাজ্য অধিকার [করে]ন। এই [সম]য় শ্রীহট্ট ও কামরূপের

ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দুধর্ম্ম এককালে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কোনও প্রাচীন মন্দিরই তাঁহার নিষ্ঠুর করে রক্ষা পায় নাই। এই সময় কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাস করিতেন। চরম অত্যাচার উপলক্ষে একজন দুষ্ট যবন তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। তিনি ঘৃণা, দুঃখ ও ক্রোধে রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাঁহার সম্মুখে সেই স্থানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় স্বচক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তখনই অত্যাচার বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র অত্যাচার তখনই বন্ধ হইল সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বারাণসীর প্রায় সকল দেবালয়ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র কেদারেশ্বর অনাদি শিবলিঙ্গটী তখন রক্ষা পাইল। এদিকে কালাপাহাড়, সেই রাত্রেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইলেন, পরে আর কেহই তাঁহার সন্ধান পায় নাই।

এত অত্যাচারেও এক হিসাবে কাশীর সেরূপ কোনও ক্ষতি হয় নাই, তাহার কারণ—মোসলমানগণ বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহার ধর্ম্ম-মতের প্রতি এমন বিশেষ লক্ষ্য করে নাই, যাহাতে সে সনাতন মতের কিছু মাত্রও পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

তৎপরে ঘোর দেবদ্বেষী আওরঙ্গজেব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নিজ রাজত্ব সময়ে বিশ্বেশ্বরের সেই অতি প্রাচীন পবিত্র মন্দিরসহ বহু হিন্দুমন্দির বর্ব্বরের ন্যায় ধ্বংশ করিয়া তাহারই উপরে সেই সকল ইষ্টক প্রস্তর দ্বারা এক একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন এবং তিনি 'বারাণসী' আর্য্যের এই প্রাচীন নাম 'মহম্মদাবাদে' পরিবর্ত্তিত করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

কুতবুদ্দিনের পর যে সকল মোসলমান নরপতি আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই যে, দেবদ্বেষী, মূর্ত্তি ও মন্দির-ভঙ্গকারী ছিলেন, তাহা নহে; সুলতান বল্‌বন্‌ প্রভৃতি কোন কোনও সম্রাট যথেষ্ট সমদর্শী ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দু ও মোসলমানকে সমান চক্ষেই দেখিতেন। সম্রাট আকবরের সময়েও কাশীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারই সহায়তায় জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক শত শত দেবালয় ও মন্দির এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিঃ প্রিন্‌সেপ্‌ বলেন, কাশীতে মানসিংহের পূর্ব্বে নির্ম্মিত কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব নাই।

বাদসাহ সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহিত্যানুরাগী দারাসেকো কিয়ৎকালের জন্য যখন কাশীতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ছিলেন (তিনি সে সময়ে যে স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা এখনও 'দারানগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ) তখন কাশীরাজ্যের একজন স্বতন্ত্র অধিপতি হওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই সে পুরাতন রাজবংশের এককালীন লোপ হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক ত্রিকর্ম্মা ব্রাহ্মণ দিগের দলপতি গঙ্গাপুরের জমিদার 'মনসারাম' রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহারই অধীনে কাশীর রাজা মনোনীত হ'ন। কেহ কেহ বলেন মনসারাম কৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতায় নিজ প্রভু—নবাবের সর্ব্বনাশ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইনি আট বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে পরলোক-গত হ'ন।

মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিং ১৭৪০ খৃঃ অব্দে পিতৃরাজ্যে

অভিষিক্ত হইয়া নানা কৌশলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আহম্মদ সাহ, সফদরজঙ্গকে উজীরি ও অযোধ্যা প্রদেশ প্রদান করেন। তখন কাশীরাজ্য পুনরায় অযোধ্যা-সুবার অন্তর্গত হয়। কিন্তু বলবন্তসিং সুবাদার সফদরজঙ্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া অসীম সাহস ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা ও বলবন্তের তেজ খর্ব্ব করিতে বিশেষ যত্নবান হ'ন। এই সময়েই রাজা বলবন্ত আত্মরক্ষার্থে রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব মির্জাফরের সহিত পরস্পর বিপদের সময় সাহায্য করিবেন, এইরূপ তাঁহার সন্ধি হয়। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে বাদসাহ সাহ আলাম কর্ত্তৃক বারাণসী রাজ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পিত হইলে, ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে উক্ত কোম্পানী সন্ধিসূত্রে সুজাউদ্দৌলাকে পুনরায় তাহা ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সুচতুর বলবন্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগত হইয়া সুজাউদ্দৌলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৃটীশের মিত্র-রাজা বলিয়া নিজকে পরিচয় দেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে রামনগরের প্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা বলবন্তের ঔরসে তাঁহারই এক আশ্রিতা ও অনুগতা দাসীর গর্ভজাত সন্তান চেৎসিংকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে বারাণসী আবার ইংরাজের অধীন হয়। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক চেৎসিংকে 'রাজা' সনন্দপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পরে রাজস্ব লইয়া নানা দুর্ঘটনান্তে ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে হেষ্টিংস পরাস্ত

হইয়া চুনার দুর্গে পলায়ন করেন পরে বিপুল বিক্রমে দ্বিতীয় বারের আক্রমণে চেৎসিং আত্মরক্ষা করিবার জন্য 'শিবালয়' নামক বাটী হইতে দুঃসাহসিক ভাবে পলায়ন করিয়া, ১৮১০ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতিমধ্যে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস বলবন্তসিংএর দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে বেনারস রাজের উত্তরাধিকারী রাজা বলিয়া প্রচার করেন ও জমিদারী সনদ্ প্রদান করেন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ রাজা হন এবং ১৮০৫ খৃঃ অব্দে আবার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ-নারায়ণ বাহাদুর রাজা হন।

মহারাজ উপাধিধারী ঈশ্বরীনারায়ণপ্রসাদ পরে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের দরবারে G. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইনি রামনগরেই বাস করিতেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ক্রমে ১৩টী তোপের সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। (Murray's Hand Book of Bengal 1881.)

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হিজহাইনেস্ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (G. C. S. I.) রামনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সাধারণ্যে ইনি এক্ষণে মহারাজ বেনারস বা কাশীনরেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাশীর রাজাবলীর মধ্যে যতদূর জানা গিয়াছে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বিবৃত হইল। ইঁহারা সকলেই কাশীরাজ্যের শাসক ও পরিচালক লৌকিক রাজা মাত্র। কিন্তু আর্য্যগণ নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত কাশীরাজ ইঁহারা নহেন। সেই স্বার্থপরতা পরিশূন্য নিষ্ঠাবান ও সাধনতৎপর দেবতুল্য ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষি-

গণই প্রকৃত কাশীর অধিরাজ পদবাবাচ্য। তাঁহারা কেবল কাশীরাজ্যের উপরই তাঁহাদের জীবিতকালের জন্য নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা সমগ্র ভারতের সমস্ত আর্য্যজাতির উপর সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। সেই কপিলের 'সাংখ্য' গৌতমের 'ন্যায়' পাণিনীর 'ব্যাকরণ' সমস্তই এই স্থান হইতে প্রচারিত। সেই বাল্মীকি, ব্যাস, সেই বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মগণ এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামের নিত্যশুদ্ধ ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতেই ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের সকল বিধি [illegible] ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই দুর্দ্দিনেও জগৎপূজ্য তুলসীদাস, কবীর, মহাত্মা ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ স্বামী, ঠাকুর সদানন্দ সরস্বতী, মৌনীবাবা, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, কাষ্ঠজিহ্বা স্বামী, অঘোরী বাবা ও বাবা কেনারাম প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কাশীর সেই পবিত্র আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও কত মহাপুরুষ গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে স্থানে স্থানে নিজ নিজ কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া কাশীর সেই মাহাত্ম্য এখনও রক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য-ঋষিগণের সেই পুণ্য-তপোবন পবিত্র বারাণসী-ক্ষেত্র আর্য্যকুল-কলঙ্ক নরাধম আমাদিগের দ্বারাই রাজসিক ও তামসিকতার লীলা-নিকেতনে পরিণত হইলেও, তাহারই অন্তরালে ঘনমেঘা-চ্ছাদিত সবিতাদেবতার মত সনাতন-ধর্ম্মের সার সাত্ত্বিকতা নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীকে যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, তিনি সেইরূপেই দেখিতে পাইবেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা-রাজ্যের ইহাই বিশেষত্ব। এ রাজ্যের রাজতক্ত কোন নর নরপতির দ্বারা

কখনও শোভিত হইতে পারে না, পূর্ব্ববর্ণিত সেরূপ অনিত্য কতশত রাজা মহারাজ তুদিনের তরে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াই বিশ্ব-কোতোয়াল কালভৈরবের করাল কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ কাশীপতিই কাশীর রাজ রাজ্যেশ্বর চিরসম্রাটরূপে রাজরাণী অন্নপূর্ণাসেবিত হইয়া সেই পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ও তাঁহার চির আদরের বারাণসীরাজ্য সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত মুনি ঋষি ও সাধুমণ্ডলী কর্ত্তৃক চিরদিন পরিচালনা করিতেছেন। জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার জয়! জয় পতিতপাবনী গঙ্গা মণিকর্ণিকার জয়!! জয় বিশ্ব-কোতোয়াল কালভৈরবের জয়!!!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাশীর মন্দিরাদি :—

এই পুণ্যতোয়া পতিতপাবনী জাহ্নবীর শান্তি-শীতল-সলিল-সেবিত ত্রিভুবন-বরেণ্য বিশ্বনাথের বারাণসী রাজ্যে কল্পান্তকাল-ব্যাপী কত শত মন্দির যে বিরাজিত রহিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? কালের করাল পীড়নে, তুষ্ট অসুর-দলের বীভৎস তাড়নে, তুরাচারা হীনচেতা নৃশংস ও বর্ব্বরগণের যথেচ্ছ অত্যাচারে কত মন্দির, কত মঠ, কত আশ্রম, কত দেবালয় কোথায় যে ধূলিকণারূপে বিলীন হইয়াছে তাহার হিসাব না থাকিলেও,

এখনও শিবময় কাশীর শিবালয় ও শিবলিঙ্গের সংখ্যা করা বোধ হয় মানবের গণিত শাস্ত্রেরও অতীত। কাশীর গৃহ-প্রাঙ্গণে, অলিন্দ-প্রাচীরে, পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে যথায় দেখ তথায়ই অগণিত শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইবে। কাশীর প্রতি ধূলিকণার মধ্যেও যেন কতশত শিব পরমাণু বিরাজিত রহিয়াছে। আহা! সাধক, তুমি এমন স্থানে বসিয়া অঙ্গ অঙ্গ আর করাঙ্গ ন্যাস করিবে কি? তোমায় যে শিবপরমাণুতে সমাচ্ছাদিত করিয়া দেবাদিদেব বিশ্বনাথ একেবারে ব্যাপক ন্যাস করাইয়া দিয়াছেন। একাধারে ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের ত্রিনয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি, রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মা আমার জীবশিব বিশ্বনাথের বিশ্বকরে কেমন অলৌকিক ভাবে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন! মায়ের নিতান্ত ভক্ত ভক্তসন্তানগণ কেমন সেই অন্নকণা কুড়াইয়া লইতেছেন, মায়ের প্রসাদ পাইয়া তাহাদের চির আকাঙ্খিত ভবজঠর-যন্ত্রণা দূর করিতেছেন। যিনি বিশ্বজননীর সেই পবিত্র প্রসাদসেবনে এমনই ভক্তিবান্ সাধক হইতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য। তাহারও চরণপ্রান্তে এ দীনের সাষ্টাঙ্গে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, ক্রমে কত কল্পান্তরের পূর্ব্বে ও পরে ঐরূপে কত মন্দির, কত মঠ ছিল, কত শত তাহার কোথায় লয় হইয়াছে, আবার সেই সেই স্থলেই কত নূতন নূতন মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! হয়ত কালের গহ্বরে তাহাও একদিন নিক্ষিপ্ত হইবে! কিন্তু কাশী কখনই মন্দিরশূন্য হইবে না। ব্রাহ্মণ্য বা সত্যাদি যুগে যাহা ছিল, কলিতে বৌদ্ধ প্রাধান্য সময়ে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই, ফা-হিয়েন বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে, সে সময় কাশীরাজ্যে

ত্রিশটীরও অধিক বৌদ্ধ বিহার বা মঠ ছিল এবং প্রায় একশত হিন্দু মন্দির ছিল। হুয়েন্থ-সাংএর বিবরণ পাঠে জানা যায়,— সর্ব্ব শুদ্ধ একশতটী প্রধান মন্দির তখন কাশীরাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও বৌদ্ধ বিহার কুড়িটী মাত্র ছিল। কিন্তু কাশীপুরীর মধ্যে তখন একটীও বৌদ্ধ মঠ ছিল না। কুড়িটী কেবল হিন্দু মন্দির ছিল, তাহা অপূর্ব্ব উপবন ও জলাশয়াদি পরিবেষ্টিত সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরময় ছিল। সে সময় বিশ্বেশ্বরের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন বিরাট মন্দিরমধ্যে প্রায় ষড়্ষষ্টি হস্ত (প্রায় একশত ফিট) পরিমিত দীর্ঘ বিশুদ্ধ তাম্রময় দেবাদিদেব বিশ্বনাথের অতি বিশাল ও পরম পবিত্র অনাদি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাত্মা হুয়েন্থ-সাং স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সেই গগন-চুম্বিত বিরাট বিচিত্র মন্দির, তাহারই মধ্যে অপূর্ব্ব রত্নবেদিকাশ্রিত সেই অসাধারণ বিশাল গম্ভীর মূর্ত্তি, হতভাগ্য আমরা এ পাপ-নয়নে তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না। কিন্তু কল্পনার চক্ষে, সেই মন্দির প্রাঙ্গনে সভামণ্ডপের এক প্রান্তে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই মান্যর্ষি-মুনি-সেবিত, সুরাসুর-বন্দিত, দেবাদিদেব বিশ্বনাথদেবের চিন্তা করিলেও এ দীনের প্রতি রোমকূপ পুলকে পূরিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চ হয়। ভক্ত পাঠক! পবিত্র ভাবে একবার সেইরূপ চিন্তা করিয়া দেখ, পরম সুখী হইবে। হায়! বিশ্বনাথের সে পবিত্র আদি মূর্ত্তি নাই। কোন্ সনাতন-ধর্ম্মবিদ্বেষী নিষ্ঠুরের হস্তে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে! চর্ম্ম চক্ষে সাধারণের আর তাহা দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু ধ্যানসিদ্ধ সাধকের চক্ষে তাহার বিলয় হয় নাই। তাহা নিত্য বিরাজমান।

তাহার পর আবার সহস্র সহস্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কুতবের নির্ম্মম অত্যাচারে তাহারও সহস্রাধিক পুনরায় বিচূর্ণ হইল। সেই বিরাট তাম্রমূর্ত্তিও বোধ হয় এই সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে! অনন্তর পুনরায় কত নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল—আর্য্যধর্ম্ম-বিদ্বেষী অওরঙ্গজেব, আর্য্যগৌরব আমাদিগের পরম পবিত্র বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দিরসহ সেই শত শত মন্দির ও মঠ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। এসকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যাহাহউক বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠার বিরাম হয় নাই, আবার সহস্র সহস্র মন্দির প্রতি বর্ষে বিনির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মিঃ জেমশ্ প্রিনসেপ একবার কাশীর এই বর্ত্তমান সহর বেনারসের মন্দিরাদির এক হিসাবপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে জানা যায়—তখন কেবল এই সহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় ১০০০ এক সহস্র হিন্দুমন্দির ও ৩৩৩টী মুসলমানদিগের মসজিদ্ ছিল। অনন্তর তাহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে মিঃ শেরিং যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে নিম্ন-লিখিত মন্দির ও মস্‌জিদের সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন এও এক মোটামুটী হিসাব মাত্র। তবে যতদূর সম্ভব তিনি নির্ভুল হিসাব দিবার জন্যই প্রয়াস করিয়াছেন।

মহল্লা।	মন্দির।	মস্‌জিদ্।
কোতোয়ালি	২৬১	১৯
কাল ভৈরব	২১৬	২০
আদমপুরা	৪৮	৫৫

মহল্লা।	মন্দির।	মসজিদ্।
জৈৎপুরা	৩০	৯৭
চেৎগঞ্জ	৫৩	৩২
ভেলুপুরা	১৫৪	১৬
দশাশ্বমেধ	৬৯২	৩৪
	১৪৫৪	২৭২

ইহার পর ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বেনারসের একজন প্রাচীন অধিবাসী "An old resident" (পুস্তকে তাঁহার নাম নাই) "বেনারাস গাইডবুক" নামে যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে তিনি ১৫৫০টী মন্দির ও ৩০০ তিনশত মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন যে, এখন নিত্যই মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

এই সকল হিসাব হইতে কাশীর আধুনিক মন্দিরসংখ্যা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। বহু কাশীবাসী শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিলাম, আজ কাল মন্দিরসংখ্যা এই বারাণসীর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার হইবে। ইহা অসম্ভব নহে। এসকল ব্যতীত এমন অনেক ক্ষুদ্র ও সামান্য সামান্য মন্দির আছে, যাহা প্রকৃতই গণনাতীত। কথিত আছে, এক সময় অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহ একদিনে এক লক্ষ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। (মিঃ শেরিংও সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন) সেই মন্দিরগুলি একদিনেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ বহু প্রস্তর-শিল্পীকে তাহা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেন। তাহারা এক এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহারই

মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গসমন্বিত মন্দির খোদিত করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে লক্ষ শিবমন্দির নির্ম্মিত হইলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকল মন্দিরাভাস বেনারসের নানাস্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বহু মন্দির খোদিত একখানি প্রশস্ত প্রস্তর মানমন্দিরের নিকট দশাশ্বমেধঘাটে রক্ষিত আছে। যাহাহউক যে সকল মন্দির ও শিবলিঙ্গ নিত্যই পুষ্পাক্ষত-গঙ্গাজলে পূজিত হয়, তাহা বোধ হয়, কাশীবাসী জনমণ্ডলীর সংখ্যারও তিন চারি গুণ অধিক হইবে।

কাশীর মন্দিরসংখ্যার সাধারণ হিসাব এপর্য্যন্ত বর্ণিত হইল। এক্ষণে বারাণসীর প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য, তীর্থ ও দেবালয়াদি সম্বন্ধে বর্ণন করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সকল দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যাহা বিধি আছে, তাহাও পাঠকের জানিয়া রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে নিত্য যাত্রা, অন্তর্গৃহি যাত্রা ও পঞ্চক্রোশী যাত্রাই প্রধান। আর্য্যধর্ম্মবিশ্বাসী কাশীবাসী ব্যক্তি মাত্রেই সেই বিধান অনুসারে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। "কাশীধামের" শেষ অংশে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। * এতদ্ব্যতীত 'কাশীর উত্তরদিক,' 'দক্ষিণদিক' ও 'ঘাটতীর্থ-দেবতার'-যাত্রা ভেদে ত্রিবিধ যাত্রার উল্লেখ আছে। 'কাশীধামের' পাঠক ও সাধারণ যাত্রীদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমরা সেই যাত্রাবিধিই এস্থলে আংশিক গ্রহণ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রথমেই শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরদ্বয়কে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া কাশীনগরীর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণক্রমে ঘাট-বর্ণনার পূর্ব্বদিকস্থিত

দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির বর্ণনা করিতেছি। ইহার সহিত মিলাইয়া এক এক দিক ধরিয়া অগ্রসর হইলেই প্রায় সমস্ত দেবালয় ও তীর্থাদি দেবদর্শনাভিলাষী পাঠকগণের নয়ন গোচর হইবে। প্রাচীন তীর্থাদি সমন্বিত মন্দির দেবালয় ও দেবতা প্রভৃতি অধুনা প্রায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা তাহার মধ্যে এযাবৎ অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহা অবগত হইয়াছি এবং যে গুলি উল্লেখ যোগ্য মনে করিয়াছি, পরবর্ত্তী অংশ হইতে সেই গুলিরই বর্ণন করিতেছি।

বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমেই সর্ব্ব কর্ম্মের সিদ্ধিদাতা গণপতির অর্চ্চনা ও প্রণাম করা আমাদের কর্ত্তব্য। কারণ ইহাই শাস্ত্রাদেশ। বিশেষ স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বেশ্বরও যে গণপতির সহায়তায় এক সময় আপনার চির-পরিচিত মহালক্ষ্মীবিলাস নামক নিজ প্রাসাদ বা পুরীর অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই ঢুণ্ঢিরাজ গণেশের বিষয়ই অগ্রে বলিতেছি।

ঢুণ্ঢিরাজ গণেশ :—

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা তথা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরপথে বামদিকে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে অতি খর্ব্বাঙ্গ স্থূলতনু গজেন্দ্রবদন ও লম্বোদরবিশিষ্ট সিন্দুর-রজত শোভিত শ্রীগণপতি ঢুণ্ঢিরাজ বিরাজিত আছেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনাভিলাষী যাত্রীমাত্রেই ভক্তিভাবে এই গণপতির পূজা করিয়া যান। কাশীখণ্ডে মহাদেব বলিয়াছেন – ঢুণ্ঢি অর্থে অন্বেষণকারী, এই কাশীর মধ্যে সমস্তই ইহাঁর অন্বেষিত। ইহাঁর অনুচর ঢুণ্ঢিদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কারণ ইনি "ঢুণ্ঢিরাজ" বলিয়া প্রসিদ্ধ

বিশ্বেশ্বর মন্দির। (৫৩ পৃষ্ঠা)

হইয়াছেন। ইহাঁকে প্রথমে পরিতুষ্ট করিতে না পারিলে কেহই কোনকালে কাশীপতির কৃপা লাভ করিতে পারেন না। অতএব ভক্তবৃন্দ একবার বদন ভরিয়া বল—"জয় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ঢুণ্ঢিরাজ গণপতয়ে নমঃ।"

বিশ্বেশ্বর-মন্দির :—

বারাণসীর মন্দিরসমূহের মধ্যে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য। কুতব ও অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আদি ও ভূতপূর্ব্ব মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে ধ্বংস হইবার পর তদানিন্তন বিশ্বনাথের পূজারি বা পাণ্ডাগণ পূর্ব্বমন্দিরের নিকটেই স্বল্পবিস্তৃত একখণ্ড ভূমির উপর একটী সামান্য মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাহাতেই প্রায় শতবৎসরকাল ধরিয়া বাবার পূজা অর্চ্চনা করিতেছিলেন। মিঃ প্রিন্‌সেপ বলিয়াছেন—"১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অওরঙ্গজেব বিশ্বনাথের ভূতপূর্ব্ব মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই সমুদায় প্রস্তরাদি উপাদান লইয়াই সেই ভগ্নমন্দিরের উপর মসজিদ্ প্রস্তুত করিয়াছেন।" কথিত আছে সেই সময় পূর্ব্বমন্দির হইতে বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ অত্যাচারী যবনদিগের কলঙ্ককর-স্পর্শের আশঙ্কায় জ্ঞানবাপীর মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইলেন। ভক্তগণ তখন অনাহারে অতি কাতরভাবে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া ধর্না দিয়া পড়িলেন। তাহাতে বাবা কৃপাপরবশ হইয়া স্বপ্নাদেশ দিলেন যে, "আমি জ্ঞানবাপীর মধ্যেই আছি, তোমরা আমার মন্দিরের দক্ষিণের পার্শ্বস্থিত ভূমিতে আমাকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজাদি কর, আমি তাহাতেই আবির্ভূত হইব।" এই আদেশ পাইয়াই ভক্তগণ আনন্দচিত্তে তথায় তখন অতি সামান্য ভাবেই একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বাবাকে

প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং যথাবিধি নিত্যপূজা ও ভোগ-আরত্রিকাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে প্রতিষ্ঠাকালে বাবাকে মন্দিরের এক কোণে প্রথমে রাখা হয় পরে তাঁহাকে উঠাইয়া আর মন্দিরের মধ্যস্থলে আনিতে পারা যায় নাই, বাবা মন্দিরের সেই কোণেই অচল ও অনাদি হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার স্বপ্নাদেশে সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পন্ন হইল! অদ্যাবধি বাবা মন্দিরেই সেই কোণেই রহিয়াছেন। বাবার সেই ভক্তদিগের মধ্যে নারায়ণ ভট্ট নামক এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণই প্রধান। তাঁহারই উপর বাবার কৃপা ও স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় শত বৎসরের মধ্যে আর কোন গণ্ডগোল হয় নাই। মন্দিরেরও কোন বিশেষ উন্নতিবিধান হয় নাই। অনন্তর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরনীয়া অমর কীর্ত্তিবতী ইন্দোরেশ্বরী অহল্যাবাই স্বহস্তে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলে গয়া, কাশী প্রভৃতি ভারতের বহু তীর্থস্থিত দেবালয়ের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়েই বারাণসীর এই বিশ্বেশ্বর মন্দিরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি পাণ্ডাদিগের ইচ্ছাক্রমে সেই স্বল্পবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপরেই বিশ্বনাথের বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইঁহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ ফুট এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ৫১ ফুট। এই মন্দিরটীর নির্ম্মাণ-কৌশল সাধারণ মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ধরণের। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সকল মন্দিরের সম্মুখেই তাহার নাট্যমন্দির বা নাটমন্দির শোভিত থাকে। কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দিরের নাট্যমন্দির মধ্যস্থলে রাখিয়া দুইদিকে দুইটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। দুইটীই দেখিতে প্রায় একরূপ, তবে বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথের মন্দিরটীর [illegible]

উচ্চ ও অধিকতর কারুকার্য্য বিশিষ্ট। নাট্যমন্দিরের উপরও গোলাকার গম্বুজবিশিষ্ট চূড়াদ্বারা শোভিত।

পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহার চূড়াগুলি স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহারাজ যাঁহাকে এই কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণের পরিবর্ত্তে তাম্রমণ্ডিত করিয়া তাহার উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণ স্তবক মাত্র বসাইয়া দিয়াছেন ও অবশিষ্ট অর্থে অসি-সঙ্গম-সন্নিধে তিনি নিজের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক সেই অবধি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরকে সকলেই (বিশেষতঃ য়ুরোপীয়গণ) 'Golden temple' বা স্বর্ণমন্দির বলিয়া আসিতেছেন।

বিশ্বেশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া "Hand Book of Bengal" এর রচয়িতা Edward B. Eastwick, তাঁহার পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠায় এক বিচিত্র অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বের+ঈশ্বর=বিশ্বেশ্বর না বলিয়া "বিষ ও ঈশ্বর= বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনকালে শিব বিষ খাইয়াছিলেন, সেই কারণ বিশ্বেশ্বর হইয়াছেন," ইত্যাদি বলিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের এ এক বিচিত্র অর্থ নহে কি?

ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থিত দেবালয়সমূহ হইতে বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণাদি মন্দির দর্শন করিলে এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থানে দেবদর্শনাভিলাষী কোন যাত্রীর নিকট হইতেই অবশ্য-দেয়-রূপে কোন দর্শনী-কর বা 'tax' আদায় করিবার কড়াকড়ি নিয়ম নাই। আমাদের কালীঘাটের কালী-মন্দির বা অন্যান্য বহু মন্দিরের দ্বারদেশে যেমন একজন ব্রাহ্মণ দ্বাররক্ষকরূপে

দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতি বার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি পয়সা জোর করিয়া আদায় করে, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। যাঁহার যতবার ইচ্ছা তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাদি দর্শন করিয়া আসিতে পারেন, কেহ কোন বাধা আপত্তি করিবেন না। মন্দিরমধ্যে পূজারী বা পাণ্ডার লোকজনও পূজা ও দক্ষিণাদির জন্য সাধারণতঃ কোনরূপ জিদ করেন না। যাঁহার যাহা অভিরুচি তিনি তাহাই দিতে পারেন, কিছু না দিলেও কেহ কোন কথা বলে না। কাশীবাসী বহু ব্যক্তি নিত্য কেবল গঙ্গাক্ষতবিল্বপত্রেই বাবার পূজা করিয়া আসিতেছে। পার্ব্ব-পার্ব্বণে বা মনে হইলে যে কোনদিন কিছু ফল মূল পয়সা দিয়া থাকেন। অতি সামান্য পূজাও এখানে সমাদরে গৃহীত হয়।

বিশ্বনাথের পাণ্ডা ঃ—

প্রাচীন কালে বিশ্বনাথের পূজা অর্চ্চনার ভার যে, কাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহা এক্ষণে সঠিক জানিবার বিশেষ উপায় নাই, তবে অনেকে বলেন বা অনুমান করেন যে, নিবৃত্তিপরায়ণ সাধু সন্ন্যাসীগণই সেকালে বাবার পূজা অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিতেন। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে, মোসলমান আধিপত্যের পূর্ব্বে বা সময়ে শ্রীশ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সাধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাবার পূজা কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন। যিনি তাঁহাদের মধ্যে শেষ পূজারী বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, তিনি "পুরী"নামা এক সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁহারই শিষ্য পরম্পরায় বহুদিন বাবার সেবা চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে লিঙ্গিয়া উপাধিধারী কাশীবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা

গোঁসাই-দলভুক্ত লোক বিশ্বনাথের পাণ্ডা বলিয়া আপনাদের অধিকার প্রতিপন্ন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহারাও বাবার সেবাকার্য্যে নানারূপে নিযুক্ত থাকিতেন। পূর্ব্বকথিত সাধু-মহান্ত ও এই লিঙ্গিয়াদিগের মধ্যে বিশ্বনাথের সেবায়তীর অধিকার লইয়া মাঝে মাঝে বেশ বিরোধও উপস্থিত হইত এবং শেষ নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই বিরোধ অনেকদিন যাবৎ চলিয়া আসিত।

লিঙ্গিয়াগণ লিঙ্গেশ্বর বিশ্বনাথের পাণ্ডা বলিয়াই বোধ হয় লিঙ্গাই বা লিঙ্গিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা সময় সময় বিশেষ পরাক্রমেরও পরিচয় দিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরীসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুরাই অনেক সময় বিশ্বনাথের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাজীর মহান্তরূপে তাঁহারাই বহুদিন পর্য্যন্ত শিষ্যপরম্পরায় কাশীবাসী হইয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক মহান্ত-মহারাজ যখন অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, তখন দিল্লীশ্বর সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র "দারাসেকো" বারাণসীর অন্তর্গত স্বপ্রতিষ্ঠিত দারানগর মহল্লায় অবস্থানকালে সংস্কৃত ভাষা ও আর্য্যধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতেছিলেন, সেই সময় 'ভীমরাম লিঙ্গিয়া' নামক একজন শক্তিশালী ব্যক্তি বাদশাজাদা দারার কৃপায় উক্ত পুরীজীর হস্ত হইতে বিশ্বনাথের সেবা ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার পর যখন শঙ্করপুরী অন্নপূর্ণার মহান্ত-রূপে কার্য্য করিতে ছিলেন, তখন উক্ত লিঙ্গিয়াগণ এত দূর প্রবল হইয়া উঠেন যে, অন্নপূর্ণারও সেবার ভার নিজেদের হস্তে কাড়িয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তখন মহারাজ বলবন্ত সিং কাশীর নরপতি ছিলেন। শঙ্করপুরী মহারাজ বলবন্তের নিকট এই

বিষয় নিবেদন করেন। তাহাতে মহারাজ বিশেষভাবে অনুসন্ধানপূর্ব্বক যে আদেশপত্র প্রদান করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—

"মহারাজ বলবন্ত সিংহের আদেশক্রমে তদীয় প্রতিনিধি রাজা নেওলরায় (৫ই জিকাৎ ৩০ জলুসে) বিশেষভাবে অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়া মহারাজের নামাঙ্কিত ও মোহরযুক্ত আদেশপত্রে ও মহান্তজী শঙ্করপুরীই অন্নপূর্ণা-ভবানী ও বিশ্বনাথের প্রকৃত সেবায়েৎ ও মালিক সাব্যস্ত করেন। এবং ইহাতে ইহাও প্রকাশ রহিল যে, আত্মারাম লিঙ্গিয়া প্রভৃতি কেহই যথার্থ মালিক নহে।"

অনন্তর তদীয় শিষ্য মহান্ত সহজচাঁদপুরী মন্দিরের মালিকানী বা গদী প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবসের জন্য তীর্থযাত্রাব মানসে জনৈক প্রতিবাসী ও অত্যন্ত অনুগত এক লিঙ্গিয়ার হস্তে মন্দিরের ও পূজার ভার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু তীর্থ হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিকট হইতে অতি কষ্টে তাঁহার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়া লিঙ্গিয়াগণ এত দূর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন যে, রীতিমত দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে কৃতকার্য্য না হইয়া মহান্তজীর অনুগত হইয়া পড়েন। অনন্তব তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বম্ভর, লীলা, নারদ ও তারা এই চারিজন লিঙ্গিয়া মহান্তজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে এবং নিজেদের নানা দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করিলে, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহান্তজী কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের উপর বিশ্বনাথের সেবার ভার অর্পণ করেন। তাহাতে উক্ত লিঙ্গিয়াগণ যে 'প্রতিজ্ঞাপত্র' লিখিয়া দেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—

"মহাত্মা সহজচাঁদ পুরীকে বিশ্বম্ভর, লীলা, নারদ ও তারা লিঙ্গিয়াগণ এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতেছে যে, আমরা বংশ-পরম্পরায় আপনাদের সেবা শুশ্রূষা করিব। যদি তাহা না করি, তাহা হইলে আমরা বিশ্বনাথের ও অন্যান্য দেবতার পূজাদি কার্য্য হইতে বেদখল হইব। এবং আপনি উহার সর্ব্বময় মালিক হইয়া পূজাদির যদৃচ্ছা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ইতি সন ১১৬৬ ফসলি বৈশাখ কৃষ্ণ একাদশী।"

উহাতে সাক্ষী ছিলেন, বালকনাথ যোগী, গোঁসাইজী, বেণী চৌধুরী, রায়অখিলপুরী, লক্ষ্মীনাথ ও তুলসী প্রভৃতি। এই দলিল ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কোন মামলা উপলক্ষে ইংরাজী আদালতে দাখিল হইয়াছিল। যাহাহউক সেই অবধি লিঙ্গিয়াগণ বিশ্বনাথের পাণ্ডারূপে সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের পর শেষ পাণ্ডা দেবীদত্তের পুত্র রামদত্ত বিশ্বনাথের খাস পাণ্ডা ছিলেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে তাঁহাদের দুই বিধবা স্ত্রীই পাণ্ডাইনরূপে বাবার সেবা করিতে-ছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের অবর্ত্তমানে রামদত্তের মাতুল বিশ্বেশ্বর দয়ালের পৌত্র উমাশঙ্কর ত্রিপাঠী কাশীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকিল গৌরহরি চক্রবর্ত্তীর যত্নে ইংরাজের বিচারালয়ে পাণ্ডা স্থিরীকৃত হন। গৌরহরিবাবু তাঁহার ওকালতির পারিশ্রমিক রূপে বিশ্বনাথের পাণ্ডার কিছু অংশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধা মাতার আদেশে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে অন্য ভাবে এখনও বার্ষিক কোন বন্দোবস্ত আছে শুনিতে পাওয়া যায়। উমাশঙ্করই এতদিন বিশ্বনাথের একমাত্র পাণ্ডা ও সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে কার্য্য করিতেছিলেন। এক্ষণে শ্রীমান মহাবীর

ত্রিপাঠী ও তাঁহার অন্য ভ্রাতাগণ বিশ্বনাথের পাণ্ডা। ইহারা সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। মহাবীর পাণ্ডার উদ্যোগে এক্ষণে বিশ্বনাথের পূজাপাঠ, সাধুসেবা, অন্নকোট আদির উত্তম বন্দোবস্ত হইয়াছে। মহাবীরের সদ্‌গুণের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বনাথ পাণ্ডাদের ধর্ম্মবুদ্ধি বজায় রাখুন।

বিশ্বনাথের দানকুণ্ড :—

বিশ্বনাথের মন্দিরমধ্যে লিঙ্গাধার বা একটী চতুষ্কোণ গহ্বর আছে, উহার দৈর্ঘ্য বিস্তারে দুই হস্ত এবং গভীরতায় প্রায় এক হস্ত পরিমিত হইবে। উহা কখন কখন সমৃদ্ধিশালী জনমণ্ডলী-কর্ত্তৃক নানা রত্ন ও অলঙ্কার অথবা টাকা, কড়ি বা পয়সায় পূর্ণ করিয়া বিশ্বনাথকে উৎসর্গ করেন শুনিতে পাওয়া যায়, কেবল মাত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহই উহাতে স্বর্ণ-মুদ্রায় বা মোহরে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, কয়েক ব্যক্তি রজত-মুদ্রা বা টাকায় পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং অনেকে তাম্র-মুদ্রা বা পয়সাদ্বারাও পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ অর্থের সংব্যবহারহেতু তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথের সেবাবিধি ও আরতি :—

বিশ্বেশ্বরের সেবায় বহু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেহ মন্দির ধৌত ও পরিষ্কারের জন্য, কেহ নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য, কেহ চামর, কেহ ঘণ্টা, কেহ শিঙ্গা, কেহ শঙ্খ, ডমরু ও দামামা প্রভৃতি বাজাইবার জন্য, কেহ বা পূজা, কেহ আরত্রিকাদি বাবার সেবায় নানা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের রাজবেশ। (৬১ পৃষ্ঠা)

বহু স্থানে দেব বিগ্রহের পূজা ও আরতি দেখিয়াছি, কিন্তু বিশ্বনাথের আরতি প্রকৃতই এক অদ্ভুত ও দেখিবার জিনিস। তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে, ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। সেই প্রাণ-মন-মোহিতকর পবিত্র স্তোত্র—কেমন একস্বরে বিশুদ্ধ তাল লয়ে, নাগরা, ডমরু ও ঘণ্টাধ্বনির সহিত তালে তালে মিলিত হইয়া গীত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাবা বিশ্বনাথের চারিধারে কত সন্ন্যাসী, সাধু, কত ব্রাহ্মণ, পূজারী একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আরতি-প্রদীপ হস্তে বাবাকে আরতি করিতেছে। সেই পবিত্র ভাবে দর্শকের হৃদয় অল্পক্ষণের জন্য যেন উন্মত্ত করিয়া তুলে, অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় তাহা দেখিয়া বিগলিত হইয়া যায়। বাস্তবিক তাহার বর্ণনা করা বোধ হয় মনুষ্যের ভাষাতীত।

নিত্য সন্ধ্যার পর দুইবার বাবার আরতি হইয়া থাকে। একবার সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরেই সাধারণ আরতি, তাহার পর রাত্রি ৯টার পর বাবার শৃঙ্গারারতি হয়। উহাও ভক্ত মণ্ডলীর একবার দেখিবার বিষয়। নাগকোটের ক্ষেত্র বা ছেত্র হইতে বাবার শৃঙ্গারের জন্য নিত্য বহু ব্যক্তি ও সাধু "শিব শিব শম্ভো" রবে চারি দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া বাবার আরতি সেবা করিয়া যান। প্রথমে মন্দিরতল শত শত কলসী গঙ্গাজল দিয়া ধৌত হইলে পূজারীগণ বাবার মস্তকে কলসী কলসী দুগ্ধ ঢালিয়া স্নান করাইয়া দেন, তাহার পর পুনরায় জাহ্নবীজলে বাবাকে স্নান করাইয়া চন্দনচর্চ্চিত ও বিভূতিমণ্ডিত করিয়া দেন, বিবিধ পুষ্পমাল্য ও স্বর্ণ-সর্প-ভূষণাদি দ্বারা রাজবেশে সজ্জিত করিয়া দেন, তাহার পর কর্পূরাদি দ্বারা যথাবিধি আরতি ও দীপাবলী দান করেন, প্রকৃতই

তাহা অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। পার্শ্বে স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত মণিমুক্তা-খচিত খট্টা বাবার শয়নের জন্য সজ্জিত হয়। অনন্তর রাত্রি ১১টার সময় সাধারণ ভাবে বাবার শেষ আরতি করিয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। পুনরায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বাবার মঙ্গলারতি হইলে দ্বার মুক্ত করা হয়। মধ্যাহ্ন সময়েও বাবার ভোগারতি হইয়া থাকে। বিশ্বনাথের পূজা ও আরতির জন্য নাগকোট ছত্র হইতে নিত্য ২।৩ মণ দুগ্ধ ও বহু উপচার প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।

বৈকুণ্ঠনাথেশ্বর:—

বিশ্বনাথের মন্দিরমধ্যে বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ ব্যতীত আরও কতকগুলি দেববিগ্রহ আছে। তন্মধ্যে নাটমন্দিরের মধ্যস্থলেই এক গহ্বরমধ্যে 'বৈকুণ্ঠনাথেশ্বর' মহাদেব আছেন। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসের বৈকুণ্ঠচতুর্দ্দশীতে তাঁহার বিশেষ পূজাবিধান হইয়া থাকে। আর্য্যকুলললনাগণ সেইদিন বহু ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বিশ্বনাথ-দর্শনার্থী তাঁহাকে দর্শন না করিয়া বাবার মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কারণ, সকলকেই নাটমন্দির অতিক্রম করিয়া তবে বাবার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রধান মন্দিরের মধ্যেই ঈষাণকোণে কাশীশ্বর স্বয়ং বিরাজিত রহিয়াছেন।

দণ্ডপাণিশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর:—

বৈকুণ্ঠনাথেশ্বরের পশ্চিমদিকে স্বতন্ত্র মন্দিরের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'দণ্ডপাণিশ্বর' মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। সকল যাত্রীই প্রথমে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া পরে ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহাঁর পশ্চাতে এক বিনায়ক মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

বিশ্বনাথের মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়াই দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্নিকোণে একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই 'অবিমুক্তেশ্বর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারই পার্শ্বে প্রত্যেক যাত্রী কিয়ৎক্ষণের জন্য একখানি পাথরের উপর বসিয়া স্থির চিত্তে নয়ন মুদিয়া ভগবানকে চিন্তা করিয়া থাকেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে :— দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার অনুরোধে ও পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দারের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবসের জন্য কাশীপুরী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বা কাশীর সংসর্গ বিমুক্ত হইয়া অন্যত্র গমন করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া কাশীশ্বর স্বয়ং নিজেকে এই শিবলিঙ্গরূপে তাঁহার "মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস" নামক প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব বা অগ্নিকোণে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। সেই হেতু ইহাঁর নাম 'অবিমুক্তেশ্বর' এবং তখন হইতেই এই স্থান বা বারাণসী ক্ষেত্রের নাম "অবিমুক্তক্ষেত্র" হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে জগতে আর কেহই শিবলিঙ্গের আকৃতি বা উহাঁর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অবগত ছিলেন না। ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যাহাহউক এই অবিমুক্তেশ্বর জগতের আদি লিঙ্গ। মাঘ মাসের চতুর্দ্দশীতে ভক্তজন উপবাসী হইয়া অবিমুক্তেশ্বরে নিশাযাপন করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মীমাধব, অহল্যাবাই, পার্ব্বতী ও আনন্দ-ভৈরব :—

বিশ্বনাথের নৈঋত-কোণস্থিত গৃহমধ্যে 'সলক্ষ্মীমাধব' বা বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। বায়ুকোণে একটী স্বর্ণকান্তি ধাতুময়ী

প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে। সাধারণে তাঁহাকে পার্ব্বতী মূর্ত্তি বলিয়াই জানেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা পুণ্যবতী 'অহল্যা-বাইয়ের' প্রতিমূর্ত্তি। অনন্তর ঈশান কোণস্থিত গৃহে 'আনন্দ-ভৈরব' অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারই নিকট একটী দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহাই 'পার্ব্বতীর' মূর্ত্তি। পাণ্ডাগণ তাহাকে "ভোগ-অন্নপূর্ণা" বলিয়া বর্ণনা করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক শিবলিঙ্গ ও মূর্ত্তি মন্দিরের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে বলেন এইগুলির মধ্যে একটী রাণী অহল্যা-বাইয়ের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশ্বনাথের রন্ধনশালা ও অন্নকোট ঃ—

বিশ্বনাথের মন্দিরের উত্তর বারাণ্ডার উপরতলায় বাবার পাকশালা। তথায় বাবার ভোগাদি প্রস্তুত হয়। দিপালী বা দিয়ালীর পরদিন বাবার গৃহে "অন্নকোট্" উৎসব হয়। বহু অন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন আদি বাবার মন্দিরে স্তূপীকৃতভাবে রক্ষিত হয়। ভক্তমণ্ডলী তাহা দর্শন ও পরে তাহার প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান পাণ্ডার বিশেষ ব্যবস্থায় আজকাল নিত্য কতিপয় দণ্ডী-সাধুসন্ন্যাসীকে মধ্যাহ্নে বাবার প্রসাদ ভিক্ষা দেওয়া হয়।

মুক্তিমণ্ডপ ঃ—

পূর্ব্ববর্ণিত বিশ্বেশ্বর আদি লিঙ্গ ও অবিমুক্তেশ্বর সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, "মুক্তি-মণ্ডপ" বা "নির্ব্বাণমণ্ডপ" নামক মুক্তিক্ষেত্রও পূর্ব্বে ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল। সেই কারণ মুক্তিমণ্ডপ বিষয়ে এই স্থলেই

উল্লেখ করিতেছি। কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায় "মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস" নামক কাশীশ্বর বিশ্বনাথের পরম প্রীতিপ্রদ প্রাসাদ বা মন্দিরের দক্ষিণদিকে এক মণ্ডপ আছে, তথায় তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তাহাই তাঁহার সভামণ্ডপ, জগতে তাহাই 'মুক্তিমণ্ডপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।* এতদ্ব্যতীত প্রাসাদের উত্তরদিকে 'ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ' ও পূর্ব্বে জ্ঞানবাপীর সমীপে 'জ্ঞানমণ্ডপ' নামে আরও দুইটী মণ্ডপ ছিল। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন অস্তিত্ব এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ বিশ্বনাথের সে প্রসিদ্ধ পূর্ব্বমন্দির বহুদিন হইল বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অধুনা বিশ্বনাথের যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানবাপীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। সুতরাং সেই মুক্তিমণ্ডপ এক্ষণে বিশ্বনাথের উত্তর দিকেই অবস্থিত বলিতে হইবে। সাধারণ অন্তর্গৃহী বা পঞ্চক্রোশী যাত্রীগণ সেই কারণ জ্ঞানবাপীর পার্শ্বেই নূতন মণ্ডপমধ্যে এখনও সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। কাশীখণ্ড পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় "সেই মুক্তি বা নির্ব্বাণমণ্ডপে একটী বেদমন্ত্র পাঠ করিলে সর্ব্বমন্ত্র পাঠের ফল লাভ হয়। একবার প্রাণায়াম করিলে অযুত বৎসর অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়ার ফল হয় এবং ষড়ক্ষর শিবমন্ত্র জপ করিলে কোটিরুদ্র জপের ফল হয়। অধিককথা কি, এই দক্ষিণমণ্ডপে যে কোনও সৎকর্ম্ম করিলে জীব শিবলোক এমনকি শিবত্ব বা ব্রহ্মত্বও লাভ করিতে পারে।" বিশ্বনাথের এই আদেশ ও আশ্বাসবাণী ভক্তের হৃদয়ে যে অদম্য-আশা ও ভরসায় পূর্ণ করিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত অবিমুক্তেশ্বরের পার্শ্বে একখানি পাথরের উপর প্রত্যেক যাত্রীই একবার বসিয়া শিবমন্ত্র জপ করিয়া

থাকেন। এই স্থানকে অনেকে ভক্তবৃন্দের 'বিশ্রামমণ্ডপ' বলিয়াও বর্ণনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, মুক্তিমণ্ডপের মাহাত্ম্য অধুনা যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সঙ্কল্পাদির জন্য জ্ঞানবাপীর জলের সহিত অবর্জ্জনীয় সম্পর্ক থাকা প্রযুক্ত তৎসংলগ্ন মণ্ডপকেই সাধারণতঃ সকলে মুক্তিমণ্ডপ বলে, আবার অবিমুক্তেশ্বরের পার্শ্বে অর্থাৎ বিশ্বনাথের আধুনিক দক্ষিণ-মণ্ডপটী জীবের সহজমুক্তির আধার বলিয়া তাহাও ভক্তের পরম আকাঙ্ক্ষার স্থান হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তির এরূপ বিভাগ ব্যবস্থা মন্দ হয় নাই। পূর্ব্বকালে যোগী ঋষি সিদ্ধ সাধকগণ বিশ্বনাথের সেই প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণস্থিত দালানে বসিয়া আর্য্যশাস্ত্র সমূহের নানা নিগূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিতেন, বেদান্তাদি গভীরতম দার্শনিক বিষয়ের শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। এখনও জ্ঞানবাপী-সংলগ্ন প্রসিদ্ধ মুক্তিমণ্ডপ নামক দালানের মধ্যে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। যাহাহউক বর্ত্তমান বিশ্বনাথের মন্দিরের দক্ষিণ দিকের ক্ষুদ্র দালানটীকেও আংশিক মুক্তিমণ্ডপ বলা যাইতে পারে।

মন্দির ও মণ্ডপের নানা স্থানে যে সমুদায় ঘণ্টা দোদুল্যমান আছে, তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট সেটী কোন সময়ে নেপালের একজন শিবভক্ত মহারাজ কর্ত্তৃক উৎসর্গিত হইয়াছিল।

এই মন্দিরের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একটী স্বতন্ত্র দ্বারবিহীন দালানের মধ্যে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একত্র রহিয়াছে। স্থানীয় লোক ইহাকে 'শিবসভা' বা 'শিবের কাছারী' বলিয়া অভিহিত করে। বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই

শিবসভাও এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মন্দিরের দক্ষিণস্থিত মুক্তিমণ্ডপই সে সময় শিবসভা বলিয়া উক্ত হইত। ইহার অন্তর্গত শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যে এরূপ বহু মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে গুলি দেখিলে বহুকালের প্রাচীন লিঙ্গ বলিয়াই মনে হয়। অনেকে বলেন, প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দির কুতব কর্ত্তৃক বিচূর্ণ হইবার সময় পাণ্ডা ও পূজারীগণ এই মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে এই শিব সভায় রক্ষা করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তি অনেক দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেটী বিশ্বনাথের একজন ভক্ত সাধু পূজারীর প্রতিমূর্ত্তি। পূজা করণান্তর শিবমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার শিবত্বলাভ হয়।

জ্ঞানবাপী তীর্থ ঃ—

বিশ্বনাথের মন্দিরের ঠিক উত্তর পার্শ্বে বিস্তৃত ক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড কূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকেই সকলে জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকূপ বলে। কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, ইহা প্রাচীন মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। কূপ কোন কালে নাড়াইবার বা সরাইবার বস্তু নহে, সুতরাং পূর্ব্বে যে স্থলে ছিল এখনও সেই স্থলেই আছে। মন্দিরের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই কারণ কাশীখণ্ডের সহিত এক্ষণে সামান্য অমিল হইয়া গিয়াছে। এই কূপের গভীরতা জলের উপর পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫ ফিট্ হইবে, কূপের মধ্যে নামিবার এক সোপানশ্রেণী আছে। কিন্তু তাহার দ্বার সতত: তালাবদ্ধ থাকে, কখন কখন কূপ পরিষ্কার করিবার

জন্যই তাহার ব্যবহার হয়। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। কথিত আছে, কোন কালে একাধিক্রমে দ্বাদশবর্ষ বা একযুগব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় কাশীরাজ্য বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন একজন মহাতপা ঋষি অন্যান্য বহু সহস্র ঋষিকে সমবেত করিয়া শিবের আরাধনা করেন ও আরাধনায় সিদ্ধ হইলে, শিবের আদেশ অনুসারেই এই কূপ খনন করান হয়, তাহাতে কাশীরাজ্যবাসীর জীবনরক্ষা হয়। সেই অবধি প্রবাদ আছে, দেবাদিদেব শিব চিরদিনই এই স্থানে অবস্থান করিবেন; সেই ভক্তঋষির নিকট তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া আছেন।

কাশীখণ্ডে ৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, "রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানের ভূমি খনন করিয়া একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপী মহালিঙ্গকে সেই কুণ্ড হইতে সহস্র কলস জল লইয়া স্নান করাইলেন, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রকে বর দিলেন যে, আমার শিব শব্দের অর্থ জ্ঞান, সেই জ্ঞানই এখানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এইজন্য এই তীর্থ 'জ্ঞানদ' নামে অভিহিত হইবে। এই তীর্থ স্পর্শে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট ও আচমন করিলে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। ইহার নাম যথাক্রমে 'শিব-তীর্থ,' 'জ্ঞান বা জ্ঞানবাপী-তীর্থ' ও 'মোক্ষ-তীর্থ'। এই তীর্থ-জলে শিবলিঙ্গ স্নান করাইলে সর্ব্ব তীর্থের ফল লাভ হয়। আমি এই স্থানে জ্ঞানস্বরূপ দ্রব-মূর্ত্তিতে জীবের জড়তা বিনাশ করিয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদান করি।" পরবর্ত্তী ৩৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "দণ্ডনায়ক এই জ্ঞানবাপীর জল দুর্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সুভ্রম ও বিভ্রম নামক

গণদ্বয় দুর্ব্বৃত্তগণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। শাস্ত্রে মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির বিষয় উক্ত আছে, জ্ঞানবাপী তাহারই অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি।"

এতদ্ব্যতীত যখন দুষ্ট যবন বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির নষ্ট করে, তখন একজন ভক্ত বিশ্বনাথের পবিত্র মূর্ত্তি কলুষিত হইবার আশঙ্কায় গোপনে এই কূপমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বলেন, কালাপাহাড় কাশীর দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করিবার সময় বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানবাপীর জলে বিলীন হইয়াছিলেন, অনন্তর বিশ্বনাথের পরমভক্ত নারায়ণ ভট্ট নামক জনৈক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানবাপীর দক্ষিণে বর্ত্তমান মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতানুসারে ভগবান বিশ্বনাথ সেই বাণলিঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

এই সকল কারণে জ্ঞানবাপী ভক্তের অতি পূজার্হ। এখনও লোকে বিশ্বনাথের উদ্দেশে এই কূপমধ্যে পুষ্প চন্দন বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া থাকে। নিত্য পুষ্প ও পত্রাদি পড়িয়া কূপের জল দুর্গন্ধ হইয়া যায়, সেই জন্য উহার উপর লৌহের জাল দিয়া এক্ষণে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে ও একখণ্ড বস্ত্র সততঃ উহার উপর বিস্তৃত থাকে। যাহা কিছু ফুল পত্র তাহারই উপর পতিত হয়। ইহাতে কূপের জল সেরূপ দূষিত হইতে পারে না। যাত্রীগণ ভক্তিভরে এই জল বিশ্বনাথের চরণামৃত বোধে পান করে।

এই পবিত্র কূপের উপর ১৮২৮ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারপতি মহারাজ দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার বিধবা মহিষী পুণ্যবতী মহারাণী বৈজাবাঈ একটী বিস্তৃত দালান প্রস্তুত করিয়া দেন। দালানের

ছাদটী প্রতি সারে দশটী করিয়া, চারি সারে মোট চল্লিশটী অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই দালানের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসী যাত্রিগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন। এক্ষণে ইহাই মুক্তিমণ্ডপ বলিয়া অভিহিত।

নন্দী বা বিশ্বনাথের ষাঁড় ঃ—

পুণ্যসলিল-গর্ভা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবাপীর পূর্ব্ব পার্শ্বে বিশ্বনাথের বাহন (এদেশে ইহাকে নন্দী বলে) এক প্রকাণ্ড প্রস্তর-বৃষ উত্তরাস্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা উপবিষ্ট অবস্থাতেও উচ্চে প্রায় সাত ফুট হইবে। নেপালের কোন এক মহারাজ কর্ত্তৃক এই বৃষমূর্ত্তিটী প্রাচীনকালে স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ মহারাজ যে ইহার স্থাপনা করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইহা যে স্থাপিত ছিল, তাহা এক কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ যখন যবনগণ কর্ত্তৃক বিশ্বনাথের পূর্ব্ব মন্দির ও মূর্ত্তিসমূহ বিনষ্ট হইতেছিল, সেই সময় এই প্রস্তরবৃষ কি এক দেববলে চৈতন্য লাভ করিয়া বিকট নাদে চিৎকার করিয়াছিল। সেই হেতু এখনও এই বৃষের মুখটী বিশ্বনাথের পূর্ব্ব মন্দিরের প্রতিই বা বর্ত্তমান মসজিদের দিকেই সমভাবে রহিয়াছে। বিশ্বনাথের মন্দির স্থানান্তরিত হইলেও এই নন্দী বা বৃষমূর্ত্তিটী কেহ স্থানচ্যুত করেন নাই।

তারকেশ্বর ঃ—

বিশ্বনাথমন্দিরের উত্তর পূর্ব্বদিকে ভূমিতলেই তারকেশ্বরের প্রাচীন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্তিম কালে এই তারকেশ্বরই প্রত্যেক কাশীবাসীকে "তারক ব্রহ্ম" মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

মণিকর্ণিকার সম্মুখেও আর একটী তারকেশ্বর-মন্দির আছে কিন্তু এইটীই আদি-তারকেশ্বর বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত বিশ্বনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত নূতন নির্ম্মিত যে মন্দির আছে, তাহাও তারকেশ্বরের মন্দির বলিয়া সকলে উল্লেখ করেন।

হরপার্ব্বতী ঃ—

ইহার নিকটেই একটী অল্প উচ্চ বেদির উপর প্রস্তরে খোদিত এক হর-গৌরি মূর্ত্তি আছে। মিঃ শেরিং বলিয়াছেন "হায়দ্রাবাদের এক রাণী কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে," কিন্তু 'হ্যাণ্ডবুক অফ বেঙ্গলের' রচয়িতা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, "হায়দ্রাবাদের নিজাম মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহার রাণী বেগম বলিয়া পরিচিত এবং তিনিও নিশ্চয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নহেন। সুতরাং হায়দ্রাবাদে সেরূপ কোন রাণী কখনই ছিলেন না। কিন্তু আমরা জানি হায়দ্রাবাদাধিপতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রী হিন্দুই হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা মহামান্য নিজাম কর্ত্তৃক মহারাজ উপাধিতে সম্মানিতও হইয়া থাকেন; অতএব সেই মন্ত্রীপত্নীরা মহারাণী বা 'রাণী' সম্মানেই অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন সময়ে এইরূপ কোন মন্ত্রীমহিষী 'রাণী' কর্ত্তৃক ইহা যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান নিজামের অধীনে অনেক রাজা হিন্দুও আছেন জানা গিয়াছে। আর এক কথা নিজামরাজ্য মোসলমান অধিকার ভুক্ত হইবার পুর্ব্বে নিশ্চয়ই যে কোন হিন্দু রাজার অধীনে ছিল,

তাহাতে সন্দেহ নাই।

অক্ষয়বট, আদিত্য ও দ্রৌপদী:—

পূর্ব্ববর্ণিত প্রস্তরময় বৃষ-মূর্ত্তির সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ইহাকে 'অক্ষয়বট' বলে। বিশ্বনাথ দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ এই অক্ষয় বৃক্ষকে পূজা করিয়া থাকেন। ইহার মূলে আদিত্য ও দ্রৌপদীর মূর্ত্তি দর্শন ও পূজা করা কর্ত্তব্য। বিশ্বনাথের মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী স্বতন্ত্র গৃহসংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত বটবৃক্ষ আছে, তাহাও 'অক্ষয়বট' বলিয়া সাধারণের পূজাহ। এই বাটীতে হনুমানজীর এক প্রকাণ্ড পাষাণ মূর্ত্তি আছে।

বিশ্বনাথের মন্দির সম্পর্কে এপর্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা বলা হইল। এক্ষণে অন্নপূর্ণার মন্দির সম্বন্ধে উক্ত হইতেছে। পাঠক এইবার মাতৃমন্দির দর্শন করুন।

অন্নপূর্ণা:—

কাশীরাজরাজেশ্বরী জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণা বিশ্ববাসী জীবরূপ শিবের বিশ্বকরে অহরহঃ অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। বিশ্বনাথের রাজ্যে মায়ের করুণায় কেহই ত অনশনে জীবন অতিবাহিত করে না, সন্তান অভুক্ত থাকিবে, মায়ের অন্তরে কি তাহা সহ্য হয়? তাই বুঝি মায়ের ইঙ্গিতে অগণ্য অন্নছত্র বারাণসীর চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী হিন্দুকুলমহিলাগণ মহামায়া অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে আসিয়া নিত্য কতই যে অন্ন বিলাইতেছেন, তাহারই বা কে হিসাব করিবে? এই সব দেখিয়া বস্তুতঃই মনে হয়, ভক্ত কাশীদর্শনাভিলাষী একবার নয়ন ভরিয়া দেখ দেখি—হিন্দুকুললক্ষ্মীরা প্রকৃতই এখানে অন্ন-

অন্নপূর্ণার মন্দির। (৭২ পৃষ্ঠা)

পূর্ণাসদৃশা কি না? মাতৃসহচরী জননীকুল মায়ের এই পবিত্র মন্দিরের কতই না শোভা বর্দ্ধন করিয়া রাখিয়াছেন! মা কাশী-প্রাণা কাশীরাজ্যে যেন অনন্তরূপে প্রত্যক্ষভাবে বিরাজমানা রহিয়াছেন। কোন্ অতীত যুগে মায়ের যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। কত বিপ্লব, কত দুর্ঘটনায় মায়ের সে পবিত্র মন্দির হয়ত কতবার জীর্ণ বিচূর্ণ ও সমভূমি হইয়া গিয়াছে, আবার কতবার কত ভক্ত-সন্তান কর্তৃক যে সেই ভূমির উপরেই মায়ের নূতন মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করাও বস্তুতঃ দুরূহ। তবে ধর্ম্মান্তরবিশ্বাসী ও সনাতন ধর্ম্মবিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব কর্তৃক মায়ের মন্দির যে শেষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের কথা—তখন সেই ভগ্ন মন্দিরই সামান্যরূপ ভাবে মেরামত করিয়া মায়ের পূজা অর্চ্চনা চলিতেছিল। সুখের বিষয় বিশ্বনাথের মন্দিরের ন্যায় মায়ের এই মন্দিরসহ ভূমি পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব অধিকার করেন নাই। মায়ের পবিত্র মূর্ত্তিও যবনকরে কলুষিত হয় নাই। তবে বর্ত্তমান মন্দির অপেক্ষা তখনকার মন্দির যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। তাহার পর প্রায় পঞ্চষষ্ঠি বৎসর অতিবাহিত হইলে সম্বত ১৭৮০ বা ইং ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মায়ের পরম ভক্ত জনৈক দাক্ষিণী রাজা "বিষ্ণুপন্থ গাজাড়েজী" (তিনি তদানিন্তন অন্নপূর্ণার প্রসিদ্ধ মহান্ত জগন্নাথপুরীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন) অন্নপূর্ণার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫৭৷৷০ ফিট এবং প্রস্থে প্রায় ১৯৮ ফিট হইবে। মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর ও মনোরম। মায়ের সেই প্রস্তরময়ী আদি মূর্ত্তিটী এতদিনে অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সেই

মূর্ত্তি সততই স্বর্ণাবরণে আবৃতা থাকে। দর্শনাভিলাষী ভক্ত সন্তানগণকে পূজারীরা বস্ত্রের কাণ্ডার খাটাইয়া অতি গোপনে সেই অনাবৃতা মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন। সে মূর্ত্তি দেখিলে সুস্পষ্টরূপে অনুভব হয় যে, ইহাই মায়ের প্রাচীন ও আদিমূর্ত্তি।

প্রাচীন মন্দিরের একটী স্তম্ভ মন্দিরের মধ্যেই একস্থানে রক্ষিত ছিল। তাহার উপর বহুকালের মৃত্তিকাদি সঞ্চিত হইয়া একেবারে ভূগর্ভজাত হইতেছিল। মায়ের অতি নিষ্ঠাবান ভক্ত বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীমৎ শিবনাথ পুরী তাহা বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই স্তম্ভটী মন্দিরের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উহা ভক্তের যেমন অর্চ্চনার সামগ্রী, পুরাতত্ত্ববাদদিগেরও তেমনি আদরের বস্তু।

বর্ত্তমান মন্দিরের সভামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্ত্তী দালানের মধ্যে সতত বহু সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত-পূজক ও ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে গদ্গদ কণ্ঠে বিবিধ বিশুদ্ধ স্বর-লহরীতে নিত্য 'সপ্তশতী-চণ্ডী' পাঠ করিতেছেন, কেহ ভিক্ষা করিতেছেন, কেহ বা অন্নপূর্ণার সেই নধর গাভীগুলির পরিচর্য্যা করিতেছেন, আবার ইতস্ততঃ বিচরণশীল মৃগ ময়ূরগুলিও যেন সেই তপঃ-যজ্ঞস্থলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিতেছে।

নবরাত্রি বা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে শোভা এতই বর্দ্ধিত হয় যে, তাহা দেখিলে এবং কিয়ৎক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে সেই স্তোত্ররাজ 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' একতান পাঠ শ্রবণ করিলে প্রকৃতই মনে হয় যেন কোন পুণ্যফলে সহসা সত্যযুগপ্রবর্ত্তিত কোনও
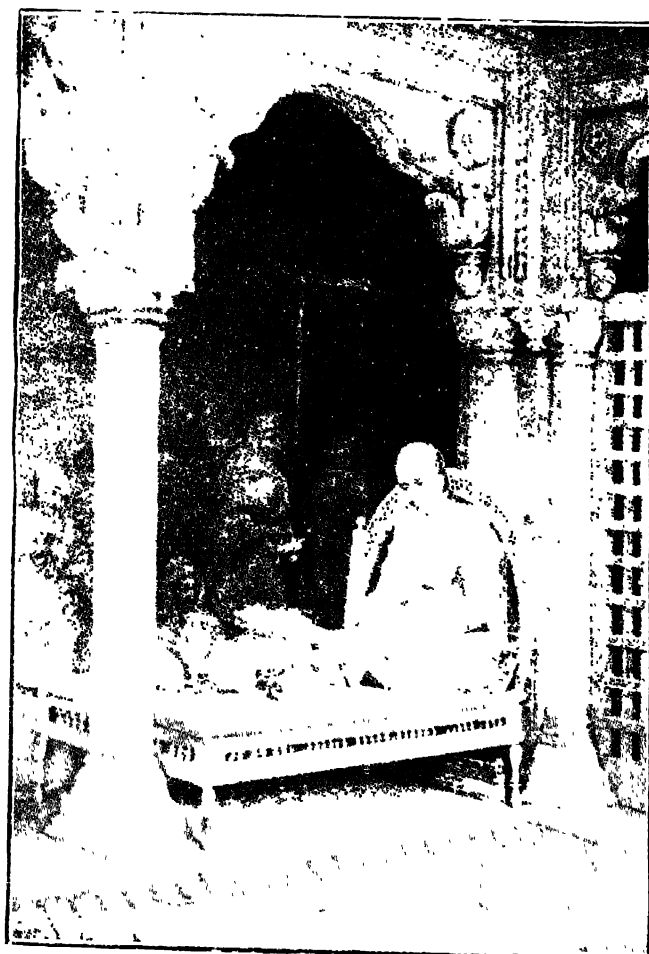
অন্নপূর্ণার মন্দিরে পুরাণ-পাঠ। (৭৪ পৃষ্ঠা)

(১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ জে, প্রিন্সেপ কৃত 'বেনারস-ইলাষ্ট্রেটেড' হইতে গৃহীত—মেঃ কার এণ্ড কোংর সৌজন্যে।)

I. A. School.

মহাযজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে ভাব যথার্থই তখন চিত্তকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলে, অতি বড় পাষণ্ডেরও চিত্তে কিছুক্ষণের জন্য সে পবিত্র ধর্ম্মভাব যেন অলক্ষে কোথা হইতে আনাইয়া দেয়, আর্য্য-পবিত্রতার সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব-গাম্ভীর্য্য যেন স্পষ্টরূপে সে সময় উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই দুর্গাপূজার সময় মায়ের 'মন্দির-প্রদক্ষিণ-অনুষ্ঠান' সেও এক বিচিত্র দৃশ্য। অতি প্রত্যূষে রাত্রি চারিটারও অনেক পূর্ব্বে শতশত অন্নপূর্ণাসদৃশা আর্য্যকুললক্ষ্মী মায়েরা সেই পবিত্র মন্দির একাগ্র-চিত্ত হইয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কখন কখন এই সময় এত ভিড় হয় যে, তাহা দেখিলে বোধহয় বুঝি প্রদক্ষিণকারীরা সব একত্র জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

মায়ের মন্দিরের ভক্তগণ মায়ের নামে নিত্য কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, অন্ন-প্রস্তুতের কত উপকরণরাশি, তৈজসপত্র যে উৎসর্গ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবী অন্নপূর্ণা কাশীর নিত্য-দেবতা। কিন্তু কাশীখণ্ডমধ্যে অন্নপূর্ণার নাম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, সেই কারণ অনেকে মনে করেন, হয়ত এই দেবীমূর্ত্তি পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকিবেন। বাস্তবিক কাশীখণ্ডে এই অন্নপূর্ণা নামের কোন উল্লেখ না থাকায়, এরূপ সন্দেহ সহজেই হইবার কথা। পরন্তু উক্ত গ্রন্থের একষষ্ঠিতম অধ্যায়ের ১২৩ শ্লোক হইতে ১২৮ শ্লোক * পর্য্যন্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। সাধারণের অবগতির জন্য সেই

* "ভবানীতীর্থমতুলং ঢুণ্ঢিতীর্থস্য দক্ষিণে।
তত্র স্নাত্বা বিধানেন ভবানীং পরিপূজ্য চ॥" ১২৩॥ ইত্যাদি।

অংশের মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। কাশীখণ্ডে এই অন্নপূর্ণাকে "ভবানী" নামে বর্ণিত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা, ভবানীর নামান্তর মাত্র। প্রাচীন কালে অন্নপূর্ণার মন্দির-সংলগ্ন "ভবানীতীর্থ" নামে এক কুণ্ড বা কূপ ছিল, অধুনা তাহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু পূর্ব্বকথিত কাশীখণ্ডের ১২৩ শ্লোকে তাহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে। "ঢুণ্ঢিরাজের মন্দিরসংলগ্ন ঢুণ্ঢিতীর্থের দক্ষিণ পার্শ্বে অতুলনীয় ভবানীতীর্থ আছে, তথায় স্নান করিয়া বিধিবিহিতরূপে ভবানীর পূজা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর দেবীকে বসন, ভূষণ, রত্ন, নৈবেদ্য, কুসুম, ধূপ ও দীপমালা নিবেদন করিবে। কাশীতে এই ভবানী ও শঙ্করের অর্চ্চনা করিলে ত্রিভুবনের অর্চ্চনা করা হয়। চৈত্র-শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে বা বাসন্তী-অষ্টমীতে অথবা শারদীয়া মহাষ্টমীতেও ভবানীর মহাযাত্রা করিয়া ১০৮বার প্রদক্ষিণ করিলে কিংবা নিত্য আটবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া শঙ্করসহ ভবানীকে প্রণাম করিলে, মা ভক্ত সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শঙ্করগৃহিণী ভবরাণী স্বয়ং ভবানীরূপে সতত ভিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কাশীতে ভবনাথ বা বিশ্বনাথ যথাগৃহ যেন গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবস্থিত, তদীয় সহধর্ম্মিণী ভবানী এই কাশীবাসী ভক্তগণকে অপূর্ব্ব মোক্ষান্ন ভিক্ষা * প্রদান করিতেছেন।" "শুক্রেশ্বরের পশ্চিমাংশে † এই ভবানীদেবীকে দর্শন করিলে কাশীবাসীর কোন দুঃখ থাকে না। এখানে আসিয়া শয়নে,

* "গৃহমধ্যত্র বিশ্বেশো ভবানীতৎ কুটুম্বিনী।
সর্ব্বেভ্যঃ কাশিসংস্থেভ্যো মোক্ষ ভিক্ষাং প্রযচ্ছতি ॥" কাঃ ৬১।১২২

† "শুক্রেশাৎ পশ্চিমাশায়াং ভবানীং যোহভিবীক্ষতে।
সর্ব্বে মনোরথাস্তস্য সিধ্যন্তীহ ন সংশয়ঃ ॥ কাঃ ৬১।১৩৩

জাগরণে, গমনে, উপবেশনে সতঃই মায়ের নিকট নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র জপসহ প্রার্থণা করিবে।”

“মাতর্ভবানি তব পাদরজোভবানি, মাতর্ভবানি তব
দাসতর ভবানি।
মাতর্ভবানি ন ভবানি যথা ভবেঽস্মিং, স্বদ্ভাগ ভবান্যনুদিনং
ন পুনর্ভবানি॥”
কাঃ ৬১।১৩৭।

অর্থাৎ “হে মাতঃ ভবানি, আমি যেন আপনার পাদপদ্মের ধূলি হই; হে মাতঃ ভবানি, পুনর্ব্বার যেন আমাকে সংসারক্লেশ পাইতে না হয়, সততই যেন আপনার সেবা করিতে পারি।”

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ঢুণ্টি-রাজের দক্ষিণে ও শুক্রেশ্বরের পশ্চিমে শঙ্কর-গৃহিণী ভবানী সততঃ মোক্ষান্নভিক্ষাপ্রদা অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইহাঁর নৈঋত কোণে ‘ভবানিশঙ্কর’ অতি প্রাচীন লিঙ্গ এখনও বিরাজ করিতেছেন। কাশীখণ্ডের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ভবানি-মন্দিরের অতি নিকটেই উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বা ঈষাণ কোণে জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানতীর্থ বিরাজিত রহিয়াছে। ইহাদ্বারাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্নপূণার এই মন্দির প্রাচীনকাল হইতে একস্থানেই রহিয়াছে, বিশ্বনাথের মন্দিরের ন্যায় ইহা পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত হয় নাই। “অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য” ও “অন্নপূর্ণা-ব্রতকথা” হইতেও ভবানী বা অন্নপূর্ণা দেবীর প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে বিশ্বনাথের পাণ্ডাবংশের বর্ণনামধ্যে মহারাজ বলবন্ত সিংহের যে আদেশ-পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে,

তাহাতে "অন্নপূর্ণা-ভবানী" এইরূপ শব্দ লিখিত আছে। তখন পর্য্যন্ত ভবানীর বিশেষণরূপে অন্নপূর্ণা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অধুনা 'ভবানী' শব্দের লোপ হইয়া কেবল 'অন্নপূর্ণা' শব্দই প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে 'অন্নপূর্ণা' এই নাম বিশেষ ভাবে প্রচার ও তন্ত্রবিধি অনুসারে মায়ের পূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে নবদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভবানন্দ রায় মজুমদার মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে সেই অবধি কাশীখণ্ডের ভবানীমূর্ত্তি 'অন্নপূর্ণা' নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন।

মায়ের এই মন্দিরমধ্যে আরও কয়েকটী প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া বামদিকের কোণে বা মূল মন্দিরের ঈষান কোণে "কুবেরেশ্বর" আছেন। এইরূপ মায়ের মন্দিরের অগ্নিকোণে বা দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ভগবান "সূর্য্যদেব" অবস্থিত রহিরাছেন। এইভাবে নৈঋতকোণে বা দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে "গণপতি" এবং বায়ুকোণে বা উত্তর-পশ্চিম দিকে "যন্ত্রেশ্বর" অথবা সাধারণ ভাবে "মন্ত্রেশ্বর" বিরাজিত রহিয়াছেন। যন্ত্রেশ্বরের শিরোদেশে সুন্দর দেবী-যন্ত্র খোদিত আছে। ইহাও অতি প্রাচীন লিঙ্গ। ইহার পশ্চিম দিকে "হনুমানজী" বিরাজ করিতেছেন। মায়ের মন্দিরের ঠিক সম্মুখে স্বতন্ত্র দালানের উপর রামচন্দ্রের অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি "সত্যনারায়ণ" বলিয়াও সাধারণের নিকট পরিচিত।

মন্দিরের পার্শ্বস্থিত এই দালানের উপর-তল হইয়া নৈঋ্ঁত

কোণে অবতরণপূর্ব্বক "ভবানীশঙ্করের" অতি প্রাচীন মূর্ত্তি ও মন্দির অনেকেই দর্শন করিয়া থাকেন। অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে স্বতন্ত্র গলিপথ দিয়াও এই ভবানিশঙ্করের দর্শন করিতে পারা যায়।

এতদ্ব্যতীত উক্ত দালানের উপরেই ঈষানকোণে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত কুবেরেশ্বরের ঠিক উপরের গৃহে স্বর্ণকান্তি মা অন্নপূর্ণার পরম প্রীতিপ্রদ রাজরাজেশ্বরী **"সোনার অন্নপূর্ণা"** মূর্ত্তি দর্শন করা মাতৃভক্ত হিন্দুমাত্রেরই আকাঙ্খার বস্তু। মা এখানে যেমন ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা সেইরূপ ত্রিধাশক্তি-সমন্বিতারূপে প্রকটা; অর্থাৎ এখানে মা আমার প্রকট ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজমানা। মধ্যে তিনি রাজরাজেশ্বরী প্রকৃত অন্নপূর্ণারূপে, বামে ভূমি বা বসুমতীরূপে এবং দক্ষিণে মাধবমোহিনী মহালক্ষ্মীরূপে তিনি বিরাজিতা রহিয়াছেন। তাঁহার এই মূর্ত্তি নিত্য কেহ দেখিতে পান না। বৎসরে তিনদিন মাত্র তাঁহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। অর্থাৎ দীপাবলীর মহোৎসবে চতুর্দ্দশী হইতে প্রতিপদ পর্য্যন্ত মহা সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা হয়। সেই অবসরে সকলেই তাঁহার দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকেন। আজকাল মহান্তজী আবার ইহাঁর শোভাযাত্রা বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অন্নকোট উৎসব :—

উক্ত দীপালীর সময় অন্নপূর্ণার 'অন্নকোট উৎসব' দেখিবার বিষয়। স্তুপীকৃত অন্নব্যঞ্জন, পর্ব্বতপরিমাণ মিষ্টান্ন-সামগ্রী চতুর্দ্দিকে সজ্জিত। সে বিরাট দৃশ্য দেখিলে প্রাণ আনন্দে

পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সহস্র সহস্র দর্শক সেই বিরাট অন্নকূপের দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করেন। এই উৎসব ইতিপূর্ব্বে এমন সমারোহে সম্পন্ন হইত না। ভূতপূর্ব্ব মহান্ত বিহারীপুরীজীর কাশীলাভ হইবার পরও কিয়ৎকাল পূর্ব্বানুরূপ সামান্যভাবেই মায়ের এই বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইতেছিল। পরে বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীমৎ শিবনাথ পুরীজী গত কয়েক বৎসর হইতে এই উৎসব উপলক্ষে যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আমলে সর্ব্বসাধারণে প্রসাদ-বিতরণ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁহার যেমন সৌম্য-মূর্ত্তি তেমনি তিনি ধর্ম্মাত্মা, বিলাসবর্জ্জিত, গুণগ্রাহী ও সনাতন-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামী। কিন্তু আজ কাল তাঁহার কতিপয় স্বার্থপর কর্ণচারী ও পরামর্শদাতার দোষে বিশেষ কিছু গোলযোগ হইতেছে এরূপ শুনা যায়। তাহা তিনি যে সহজেই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন আশা আছে। তাঁহার অসাধারণ চরিত্রানুকূল পবিত্রভাব ব্যবসায় বুদ্ধিপরায়ণ পরামর্শদাতাদিগের অনুগত হইতে দেখিলে যথার্থই সাধারণের দুঃখ হয়।

অন্নপূর্ণা ব্রহ্মচারী পাঠশালা—

উক্ত মহান্তজী ১৯৬৯ সম্বৎ হইতে 'অন্নপূর্ণা-ব্রহ্মচারী-ঋষিকুল-আশ্রমের' প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু ব্রহ্মচারী বালকের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার, তাহাদের ভরণ-পোষণ ও স্বাস্থ্যোন্নতির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কাশীর অনতিদূরে শিবপুর নামক স্থানে এই আশ্রমে উপযুক্ত অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারী বালক

গণকে রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রকৃত আত্মোন্নতিকর শিক্ষার অধিকতর সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে মহান্ত মহারাজ স্বধর্ম্মপরায়ণ সমাজহিতৈষী শিক্ষাবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিলে যথার্থ দেশের ও ধর্ম্মের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাহউক কাশীবাসী ও কাশীদর্শনা-ভিলাষী ভক্তগণের তাহাও দ্রষ্টব্য-বিষয়ের অন্তর্গত। একপ মহদুদ্দেশ্যে যাঁহারা যে কোন প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাঁহারাও সকলের ধন্যবাদার্হ।

অন্নপূর্ণার রন্ধনশালা :—

শঙ্করপুরনিবাসী জনক মহাদেব ভটজী সম্বৎ ১৮০৮ অব্দে বা ইং ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মায়ের মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বদিকে প্রায় সাড়ে চার বিশ্বা বা বাঙ্গালার হিসাবে প্রায় সাত কাঠা জমী খরিদ করিয়া অন্নপূর্ণাদেবীর রন্ধনশালা প্রস্তুত করাইয়া দেন। মহারাজ বলবন্ত সিংহের সময়ে ওকালতি করিয়া তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই ভূমিখণ্ডের উপর যে অট্টালিকা রহিয়াছে, তাহারই নিম্নখণ্ডে অন্নপূর্ণার "গোশালা", দ্বিতীয়খণ্ডে বা মাঝেরতালায় অন্নপূর্ণার দরবার বা স্বর্ণ-অন্নপূর্ণার গৃহ এবং ত্রিতলে ও চতুর্থতলে দেবীর পবিত্র পাকশালা ও ভাণ্ডার আদি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মায়ের নহবৎখানা :—

স্বামী জগন্নাথ পুরী যখন অন্নপূর্ণার মহান্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, সেবারামজী এই নহবৎ-খানা প্রস্তুত করিয়া তাহার পরিচালনভার—মহান্ত জগন্নাথ

পুরীর উপর অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার দেহান্তের পর ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার শিষ্য শিবপুরী অন্নপূর্ণার গদীর অধিকারী হইলে রায় সেবারামজী সেই ভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া যে দলিল লিখিয়া দেন তাহাতে দুইজন বাঙ্গালী সাক্ষীর নিম্নলিখিত রূপ বঙ্গাক্ষরে সাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—"খালীসপুরা নিবাসী রামসুন্দর শর্ম্মা" এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি—"শম্ভুরাম ঘোষ"।

অন্নপূর্ণার মহান্তগণ ঃ—

বহু প্রাচীন কাল হইতে অন্নপূর্ণার মহান্তগণ শিষ্যপরম্পরায় মায়ের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানিতে পারা যায়—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবের দশনামী প্রশিষ্যবর্গের মধ্যে পুরী-সম্প্রদায়-ভুক্ত শিষ্যপরম্পরায় এই মায়ের সেবাইতরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারাবাহিক শিষ্যপরম্পরার নাম-লিখিত কাগজপত্র আছে, বাহুল্যভয়ে কেবল মহান্ত শঙ্করপুরী হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কয়েকটী নামই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শঙ্করপুরী, সহজচাঁদপুরী, কল্যাণপুরী বা কালুপুরী, জগন্নাথপুরী, শিবপুরী, রামপুরী, ঠাকুরপুরী, ভৈরবপুরী, দুর্গা-পুরী, জহাংগিরপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, বিহারীপুরী ও শ্রীমৎ শিবনাথপুরী। ইনিই বর্ত্তমান মহান্তজী। ইহাঁর শিষ্য কাশীনাথপুরী কিছুদিন পূর্ব্বে অপঘাতে মৃত হইয়াছে। ইহাঁর দ্বিতীয় শিষ্য শ্রীমান্ বিশ্বনাথপুরী তৎ স্থানে অভিষিক্ত হইয়াছে। মহান্তজী অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তি। ইনি অন্নপূর্ণার সেবাবিষয়ে বহু উন্নতিবিধান করিতেছেন।

শনিগ্রহ দেবতা ঃ—

বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণার গলির নিকটে আরও বহু প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে শনি-দেবতার মূর্ত্তিটীও উল্লেখযোগ্য। অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে বাহির হইয়া বিশ্বনাথে যাইবার পথে দক্ষিণ দিকে এই মূর্ত্তি বিরাজিত চার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। তবে নবগ্রহের মধ্যে এই দেবতাটীকে কে না ভয় করেন? সুতরাং সকলেই ভয়ে-ভক্তিতে ইহাঁর অর্চনা করিয়া থাকেন।

কালরাত্রি দুর্গা, ভদ্রকালী বা মানসকালী ঃ—

বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণার গলির মধ্য হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে অন্নপূর্ণামন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে 'কালিকা গলিতে' নিম্নলিখিত দেবদেবীর দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই গলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেবী 'কালরাত্রি দুর্গা' বা 'ভদ্রকালী' অথবা 'মানসকালী'। কাশী-অন্তর্গৃহিমধ্যে এই কালিকাদেবীর যথেষ্ট মাহাত্ম্য ও প্রসিদ্ধি আছে। কাশীতে বহু শাক্ত-মন্দির থাকিলেও কাশীপুরীর মধ্যে এই কালিকাদেবীর নিকট এবং পুরীর বাহিরে অসিসমীপবর্ত্তী দুর্গাবাড়ীতেই কেবল পশুবলীর ব্যবস্থা আছে। কাশীখণ্ডের মধ্যে যে ভদ্রকালীর উল্লেখ আছে, সাধারণের বিশ্বাস ইনিই সেই ভদ্রকালী দেবী।

শুক্রেশ্বর ঃ—

উক্ত মন্দিরের নিকটেই 'শুক্রেশ্বরের' প্রাচীন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, অসুরগুরু শ্রীমৎ শুক্রাচার্য্যদেব এই স্থানে বসিয়াই বিশ্বনাথের আরাধনা করিয়া

ছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তিভাবে ইহাঁর পূজা ও দর্শন করিলে মানব ইহকালে ধনরত্ন ও পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিয়া পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করেন এবং অন্তে শুক্রলোকে বাস করিতে পারেন। এইস্থানেই প্রাচীন শুক্রকূপ আছে, ইচ্ছা করিলে তাহাও অনেকে দেখিতে পারেন ও সেই জল স্পর্শ করিয়া শুক্রগ্রহের শান্তি লাভ করিতে পারেন।

মদালেশ্বর, সৃষ্টিবিনায়ক ও ভবানীশঙ্কর:—

এই কালিকা গলিতে 'মদালেশ্বর', 'সৃষ্টিবিনায়ক' ও 'ভবানী-শঙ্করের' দর্শন করা ভক্তগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নপূর্ণার মন্দির সংলগ্ন যে 'ভবানীশঙ্করের' বিষয়ে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইনি সেই ভবানীশঙ্কর। অন্নপূর্ণার মন্দিরের ভিতর দিয়াও এখানে আসা যায়, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। অন্নপূর্ণার মহান্তজী ইহাঁরও সেবাইত।

দণ্ডপাণি-ভৈরব:—

এইবার কালিকাগলি হইতে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণাজীর মন্দিরের সম্মুখের পথে পুনরায় ঢুণ্ঢিরাজকে দর্শনপূর্ব্বক উত্তর মুখে 'ঔরঙ্গজেবের মসজিদের' দিকে যাইতে যে গলি পড়ে, তাহারই মধ্যে প্রসিদ্ধ 'দণ্ডপাণি-ভৈরবের' দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কাশীখণ্ডের ৩২ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে 'হরিকেশ' নামে এক যক্ষ আবাল্য বিশ্বনাথের আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলে বর-প্রাপ্ত হইলেন যে, "হে পূর্ণভদ্রা-ত্মজ দণ্ডনায়ক, পিঙ্গল, ত্র্যক্ষ, যক্ষ, হরিকেশ, হে কাশীবাসী-

জনের অন্নজ্ঞান মোক্ষদাতা। তুমি আমার সমস্ত গণের মধ্যে প্রধান হইবে, আমাতে ভক্তিযুক্ত হইলেও মনুষ্যগণ তোমাতে ভক্তি বিনা কাশীতে বাস করিতে পারিবে না। তুমি কি দেব, কি মনুষ্য, কি প্রমথ, সকলেরই অগ্রে পূজনীয় হইবে। 'জ্ঞান-বাপী তীর্থে' স্নানাদি করিয়া যে তোমার আরাধনা করিবে সে আমার অসামান্য কৃপাবলে পূর্ণবলে পূর্ণমনোরথ হইবে। হে দণ্ডপাণে! তুমি আমার সম্মুখে দক্ষিণ দিকে দুষ্টের দণ্ডবিধান ও শিষ্টের অভয়-দানপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থান কর।" (কাশী-খণ্ড ৩২ অঃ ১৫৮—১৬২ শ্লোক।) এতদ্ব্যতীত ৯৭ অধ্যায়েও 'দণ্ডপাণির' উল্লেখ আছে। যাহাহউক তদবধি যক্ষরাটদণ্ডনায়ক ভৈরবরূপে কাশীবাসীর অন্তিমকালে জটামুকুট আদি শিবপরিচ্ছদ প্রদান করিয়া শিবত্ব-মুক্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বিশ্ব-নাথের ভূতপূর্ব্ব মন্দির যাহা অওরঙ্গজেবকর্ত্তৃক বিদ্ধস্ত ও পরে মসজিদে পরিণত হইয়াছে, তাহা কাশীখণ্ডবর্ণিত "মোক্ষ-লক্ষ্মী-বিলাস" নামক বিশ্বনাথের আদি মন্দির বা প্রাসাদ নহে। বিশ্ব-নাথের সেই আদি মন্দির যাহা "কারমাইকেল লাইব্রেরীর" সম্মুখের বড় রাস্তার উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে সেই স্থানের এক প্রান্তে সামান্য একখণ্ড ভূমির উপর আদি বিশ্ব-নাথের মন্দির বলিয়া নূতন একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই মন্দিরের আশপাশে বহু বিস্তৃত ও উচ্চ ভূমির উপর উক্ত "মোক্ষ-লক্ষ্মীবিলাস" নামক বিশ্বনাথের আদি বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব্বে এই বড় রাস্তা ছিল না, কারমাই-কেল লাইব্রেরী আদি এখানে তখন কিছুই ছিল না, সুতরাং তখন সেই মন্দিরের ঠিক সম্মুখ দিয়াই দক্ষিণমুখে দণ্ডপাণির

মন্দিরে আসিবার এই রাস্তাটীই ছিল। পূর্ব্বে দণ্ডপাণির মন্দিরও সম্ভবতঃ অনেক বড় ছিল, সে মন্দির নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরে নানা কারণে স্থানাভাববশতঃ এক্ষণে এই সামান্য মন্দিরের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে যতদূর মনে হয় এই মন্দিরের প্রাচীন স্থানের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ব্বে এই গলি দিয়াই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে হইত। সেই কারণ এখনও ইহা বিশ্বনাথের গলি বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দির যাহা এক্ষণে অওরঙ্গজেব মস্ক বা মসজিদে পরিণত হইয়াছে, তাহাও পরবর্ত্তী সময়ে বাবার মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস-প্রাসাদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং সে মন্দিরে যাইবারও এই পথ বা এই গলিটীই তখন প্রধান ছিল।

অপারনাথঃ—

উক্ত দণ্ডপাণি-ভৈরবের দক্ষিণ দিকে 'অপারনাথ' মহাদেবের একটী বিস্তৃত মন্দির আছে। এটী একটী মঠের অনুরূপ। বহু সাধু সন্ন্যাসী এখানে বসিয়া সতত শাস্ত্রালাপ করেন। প্রবাদ আছে, যখন দিল্লীপতি অওরঙ্গজেবের আদেশে সমস্ত কাশী বিধ্বস্ত হইতেছিল, সেই সময় অপারনাথকে নষ্ট করিতে আসিলে মন্দিরমধ্য হইতে সহসা এতাধিক 'ভিমরুল' বহির্গত হইতে লাগিল যে, কাহার সাধ্য তাহার মধ্যে অগ্রসর হয়! মন্দিরধ্বংস-কারী যবনসৈন্যগণ বাধ্য হইয়া তখন সরিয়া গেল। অনন্তর স্বয়ং অওরঙ্গজেব বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রধান যবন-কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে আসিয়া স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া ইহা বিনষ্ট করিতে বিরত হন এবং তাঁহার স্মরণার্থ একটী প্রকাণ্ড 'ডঙ্কা' সেই
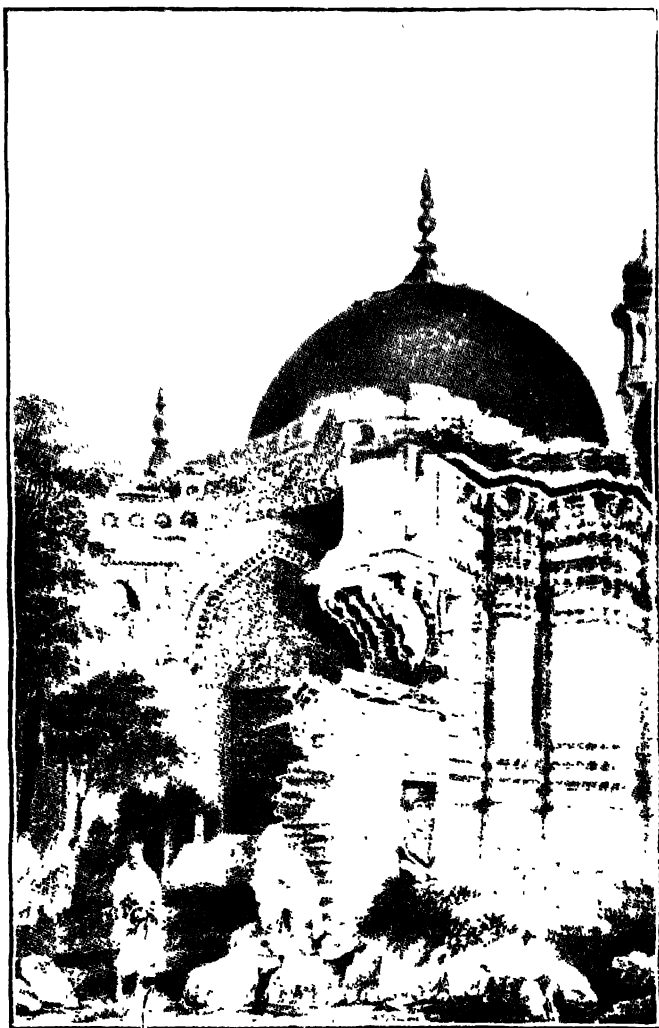
বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয়-মন্দিরের ভগ্ন-অংশ। (৮৭ পৃষ্ঠা)

'১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সি, জে, প্রিন্সেপকৃত 'বেনারস-ইলাষ্ট্রেটেড' হই

মন্দির-দ্বারে রাখিয়া চলিয়া যান। সেই ডঙ্কাটী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এত বড় ডঙ্কা আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার বাদ্য চর্ম্ম ফাটিয়া যাইলে সহসা ছাওয়াইবার উপায় নাই। বহু অনুসন্ধানে কোনও সুবৃহৎ উষ্ট্রের চর্ম্ম পাইলেই উহা পুনরায় ছাওয়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

মার্কণ্ডেশ:—

অপারনাথের উত্তরদিকে 'মার্কণ্ডেশের' একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে এখানে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কালে তাহা জীর্ণ হইয়া যাইলে, মর্ম্মরপ্রস্তরে খোদিত একটী নূতন মার্কণ্ডেশ-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটী অতি সুন্দর।

বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় মন্দির অধুনা অওরঙ্গজেব মস্ক:-

পূর্ব্বোক্ত অক্ষয়বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের পশ্চিমে, বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে বিশ্বনাথের সেই অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড মন্দির খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে হিন্দুদেব-বিদ্বেষী অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং তাহারই প্রস্তরাদি সহযোগে সেই ভূমির উপরেই তিনি নিজ নামে "অওরঙ্গজেব মস্ক" বলিয়া এক বিশাল মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের সেই স্তম্ভ, উপান, আলীঙ্গ, সেই কম্প, কন্ধর, উত্তারা প্রভৃতি আর্য্য-স্থাপত্য-সুলভ প্রস্তরালঙ্কার এখনও মসজিদের পশ্চাৎদিকে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা দেখিলে বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় প্রাচীন মন্দির যে কত বিস্তৃত, উন্নত ও কত নয়নতৃপ্তিকর ছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়—তাহা দেখিলে এখনও আর্য্য-সন্তান ভক্তের পবিত্র হৃদয় যুগপৎ বিষম বিস্ময়ে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অভি-

ভূত হইয়া যায়—তাহা দেখিলে উদার ও পরম প্রজাবৎসল হিন্দু-মোসলমানের মিলনকামী মোগল-সম্রাটকুলের কালিমাস্বরূপ পিতৃ-ভাতৃ-দ্বেষী অওরঙ্গজেবের ঘোর আর্য্য-বিদ্বেষতা ও তাঁহার ঘৃণিত নীচান্তকরণের কথা এখনও স্মরণ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষণেকের জন্য চিরশান্তিপ্রিয় হিন্দুর হৃদয়ও যেন উত্তপ্ত করিয়া তুলে। যাহাহউক তাহার তুলনায় ভারতের বর্ত্তমান অধীশ্বর, সকল বিষয়ে সুসভ্য ইংরাজরাজ ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি-সংরক্ষণে যেরূপ সচেষ্ট, যে কোনও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রাচীন-মন্দির, মঠ ও মসজিদাদির রক্ষাকল্পে তাঁহারা যেরূপ উদার, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

মসজিদের সম্মুখভাগে যে সুবৃহৎ স্তম্ভসমূহ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা নিকটস্থ বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশিষ্ট বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, তাহারা যেন মহামহিমান্বিত সসাগরা পৃথিবীপতি অশোকের শোকে কাতর হইয়া, তাহার কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ করিতে করিতেও যবনকরে আত্ম-কলঙ্কিত হইয়া লজ্জায় ঘৃণায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে যেন অতি সঙ্কুচিতভাবে কোনরূপে কালাতিপাত করিতেছে। স্তম্ভগুলির সেই বিশালতার মধ্যে প্রকৃতই যেন কি এক ম্লান ও কালিমা-ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা হৃদয়বান দর্শকবৃন্দ দর্শনমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। 'এডওয়ার্ড বি, ইষ্টউইক' প্রভৃতি বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতও তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে অপমানিত করিবার জন্যই এবং হিন্দু এবং বৌদ্ধের হৃদয়ে চিরদিন আঘাত প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই যেন মন্দির ও বিহারান্তর্গত প্রস্তরালঙ্কার ও তাহার উপাদান রাশিকে

অবিকৃত অবস্থায় মসজিদে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইহাকে কুবমতির দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।"

এই মসজিদ নিম্নঅংশ প্রায় ৫' ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত এবং তাহা মৃত্তিকা আদিতে পূর্ণ করিয়া তাহারই উপরে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রাচীর-গাত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনস্থাপত্যানুগত বহু প্রস্তরালঙ্কার যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিত্য কত নূতন ভাবের উদ্বোধন করিয়া দিতেছে।

এই মসজিদ ও জ্ঞানবাপীর মধ্যস্থিত ভূমি লইয়া বহুদিন ধরিয়া হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে বিষম বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। কতকগুলি দুষ্ট মোসলমান সেই অক্ষয় বটের বা পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্মুখে মসজিদের একটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রত্যহ গোমাংস বহন করিয়া লইয়া যাইত, গো-রক্ত ও গো-অস্থি নিক্ষেপ করিত। শান্তিপ্রিয় হিন্দুদিগের প্রতি ধর্ম্মহানীকর এই সকল আচরণে হিন্দুদিগের হৃদয়ে অশান্তির উদয় হইল, ক্রমে সহিষ্ণুতার সীমা অতীত হইল, তখন তাহারা উন্মত্ত হৃদয়ে মোসলমানদিগের অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হইল—উভয় পক্ষে ভয়ানক বিরোধ বা 'দাঙ্গা' আরম্ভ হইল। এবার হিন্দু কর্ত্তৃক সেই অওরঙ্গজেব-মস্ক বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া সে দাঙ্গা মিটাইয়া দিলেন। তাহার ফলে মসজিদের সেই দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইল, এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। অনতিবিলম্বে গো-মাংসাদি আনাও বন্ধ হইল, মসজিদের দক্ষিণদিকে রাজপথের সম্মুখে একটীমাত্র

দ্বার মোসলমানদিগের যাতায়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল, পবিত্র অশ্বত্থের একটী পত্রও আর কোন মোসলমানের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা থাকিল না, স্বয়ং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট মসজিদের রক্ষণভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের বিরোধ উপস্থিত মিটিয়া গিয়াছে। এখন আর কোনও গোলযোগ নাই। হিন্দু ও মোসলমানগণ স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে আপন আপন মন্দির ও মসজিদে নির্ব্বিঘ্নে পূজা ও উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেছে। জ্ঞানবাপীর পশ্চিমদিক হইতে বিশ্বনাথের পূর্ব্বমন্দিরের ভগ্ন-অংশের সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আদি-বিশ্বেশ্বর ঃ—

এই মসজিদের কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত এই স্থানেই বিশ্বনাথের সর্ব্ব-প্রাচীন 'মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস' নামক মন্দির অবস্থিত ছিল বলিয়া সকলের বিশ্বাস। এই স্থানে হিউয়েন্থ-সাং প্রায় ৬৬ হস্ত দীর্ঘ সেই বিরাট তাম্রময় শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। লোক-পরম্পরায় তাহা এখনও প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয় ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন দুর্বৃত্ত কুতবউদ্দিন কাশী-নরেশকে পরাভূত করিয়া কাশীস্থিত সহস্রাধিক মন্দির ও দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করেন, সেই সময় বিশ্বেশ্বরের এই প্রাচীন মন্দিরও তিনিই বিনষ্ট করিয়া সমভূমি করিয়া দেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিগত সপ্তম শতাব্দিতে হিউয়েন্থ-সাং এই বিরাট মন্দির এবং এই মন্দিরস্থিত প্রায় একশত ফুট উচ্চ বিশুদ্ধ তাম্রময় বিশাল বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে হুয়েন্থসাংএর পর্য্যটনের প্রায় পাঁচশত

বৎসর পরে এই দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অনন্তর বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দির যাহা এক্ষণে অওরঙ্গজেব-মস্করূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুতবের কাশী পরিত্যাগের পর মোসলমানদিগের উৎপীড়ন কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইলে, হিন্দুগণ সমাগত হইয়া আদি বিশ্বেশ্বরের স্থান-মাহাত্ম্য বজায় রাখিবার জন্য পুনরায় পূর্ব্ব-মন্দিরের একপ্রান্তে অতি সংকীর্ণ স্থানে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও 'আদি-বিশ্বেশ্বর' নামে একটী সুন্দর শিবমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মাহাত্ম্য শেরিং প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগেরও এইরূপ অভিমত।

শুনিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরস্থিত বিশ্বনাথ-লিঙ্গের গৌরীপট্টটী অতি প্রাচীন, অর্থাৎ ইহা সেই আদি-বিশ্বনাথেরই গৌরীপট্ট। ইহা উৎকৃষ্ট কষ্টি পাথরে নির্ম্মিত। কুতব ও কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ধ্বংসবিধ্বস্ত হইবার পর, আদি-বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রস্তর আদি সংযোগে এই স্থানেই একটী বিরাট মসজিদ নির্ম্মিত হইতেছিল। এই মসজিদেরই দ্বারদেশে উক্ত গৌরী-পট্টটী পাতিত ছিল মোসলমানগণ ইহারই উপর দিয়া যাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিত। অনন্তর মহারাজ মানসিংহ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রজারঞ্জক আদর্শ ভারত-সম্রাট আকবরের সহায়তায় সেই গৌরীপট্টটী উক্ত মসজিদের দ্বার হইতে উঠাইয়া যথারীতি তাঁহার অভিষেকাদি সংস্কার সম্পন্ন করনান্তর বর্ত্তমান মন্দিরের মধ্যে ভক্তিভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ তাম্রময় প্রাচীন লিঙ্গটীর কোনও সন্ধান না পাইয়া সেই প্রাচীন গৌরী-পট্টটীর উপরেই একটী সাধারণ প্রস্তরময়ী নূতন লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন।

এই নূতন মন্দিরটী প্রায় ৬৫ ফিট উচ্চ, মন্দির-চূড়া প্রকাণ্ড গম্বুজাকারে শোভিত। ইহার উপাদানে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিনের সংস্কারাভাবে ইহা ক্রমে জীর্ণ হইয়াছিল, প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় এক তামাকু ব্যবসায়ী স্বধর্ম্মপরায়ণ ধনী হিন্দু (প্রসিদ্ধ সুঙ্গনী সাও) কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সংস্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে মন্দিরের অবস্থা মন্দ নহে।

অনেক ইংরাজ পণ্ডিত অনুমান করেন, ইহার নিকটেই এক বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই মন্দিরের এবং সেই বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নলব্ধ প্রস্তরাদি সহযোগে পার্শ্বস্থ এক প্রশস্ত মসজিদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থাভাবে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খোদিত প্রস্তরাদির মধ্যে এখনও হিন্দু ও বৌদ্ধ-স্থাপত্যানুগত অলঙ্কার-পারিপাট্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক আদি বিশ্বেশ্বরের এই মন্দিরও হিন্দুর অতি আদরের বস্তু। ভক্তিমান হিন্দু মাত্রেই তাহা দর্শন করিয়া মন্দিরস্থিত বিশ্বেশ্বরের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন।

কাশীকর্ব্বট ঃ—

কাশীকর্ব্বট, একটী অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ কূপ। ইহা একটী মন্দিরের মধ্যে সযত্নে সুরক্ষিত, আদি বিশ্বনাথের মন্দির হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে কচুড়ির গলিতে যাইলেই নিকটে কাশীকর্ব্বটের ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই মধ্যে এই কর্ব্বট-কূপ। এই স্থানের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে তাহার মধ্যে লইয়া যাইয়া কতকগুলি অসংলগ্ন সংস্কৃত মন্ত্রের সহিত ও সময় সময়

নানাপ্রকার ভয় ও উৎপীড়নদ্বারা বহু অর্থদানের সঙ্কল্প করাইয়া লয়। পরে ধর্ম্মপরায়ণ ও অন্ধবিশ্বাসী যাত্রীর দল অবশ্য ইচ্ছায় নহে অনিচ্ছায় কাশীক্ষেত্রমধ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যথাসাধ্য সেই প্রতিশ্রুত অর্থের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। কোন কোনও প্রাচীন অধিবাসীর মুখে শুনা যায় যে, ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই কর্ব্বটের পাণ্ডাগণ এমনই দুর্দ্দান্ত ছিল যে, তখন তাহাদের দ্বারা ইহার মধ্যে বহু নিরীহ যাত্রীর জীবন-সংহার পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে—এই কর্ব্বটের মধ্যে ডুব দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে অনেকে ইহাতে পড়িয়া ডুবিয়া মরিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল নৃসংশ ব্যাপার অবগত হইয়া অধুনা উক্ত কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেবল প্রতি সোমবারে একবার করিয়া সেই মুখ খোলা হয়। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডাদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার দেখিয়া সরকার বাহাদুর সতত একজন পুলিশ-প্রহরী তথায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিরীহ যাত্রীগণের তথাপি নিস্তার নাই। কূপের মধ্যে কিয়দ্দূর নামিবার জন্য একটী সোপান-শ্রেণী বিদ্যমান আছে, তদবলম্বনে অবতরণ করিয়া নিম্নে একটী শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম 'কর্ব্বটেশ্বর' মহাদেব। কাশীখণ্ডের মধ্যে কর্ব্বটেশ্বর নামে কোন শিবলিঙ্গের উল্লেখ নাই। তবে 'কর্পদেশ্বর' বলিয়া এক প্রাচীন লিঙ্গের বিষয় অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় 'কর্ব্বট' শব্দ 'কর্পদের'ই অপভ্রংশ হইবে। সকল যাত্রীই সেই শিবের পূজা করিতে যান। বহুদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, কর্ব্বটের যে স্থলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহাই কাশীপুরীর সুপ্রাচীন

সমতল ভূমি বা তলক্ষেত্র। ক্রমে যুগ-যুগান্তরের মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি পতিত হইয়া কাশী-সহর এতাধিক উচ্চতা লাভ করিয়াছে। একথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আবার কাশীবাসী প্রাচীন লোকেরা বলেন, 'কর্ম্মট' ইহা একটী হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করা বা ভূলুণ্ঠিত হওয়া, সেই জন্য যাত্রিগণ এই স্থলে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে পতিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

নীলকণ্ঠঃ—

ইহার নিকটে 'নীলকণ্ঠেশ্বর', 'লাঙ্গলেশ্বর', 'পশুপতিশ্বর', 'পিতাম্বরেশ্বর' প্রভৃতি বহু প্রাচীন দেবতা ও তীর্থ আছে। নীলকণ্ঠের সম্মুখ দিয়া আরও পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, প্রসিদ্ধ মণিকর্ণিকাতীর্থ দর্শন হইয়া থাকে। ঘাট-বর্ণনা সময়ে বিস্তৃতভাবে তাহার উল্লেখ করিব।

কাশী উত্তর ও দক্ষিণাদি যাত্রা।

এইবার বিশ্বনাথের মন্দিরের উত্তরদিকস্থিত দ্রষ্টব্য মন্দিরাদির বিষয় ধীরে ধীরে বর্ণন করিব। কাশীখণ্ডে উত্তরদিক ও দক্ষিণ দিক ভেদে দুইটী বিশেষ যাত্রার উল্লেখ আছে, কিন্তু এ স্থলে ঠিক সেই বর্ণনাসমূহের অনুশরণ করিতে পারিতেছি না, কারণ তাহার মধ্যে বহু দেবদেবীর ও তীর্থের অস্তিত্ব বিশেষ অনুসন্ধানেও স্থির করিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ তাহার অনেক লোপ হইয়া গিয়াছে। আর কতকগুলি গঙ্গার ঘাটের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সে গুলির বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ঘাটসমূহের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণিত হইবে। যাহা হউক এক্ষণে পর্য্যোক্ত কাশী-

কর্ব্বট আদি হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকেই প্রথমে অগ্রসর হইতেছি।

সঙ্কটাদেবী ঃ—

কাশীকর্ব্বটাদি হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিলে, সঙ্কটাঘাটের নিকট 'সঙ্কটাদেবীর' অতি সুন্দর কারুকার্য্যময় প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু মহিলাগণ সংসারের কোন কিছু সঙ্কটময় কারণ উপস্থিত হইলেই সকল-সঙ্কটনাশিনী সঙ্কটাদেবীর পূজা মানিয়া থাকেন।

কালভৈরব ঃ—

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে বেনারসের টেলিগ্রাফ আফিস ও টাউন-হলের দক্ষিণে বা পশ্চাতে একটী গলির মধ্যে কাশীনগরীর নগরপাল, পরিদর্শক বা 'কাতোয়াল' কালভৈরবের সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির বহু-দিন ভগ্নবস্থায় পতিত ছিল, অনন্তর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পুনার রাজা রাওজী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান আকারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার গঠন-পারিপাট্য মন্দ নহে। দ্বারদেশে দুইটী দ্বারপাল-মূর্ত্তি ও প্রাচীরগাত্রে নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের গৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহারই একপার্শ্বে তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্রগর্ভ-গৃহমধ্যে প্রস্তরময় রজতানন চতুর্ভুজ ভৈরবনাথ বা কালভৈরব বিরাজিত। ইহাঁকে দর্শন করিলে, জীবের সকল পাপ দূর হয়। ইনি গাঢ় নীলবর্ণ ও সারমেয়বাহন। ইহাঁর অসীম প্রতাপ। ইনি কাশীরাজ্যের অধিবাসীবর্গের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। বিশ্বনাথ-আদেশে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইনিই করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বিশ্বনাথ নিজ

কোপাঙ্গ হইতে এক ভৈরব-পুরুষের সৃষ্টি করেন, তিনিই সেই 'কালভৈরব'। প্রত্যেক শিবমন্দিরের সম্মুখে যেমন প্রস্তর-খোদিত বৃষ বা নন্দী দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরে প্রবেশ করিলেই বামদিকে সেইরূপ এক প্রস্তর-খোদিত প্রকাণ্ড সারমেয় বা কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর দুর্গাবাড়ীতে যেমন অসংখ্য বানরের উপদ্রব, ভৈরবনাথের মন্দির প্রাঙ্গনে সেইরূপ অসংখ্য কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবানুচর বলিয়া যাত্রিগণ এই সকল কুকুরকে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য দিয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কালভৈরবের নিকট রাত্রি-জাগরণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তি-সহকারে কাল-ভৈরবের পূজা করিয়া যে-কোনও কামনা করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধ হয়। কথিত আছে, কাশীবাসাভিলাষী ভক্তগণকে প্রথম ছয় মাস কাল নানা বাধা-বিঘ্ন ও অশেষ তাড়না সহ্য করিতে হয়। যিনি সেই সকল তাড়না সহ্য করিয়াও কোনরূপে একাগ্র-চিত্তে ছয়মাসকাল অতিবাহিত করিতে পারেন, তিনিই জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্বিঘ্নে কাশীবাস করিতে সমর্থ হন।

কালভৈরবের মন্দিরগাত্রে 'দশ-অবতারের' চিত্র এবং মন্দির-চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে একটী 'শীতলার' ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। তাহার প্রাচীরগাত্রে 'সপ্তমাতৃকার' মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নবগ্রহমন্দির:—

কালভৈরবের নিকটেই নবগ্রহ-দেবতার একটী প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার মধ্যে আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া এই মন্দিরের দ্বার

উন্মুক্ত হয়। যাত্রীরা সেই সময়েই ইহাঁদের দর্শন ও পূজাদি করিয়া থাকেন।

দণ্ডপাণি ও কালকূপঃ—

ইতিপূর্ব্বে দণ্ডপাণীশ্বর মহাদেব ও দণ্ডপাণি-ভৈরবের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে দণ্ডপাণি-বিনায়ক সম্বন্ধে বলিব।

কালভৈরবের মন্দিরের নিকটস্থিত একটী মন্দির মধ্যে কিঞ্চিৎ ন্যূন প্রায় ত্রিহস্ত পরিমিত বিনায়ক-মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার সকলে এই দণ্ডপাণি বিনায়কের পূজা দিয়া থাকেন। ইনি 'কাশী-কোতোয়াল' কালভৈরবের সহচর ও সহকারী 'বরকন্দাজ' বলিয়া এখানে প্রসিদ্ধ। শিবের পরমভক্ত 'হরিকেশ' নামক জনৈক যক্ষ, যিনি বিশ্বনাথের কৃপায় দণ্ডপাণি-ভৈরবের পদ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকট এখনও অবস্থান করিতেছেন, অনেকে তাঁহার সহিত ইহাঁর গোলযোগ করিয়া বসেন, দণ্ডপাণি-ভৈরব যেমন 'দণ্ডপাণীশ্বর-লিঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বোধ হয় এই বিনায়ক মূর্ত্তিও তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই ইহাঁকে 'দণ্ডপাণি-বিনায়ক' বলিয়াই সকলে বর্ণনা করেন।

এই মন্দিরের সংলগ্নই প্রসিদ্ধ কালকূপ তীর্থ। এখানে মহাকাল ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। এই কূপের জলে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস। কূপটী এমনই ভাবে প্রাচীর ও ছাদ দ্বারা আবৃত যে, ছাদস্থিত একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ঠিক দ্বিপ্রহর সময়ে সেই কূপমধ্যে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, সেই কূপস্থিত জলমধ্যে যে ব্যক্তি আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায়, ছয়মাস মধ্যে তাহার

মৃত্যু অবধারিত। সেই কারণ অনেকেই নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ মধ্যাহ্নসময়ে কালকূপমধ্যে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে যান।

গোপাল-মন্দির :—

'বেনারস-টাউনহলের' দক্ষিণদিকে গোপালজীর এই প্রকাণ্ড ও প্রসিদ্ধ মন্দির এবং অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। সহরের মধ্যে এত বড় বড় প্রাঙ্গন ও অসংখ্য গৃহাদি সমন্বিত প্রাসাদসম অট্টালিকা আর নাই বলিলেই হয়। ইহা 'গোপাল-মন্দির' বলিয়াই পরিচিত। নিত্য নিয়মিত সময়ে শ্রীগোপাললালের এবং পার্শ্বে শ্রীমুকুন্দলাল দেবের দর্শন ভক্তজনের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাবণ মাসে অতি সমারোহে ঝুলন ও মনোরথের উৎসব হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে শ্রীরণছোড় দেবের মন্দির, নিকটেই বড় মহারাজের মন্দির, বলদেবজীর মন্দির অবস্থিত। ইহার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন পথে সাবেকি ধরণে সুবৃহৎ সিংহদ্বার। বল্লভাচার্য্য গোস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গুজ্জরদেশীয় বা গুজরাটী ব্রাহ্মণজাতীয় গোস্বামী এই মন্দিরের অধিকারী। তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদিসহ নানা বিলাসপরিপুষ্ট রাজপরিবারের ন্যায় সসম্মানে এই মন্দির বা পুরীমধ্যেই বাস করেন। ইঁহাদের ধন-ঐশ্বর্য্যও নিতান্ত কম নহে। ভূতপূর্ব্ব গোস্বামী মহারাজ বা 'লালবাবার' সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের পরিচয় ছিল। কাশীধামে যাইলেই তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিলে তিনি দুঃখিত হইতেন। তিনি যেমন সুপুরুষ তেমনি অমায়িক ও সুপণ্ডিত ছিলেন, সকলবিদ্যায় তিনি বিশেষরূপে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় গুণগ্রাহী ব্যক্তি অধুনা সচরাচর

দেখা যায় না। রাজসভায় অনুকরণে তাঁহার একটী নাতিবিস্তৃত সভা-গৃহ ছিল। তথায় তিনি মখ্‌মলের সুকোমল গদির উপর বাজার ন্যায় অথবা নূতন বরের মত নানা রত্নমালা ও কিংখাপের বস্ত্রাদিতে বিভূষিত হইয়া উপবেশন করিতেন। সভাগৃহের সাজসজ্জাও সম্পূর্ণ রাজোচিত ছিল। সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তি-গণ সর্ব্বদা সভা উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন। তিনি নিজে একজন অসাধারণ সুর-বাদক ছিলেন। কাশীর প্রধান প্রধান বৈশ্য, আগরওয়ালা বেণীয়া ও জহুরীগণ গোপালমন্দিরেরই শিষ্যমণ্ডলী। তাঁহার সম্মান ও আত্মমর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল। গায়কোবাড-প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। প্রায় বিশ বৎসর গত হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় লালবাবা নিজেই গোপালজীর অর্চ্চনা করিয়া আরত্রিক করিতেছেন, বহু শিষ্যমণ্ডলী ভক্তিভরে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়-মান আছেন এমন সময় যেমন তিনি আরত্রিকবিধি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন, অমনি তাঁহার শেষ বায়ু গোপালজীর চরণে বিলীন হইয়া গেল। এক্ষণে তাঁহার সন্তানই এই গোপালমন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া অন্যূন শত বৎসর বা তদপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। গোপালজীর নিত্য যে সমস্ত ভোগ হয়, তাহা মন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণে পুরী-জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় নিত্য বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। লালবাবার সময়ে মন্দির ও ভোগরাগের যেমন সুব্যবস্থা ছিল, গুণী, জ্ঞানীজনের যেমন উদার সম্মান ও সমাদর ছিল, অতিথি অভ্যাগতের যেমন সেবা আদর ছিল,

এখন তেমন আর নাই। দিন দিন মন্দির-পরিচালকগণের নানা ত্রুটীর কথা শুনা যাইতেছে। তবে কাশী-দর্শনাভিলাষী বিশেষ বিষ্ণু-উপাসকগণের এই গোপালমন্দির অতি অবশ্য দর্শন করা কর্ত্তব্য।

মহাপ্রভু শ্রীমৎ চৈতন্যের বৈঠক ঃ—

যতনবট্ বা যতনবড়্ নামক মহল্লায় মহাপ্রভু শ্রীমৎ চৈতন্য-দেবের বৈঠক বা আসন বিদ্যমান আছে। এইস্থানে শ্রীকাশীনাথ মিশ্র ও শ্রীতপন মিশ্রের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা যে অতি পবিত্র পুণ্যপীঠ তাহা বলাই বাহুল্য। কিছুদিন হইল এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সুন্দর মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বৃদ্ধকালেশ্বর ঃ—

কালোদকের অনতিদূরে মন্দাকিনী-তীর্থ। অধুনা-পরিচিত 'মিউনিসিপ্যাল-গার্ডেনের' উত্তরপূর্ব্বদিকে বৃদ্ধকালের অতি প্রাচীন পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—"ইহার গঠনদৃষ্টে এই মন্দিরটী অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। অনেকের মতে এক্ষণে কাশীতে যতগুলি শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। 'কাশী-খণ্ড' প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সুপ্রাচীন সত্যযুগে দক্ষিণ দেশস্থিত 'নন্দিবর্দ্ধক' নামক প্রদেশে 'বৃদ্ধকাল' নামে একজন নরপতি বাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসের ইচ্ছায় নিজ মহিষীসহ কাশীধামে আসিয়া

উপস্থিত হন ও অনতিকালমধ্যে এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই বৃদ্ধকালেশ্বর নামে এই প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের ইতিহাস-সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে এই অট্টালিকা ও মন্দির দ্বাদশটী প্রাঙ্গণবিশিষ্ট ছিল, এবং ক্রমে ধ্বংস হইতে হইতে উহার ছয়টীমাত্র প্রাঙ্গণ এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। সেগুলিরও এরূপ শোচনীয় অবস্থা, কোন সময় যে, তাহা সমভূমি হইয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। বৃদ্ধ-কালের মন্দিরান্তর্গত সিন্দূরশোভিত 'মহাবীরের' একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে, দক্ষিণপার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তরবিনির্ম্মিত 'কালী-প্রতিমা' এবং চতুরস্র প্রাঙ্গণ, সম্মুখে মহাদেবের নন্দী বা বৃষমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালী-প্রতিমার দক্ষিণদিকে 'গণেশ' ও 'পার্ব্বতীমূর্ত্তি' এবং বাম পার্শ্বে 'ভৈরবনাথ', 'হনুমানজী', 'সূর্য্য', 'বিষ্ণু' ও 'লক্ষ্মীমূর্ত্তি' অবস্থিত। এই স্থলে একটী কূপ ও একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। কুণ্ডের জল জ্বরাব্যাধি, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক, বিচর্চিকা, অগ্নিমান্দ্য, শূল, প্রমেহ, প্রবাহিকা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভূতজ্বর, বিষমজ্বর, অর্শ, দুরারোগ্য বিবিধ রোগনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। রোগীগণ এই কুণ্ডে অতি ভক্তি-ভাবে স্নান করিয়া থাকেন। কূপের জল যেমন পবিত্র তেমনি নির্ম্মল, সকলেই তাহা ভক্তিপূত হৃদয়ে পান করিয়া থাকেন।

অমৃত-কুণ্ডঃ—

এই স্থানেই প্রসিদ্ধ অমৃত-কুণ্ড। কুণ্ডের পার্শ্বে প্রসিদ্ধ অমৃতেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় বা অল্পমৃতেশ্বর ঃ—

বৃদ্ধকালেশ্বর-শিবমন্দিরেব দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির বা গৃহেব মধ্যে 'অল্পমৃতেশ্বর' বা 'অপমৃত্যুহরেশ্বর' শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভক্তগণেব বিশ্বাস এই অমৃতেশ্বর মহাদেব, অল্পায়ু মানবকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। সেই কারণ বহু তীর্থযাত্রী এই শিবলিঙ্গ দর্শন ও ভক্তিভবে পূজা করিয়া থাকেন। এই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে তণ্ডুল ও দধিচিপেটকান্নের ভোগ দেওয়া হয় বলিয়া, নীচশ্রেণীর গ্রাম্য লোকেরা 'ভাত-খাউয়া' মহাদেব বলিয়া ইঁহাকে অভিহিত করে।

নাগেশ্বর ঃ—

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিকটেই নাগকুঁয়া মহাল্লায় 'নাগকূপ' নামে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। কথিত আছে, নাগপঞ্চমীর দিবস এই স্থানে ভক্তিভরে নাগবাজের পূজা করিলে জীবনে সর্পভয় থাকে না। প্রায় শতাধিকবর্ষ অতীত হইল, একজন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই কূপের চারিধার প্রস্তরদ্বারা সুন্দররূপে বাঁধাইয়া কূপের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহারই অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র মন্দির বা গৃহমধ্যে সর্পবেষ্টিত নাগেশ্বর-লিঙ্গ অবস্থিত। বাহিরে সোপানপার্শ্বে স্বতন্ত্র তিনটী সর্পমূর্ত্তি আছে।

এই মহল্লাতেই 'মার্কণ্ডেশ্বর' ও 'দক্ষেশ্বর' নামে আবও দুইটী শিবলিঙ্গ আছেন। দক্ষেশ্বরমূর্ত্তি অধুনা বৃদ্ধকালের মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত।

বাগীশ্বরী ঃ—

নাগেশ্বরের অনতিদূরে বাগীশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দির-মধ্যে অষ্ট-ধাতুবিনির্ম্মিত মনোহারী দেবীপ্রতিমা সুন্দর সিংহোপরি অবস্থান করিতেছেন। দেবীর মস্তকে সুন্দর রত্নমুকুট, তাহাতে প্রতিমার শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মন্দিরটীও মন্দ নহে, বিবিধ দেবদেবীর চিত্রাবলীতে মন্দির-প্রাচীর চিত্রিত। 'নবগ্রহ' ও 'রামসীতা' প্রভৃতি আরও কয়েকটী প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে রক্ষিত আছে। মন্দিরের এক দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সিংহ-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায়, আমেটী-রাজ কর্ত্তৃক এই সিংহমূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাগেশ্বরী ঃ—

বৃদ্ধকালেশ্বর মহাল্লার পর ঔসনগঞ্জ নামক মহাল্লায় যাইলে 'যাগেশ্বরী' দেবীর প্রসিদ্ধ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরটীও দেখিতে মন্দ নহে। ইহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার ভূমি, উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে।

আলম্‌গির-মস্‌জিদ্‌ ঃ—

অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে হিন্দুবিদ্বেষী মোসলমানগণ আর্য্যদিগের অতি পবিত্র ও প্রাচীন কৃত্তিবাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই ইষ্টক-প্রস্তরাদি উপাদান-সহযোগে এই আলম্‌গির মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধকালের মন্দির হইতে ইহা প্রায় শতগজ মাত্র ব্যবধান হইবে। পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের চক্ষে ইহার মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক। ইহার সেই

অবিকৃত স্তম্ভ ও উপাদান সকল বাস্তবিকই কত প্রাচীন কথার পরিচয় দেয়। কোন কোন মহাত্মা বলেন, ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের অতি উজ্জ্বল আদর্শ। সেই কারণ অনেকেই অনুমান করেন, ইহা কোনও প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইবে। বাস্তবিক এরূপ সরল কারুকার্য্য সমান্বিত স্তম্ভাদি দেখিয়া ভারতের অতি প্রাচীন স্থাপত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কেহই ইতস্ততঃ করেন নাই। যাহা হউক মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইবার পর, ইহারই দক্ষিণদিকে পুনরায় নূতন মন্দিরে কৃত্তি-বাসেশ্বর মহদেবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রাণ অন্ধবিশ্বাসী সাধারণ মানব মস্‌জিদসংলগ্ন সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও প্রস্তরাদি দর্শন করিয়া এখনও সেই প্রাচীন মন্দিরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা মস্‌জিদ্‌মধ্যে প্রবেশা-ধিকার না পাইলেও, উহার প্রাঙ্গণান্তর্গত একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তম্ভের উপর পুষ্প-চন্দন সহযোগে পূর্ব্বাধিষ্ঠিতের উদ্দেশ্যে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই স্তম্ভটী একটী ক্ষুদ্র জলকুণ্ডের মধ্যে রক্ষিত আছে। অনেকে সেই স্তম্ভের সম্মুখে কখন কখন পূজার জন্য পয়সা ও অন্যান্য উপচারও রাখিয়া যায়। মস্‌জিদের রক্ষাকর্ত্তা মোসলমান মোল্লা প্রভৃতি তাহা উঠাইয়া লয়।

কৃত্তিবাসেশ্বর ঃ—

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃত্তিবাসেশ্বর মহাদেবের সেই পূর্ব্বমন্দির নাই, তাহাই আলমগির-মস্‌জিদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। কাশী-খণ্ডের বর্ণনানুসারে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে এই মন্দির অতি প্রকাণ্ড ছিল, বহুদূর হইতে ইহার চূড়া প্রত্যক্ষীভূত হইত। কথিত আছে, দর্শনাভিলাষী ভক্ত দূর হইতেই মন্দিরের সেই

পবিত্র চূড়া দর্শন করিবামাত্র কৃত্তিবাসত্ব লাভ করিতেন।

সত্যযুগে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রবল পরাক্রান্ত গজাসুর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হন যে, কামপরাজিত স্ত্রী ও পুরুষ মাত্রেরই তিনি অবধ্য হইবেন। সেই দর্পে জগৎ-সংসার তাঁহার নিকট তৃণতুল্য বোধ হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, প্রকৃতই ত্রিসংসারে তখন তিনি একপ্রকার অবধ্য হইলেন; কিন্তু মদন-বিজয়ী শূলপাণি বিশ্বেশ্বর তাহা জানিয়া জগতের শান্তিস্থাপনার্থে তাঁহাকে ত্রিশূলবিদ্ধ করিলেন। অসুর-পতি তখন অতি কাতরভাবে কত স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, শঙ্কর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেনঃ—"তোমার এই শরীর অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে মুক্তি-বিধায়ক শ্রেষ্ঠতম লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মহাপাতকনাশক 'কৃত্তিবাসেশ্বর' নামে ইহা পরিচিত হইবে।" দেবাদিদেব দিগম্বর মহাদেব গজাসুরের প্রার্থনা অনুসারে তখন হইতেই তাঁহার কৃত্তি বা চর্ম্ম চিরদিন উত্তরীয়রূপে পরিধান করিয়া আসিতেছেন, সেই কারণেই তাঁহাকে লোকে 'কৃত্তিবাস' বলিয়া পূজা করে।

বিধিপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সপ্তকোটি-মহারুদ্রমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে একবারমাত্র কৃত্তিবাসেশ্বর পূজা করিলেই সেই ফল হইয়া থাকে। মাঘীকৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি কাশীধামে এই মহালিঙ্গ সমীপে নিশাজাগরণ করিবে, নিঃসংশয়ে তাহার পরম-গতি লাভ হইবে। চৈত্রীপূর্ণিমায় এই কৃত্তিবাসেশ্বরের সম্মুখে মহোৎসব করিলে আর গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

যাহা হউক সেই পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হইবার পর তাহারই

দক্ষিণদিকে রাস্তার উপর, সম্মুখে সামান্য পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত এই মন্দির পুনর্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তমাত্রেরই কাশীতে আসিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য।

হংসতীর্থ :—

উক্ত মন্দিরের অব্যবহিত পশ্চাতে 'হংসতীর্থ' নামক এক প্রসিদ্ধ কুণ্ড অবস্থিত। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, পূর্ব্বকথিত গজাসুর ত্রিশূলাঘাতে যে স্থানে পতিত হন, শূলোৎপাটনকালে সেই স্থানে এই কুণ্ড উৎপাত হয়। মানবগণ এই স্থানে স্নান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হয়।

কথিত আছে, পুরাকালে একবার বার্ষিকী চৈত্রীযাত্রা-উপলক্ষে রাশিকৃত অন্ন প্রস্তুত হয়, তদ্দর্শনে বায়সাদি পক্ষিকুল সমবেত হইলে, গগণমার্গে তাহাদের পরস্পরে যুদ্ধ লাগিয়া যায়, তাহাতে অনেকগুলি কাক বিনষ্ট হইয়া কুণ্ডে পতিত হয় ও কিয়ৎক্ষণ পরে হংসত্বলাভ করে। যাত্রিগণ এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া তদবধি এই কুণ্ডকে 'হংসতীর্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সাধারণের ধারণা কাকের সেই ঘোর কৃষ্ণ-মলিন-বর্ণসম জীবের অনন্ত পাপকালিমারাশি এ কুণ্ডে স্নান করিলে বিধৌত হইয়া হংসবৎ নির্ম্মল ও শুভ্র হইয়া যাইবে।

কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে এই কুণ্ডটী রাশিকৃত আবর্জ্জনায় পূর্ণ ছিল, কতকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির যত্নে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে এবং ইহার তিন পার্শ্বে উচ্চ ইষ্টক-প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিকভাবে ইহা উত্তমরূপে সংস্কৃত হইলেও বহুকালের পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনার দূষিত বিষ এখনও বিনষ্ট

হয় নাই। সেই কারণ কুণ্ডের জল এখনও স্নানের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

রত্নেশ্বর ঃ—

আলমগির-মসজিদ ও কৃত্তিবাসের মন্দিরের মধ্যে রাস্তার উপর দুইটী লোহিত বর্ণের মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে একটী 'রত্নেশ্বরের' পবিত্র মন্দির। গিরিরাজ 'হিমালয়' জামাতাকে অত্যন্ত দরিদ্র বিবেচনা করিয়া, বহু রত্নরাজী সমভিব্যাহারে নিজ কন্যা 'পার্ব্বতীকে' দেখিতে আসেন, কিন্তু এখানে আসিয়া তদপেক্ষা কাশীর অসংখ্য ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করতঃ লজ্জায় হর-পার্ব্বতীর সহিত আর সাক্ষাৎ না করিয়াই কালভৈরবের উত্তরভাগে সেই সকল রত্নরাজী রক্ষা করিয়া চলিয়া যান। পার্ব্বতী তাহা জানিতে পারিয়া পিতৃপরিত্যক্ত সেই সকল বহুমূল্য স্বর্ণরত্নাদিদ্বারা 'রত্নেশ্বরের' প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। বহুগণকর্ত্তৃক সেই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিধর্ম্মী-অত্যাচারে সেই মন্দির বিনষ্ট হইলে, এই বর্ত্তমান মন্দির নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় নব্বই বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মন্দিরের ভিত্তি খোদিত হয়, তখন মৃত্তিকা হইতে বহু মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল। এই মন্দিরটী পথের মধ্যে এমন ভাবে বিনির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহাতে পথের আয়তন ক্ষুদ্র ও তদ্‌সহ পথটী বক্রও হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে কোন ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি কি এক অজানিত কারণে তিনি সে অভিলাষ পরে পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় মন্দিরটীর মধ্যে হনুমানজী ও আর একটী শিবলিঙ্গ আছে।

সতীশ্বর ঃ—

এই বক্রেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই প্রসিদ্ধ অষ্ট-মহালিঙ্গের অন্যতম 'সতীশ্বর' মহাদেবের স্থান। কাশীখণ্ডের শততম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—মানব স্বীয় ভীষণ পাপরাশির নিবারণার্থে প্রথমে (বৃদ্ধকালে) দক্ষেশ্বর, (ত্রিলোচনে) পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর, (জ্ঞানবাপীতে) গঙ্গেশ্বর, (ত্রিলোচনে) নর্ম্মদেশ্বর, (বাঙ্গালীটোলা মঙ্গলা-গৌরীর নিকট) গভস্তীশ্বর, (বক্রেশ্বরের নিকট) সতীশ্বর এবং (জ্ঞানবাপীতে) তারকেশ্বর দর্শন করিবে।

মন্দাকিনী তীর্থ ঃ—

মন্দাকিনী তীর্থ বা মন্দাকিনী-তলাও, অধুনা "মৈদাগিন্" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বারানসীর একটী প্রধান তীর্থ। কাশীখণ্ডে ইহার যথেষ্ট মাহাত্ম্য দেখা যায়। বেনারস-টাউনহলের সম্মুখে বিশ্বে-শ্বরগঞ্জের নিকট বা পশ্চিমদিকে যে "কোম্পানী-বাগ বা মিউনি-সিপ্যাল গার্ডেন" আছে, তাহাই পূর্ব্বে মন্দাকিনী-তীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। এক্ষণে উক্ত বাগানের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী-টীকে মন্দাকিনী-তলাও বলিয়া অনেকে অভিহিত করে। মিঃ জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ "বেনারস" নামক গ্রন্থে মন্দাকিনীর যে চিত্রখানি দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বেশ অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে এই জলাশয় একটী সুবিস্তৃত হ্রদরূপে পরিণত ছিল। তখন বর্ষার গঙ্গা-প্রবাহ ইহার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গারই শাখারূপে কাশীতলবাহিনী জাহ্নবীর সমান্তরে বারানসী-নগরীর পশ্চিম-সীমাস্বরূপা বহুবিস্তৃতা মন্দাকিনী-নদী

করে হ্রদের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইত। অনন্তর প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে অনুমান ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচন-মহল্লার একটী 'টানেল,' 'ড্রেণ' বা ভূগর্ভে বিস্তৃত পয়োপ্রণালার দ্বারা উহার জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে অনতিকালমধ্যে মন্দাকিনী প্রায় শুষ্ক হইয়া আইসে; তখন মন্দাকিনীতে বিশালকায় বহুসংখ্যক 'কূর্ম্ম' বাস করিত, যাত্রীগণ নিত্য তাহাদের আহার্য্য দিত, সেই গুলিকে কেহই বধ করিত না। হ্রদের জল শুখাইয়া যাইলে, কোন ধর্ম্মপ্রাণ মহাজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যেক কূর্ম্মের জন্য দুই আনা করিয়া দিয়া প্রায় দেড় হাজারেরও অধিক কূর্ম্ম গঙ্গায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেগুলির কোনটীই দুই মণের কম ছিল না। এই জলাশয়ের পশ্চিম প্রান্তের শেষমুখে তখন কাশীর "সংস্কৃত কলেজ" অবস্থিত ছিল এবং তাহারই নিকট বাঁধের উপর "কাণ-ফাটা" সাধুদিগের একটী কুটীর ছিল। তাহারা সেই স্থানে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া সাধন ভজন করিতেন। এক্ষণে সেই সকলের কোন চিহ্নই নাই। তবে 'কাণফাটা' সাধুদিগের আদি গুরুস্থান গোরক্ষনাথের প্রাচীন মঠ বা 'গোরক্ষনাথের টীলা'টী বিদ্যমান আছে। যাহাহউক এই জলাশয় ক্রমে শুষ্ক হইয়া আধুনিক সহরের অঙ্গ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। 'বিশ্বেশ্বরগঞ্জ' নামক প্রকাণ্ড শস্য-বাজার ও 'কোম্পানীর বাগ' প্রভৃতিতে তাহা পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে বারাণসীতে এইরূপ বহু জলাশয় ছিল, ক্রমে তাহা কতক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কতক বা মিউনিসিপ্যালিটী ভরাট করিয়া বাসোপ-যোগী ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। তবে কোন কোন স্থলে তাহার চিহ্নস্বরূপ অতি সংকীর্ণ কুণ্ড বা ডোবার মত রাখা হইয়াছে। পরে বর্ণিত 'মৎস্যোদরী' আদি জলাশয়গুলি তাহারই পরিচয়স্থল।

বড়গণেশ ঃ—

বেণারস টাউনহলের উত্তর-পশ্চিমদিকে বা মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের ঠিক পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর যাইলেই "বড়গণেশ-মহল্লা।" এই মহল্লার মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন দেবমন্দির ও শিবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। বড়গণেশের গলির মধ্যে উত্তরমুখে ঢুকিয়া কিছুদূর যাইলেই ডানদিকে 'বড়গণেশের' প্রকাণ্ড মন্দির, মন্দিরের মধ্যে পূর্ব্বমুখে স্থাপিত সিন্দুরলিপ্ত শ্রীভগবানের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (কাশীতে অন্নপূর্ণাজী ও দুর্গাজী ব্যতীত বহু মন্দিরেই দেবতা পূর্ব্বমুখেই স্থাপিত দেখা যায়।) যাহাহউক কাশীর মধ্যে যতগুলি গণেশমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা আকারে বৃহৎ, এই কারণ ইঁহার 'বড়গণেশ' নামই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাশীখণ্ডে বোধ হয় ইনিই "দন্তহস্ত" গণেশ্বর বলিয়া বর্ণিত। ইনি কাশীদ্রোহিদিগের বহু সহস্র বিঘ্ন লিপিবদ্ধ করেন! ইনি ঢুণ্টিরাজ গণেশেরই রূপান্তর। ঢুণ্টিরাজের, বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণার অধিকারী বা সেবায়েৎ পাণ্ডারাই এই বড়গণেশেরও পাণ্ডারূপে চিরকাল নিযুক্ত রহিয়াছেন। অধুনা এইস্থানে বিশ্বনাথের পূজারিদিগের অনেকেই অবস্থান করিয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখে গণেশ্বরের সভামণ্ডপে গণপতি-বাহন একটী প্রকাণ্ড 'মূষিক-মূর্ত্তি' স্থাপিত আছে। এখানে নিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে গণেশপুরাণাদি পাঠ হয়। নিত্য পূজা অর্চ্চনা ব্যতীত প্রতি বৎসর মাঘী-শুক্লচতুর্থীতে গণেশজীর বিরাট রাজবেশ বা শৃঙ্গার হয়, কাশীবাসী সকলেই সেইদিন ইঁহার দর্শন করিতে আসেন। এই উপলক্ষে সেইদিন এখানে এক প্রকাণ্ড মেলা বসে এতদ্ব্যতীত ভাদ্রমাসে একাদশী হইতে পূর্ণিমার মধ্যে

কোন একদিন গণেশের বিশেষ শৃঙ্গারও হয়। তাহাতে কাশী-বাসী ব্যবসায়ী গাহিকামণ্ডলী (বাইওয়ালী) সদলবলে আসিয়া নৃত্যগীত করিয়া যায়। তাহাদের ধারণা গণেশজীকে গান শুনাইলে তাহাদের সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি হইবে। সেই কারণ এতাধিক প্রতিযোগীতা হয় যে, একদল গাহিকা গীত শেষ করিতে না করিতে অন্যদল 'আসর আগলাইয়া' নিজেদের যন্ত্র বাঁধিতে থাকে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যেন অগ্রে সেই গান শুনাইয়া যাইবে। এই সঙ্গীতালাপ দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতি চতুর্থীতেই অনেকে গণেশ-জীব বিশেষভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রীজাতীয় মহাজন, বিশ্বেশ্বরগঞ্জ ও গোলার ব্যবসায়ী বণিকগণ সময় সময় নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া গণেশ-চতুর্থীর পর এই গণেশজীর বিশেষ উৎসব ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইয়া থাকেন। এই মন্দিরসংলগ্ন একটী 'পঞ্চায়তী উদ্যানবাটী' আছে তাহাতেই সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

জম্বুকেশ্বর :—

বড়গণেশের উত্তরদিকে গণেশজীর ফটকের ঠিক সম্মুখেই 'জম্বুকেশ্বর' মহাদেবের অতি প্রাচীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশীখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁর অর্চ্চনা করিলে জীব পুনরায় তীর্য্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। ইনি তীর্য্যক যোনি-নিবারক।

শ্রীরামলীলা :—

এই গণেশজীর দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ রামলীলার বাগান।

আশ্বিনমাসের নবরাত্রি উপলক্ষে এখানে ১৫।২০ দিন রামলীলার গীত ও অভিনয় হইয়া থাকে। কাশীতে বহু রামলীলার অধিবেশন হয় বটে কিন্তু এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান। এখান হইতেই "নাটীইমলীতে" রামলীলা করিতে যায়। কাশী-মহারাজ এখান হইতেই হস্তীতে চড়িয়া "নাটীইমলীতে" লীলায় যোগদান করিয়া থাকেন।

আনন্দাশ্রম :—

এই বড়গণেশের মন্দিরের সংলগ্ন উত্তরদিকে যে শিবালয় বা মঠ আছে, তাহাই 'আনন্দমঠ' 'আনন্দাশ্রম' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে কোন না কোন পরমহংস, সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন। মঠের মধ্যে "আনন্দনাথ" শিব পঞ্চায়তনে স্থাপিত। কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের কোন আত্মীয়া কিঞ্চিৎ ন্যূন প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানটী অধুনা সহরের অন্তর্গত হইলেও বেশ নির্জ্জন ও তপোবন-সদৃশ শান্তিপ্রদ এবং সাধনানুকূল। বর্ত্তমান সময়ে একজন ত্যক্তদণ্ড পরমহংসাশ্রমী বিশিষ্ট সন্ন্যাসী এখানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ভক্ত ও গৃহস্থ শিষ্যগণ আশ্রমের প্রয়োজনীয় সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুল :—

এই আনন্দাশ্রমের পূর্ব্বদিকে ও মন্দাকিনী-তলাও বা কোম্পানীবাগের পশ্চিমদিকে কাশীর প্রসিদ্ধ হিন্দী-কবি ভারতেন্দু 'হরিশ্চন্দ্রজীর' প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'হরিশ্চন্দ্র হাই-স্কুলের' অট্টালিকা নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশীর বিদ্যাপীঠ অংশে এই স্কুলের

বিস্তৃত আলোচনা করিব। উক্ত আনন্দাশ্রমের উত্তরদিকে আবার 'মিউনিসিপ্যাল-বোর্ড স্কুল' স্থাপিত আছে।

কল্যাণীদেবী, নৃসিংহদেব ও মহালক্ষ্মী :—

উক্ত আনন্দাশ্রমের সামান্য উত্তরদিকে 'কল্যাণীদেবীর' প্রাচীন মন্দির অবস্থিত।

এই মন্দিরের আরও কিছু উত্তরে 'নৃসিংহদেবের' অতি প্রাচীন মন্দির ও চৌতারা আছে। বৈশাখ মাসে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর দিবস এইস্থানে এক প্রকাণ্ড মেলা হয়।

গোরক্ষনাথের টীলা, জলন্ধরনাথ ও যোগমায়া :—

'হরিশ্চন্দ্র হাই-স্কুলের' ঠিক উত্তরদিকে কোম্পানীবাগের পশ্চিমে রাস্তার উপরেই 'গোরক্ষনাথের' অতি প্রাচীন পাদুকা-মন্দির, টিলা বা মঠ অবস্থিত। মঠের অট্টালিকা অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরের মধ্যে গোরক্ষনাথের চরণচিহ্ন আছে। এখানে 'গোরক্ষ-পন্থী কানফাটা' বা 'নাথ'সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ বাস করিয়া থাকেন। সশিষ্য একজন বৃদ্ধ কানফাটা সাধু স্থায়ীভাবে এখানে থাকেন। তিনিই মঠের মোহান্ত। সাধারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধুরাও মধ্যে মধ্যে এখানে আশ্রয় লইয়া থাকেন। গোরক্ষনাথের পাদুকামন্দিরটী ক্ষুদ্র। এখানের প্রধান মন্দির 'জলন্ধরনাথের'। এই মন্দিরটী যেমন প্রকাণ্ড তেমনি দেখিতে সুন্দর। এইস্থানে 'যোগমায়ারও' একটী মন্দির আছে। প্রাচীনকালে মন্দাকিনী-তীর্থের ধারেই এই গোরক্ষনাথের টিলা বা উচ্চ স্তূপভূমি বিদ্যমান ছিল। এখানে একসময় ভগবান গোরক্ষনাথ যোগমায়ার কৃপায় যোগস্থ হইয়াছিলেন। এই টিলার চারিদিকের ভূমি গোরক্ষ-

নাথেরই সম্পত্তি। 'হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুল'টী গোরক্ষনাথের ভূমিতেই স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যোধপুর রাজার অভিমতে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডের' অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাচীন মোহান্তের শিষ্য পুনরায় তাহার উদ্ধারে যত্ন করিতেছেন।

কবির সাহেবের মঠ :—

বড়গণেশ-মহল্লার পশ্চিমদিকে 'কবিরচৌরা' মহল্লায় একটী গলির মধ্যে মহাত্মা কবির সাহেবের মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সেই গলির এক পার্শ্বে একটী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি গৃহ অট্টালিকা অবস্থিত। এই স্থানটীই 'কবিরের গদি' বা প্রধান 'আখড়া' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্ত ও বহু কবিরপন্থী সাধুসন্ন্যাসী নানাস্থান হইতে আসিয়া এখানে সতত বাস করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রাঙ্গণ-মধ্যে পূর্ব্বগত মহান্তগণের কয়েকটী সমাধিমন্দিরও আছে। উক্ত গলির অন্যপ্রান্তে একটী পুষ্প-বাটীকা আছে। এটী কবির-পন্থা-বলম্বী গৃহস্থগণের জন্য অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়। গলির উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাদ্বয় গলির উপরস্থিত একটী ক্ষুদ্র সেতুদ্বারা সংযুক্ত থাকিলেও নিম্নে পরস্পরের স্বতন্ত্র দ্বার আছে।

লহরতলাও :—

এই মঠ হইতে কিয়দ্দূরে 'লহরতলাও' বা 'লহরতারা' মহল্লার পথ, উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে এক উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর একটী সুন্দর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্বে একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাই 'লহরতলাও' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা বেনারস হইতে এলাহাবাদ যাইবার পথে ৪২৩ সংখ্যক

মাইল প্রস্তরের অতি নিকটেই অবস্থিত। কথিত আছে, কবির সাহেব শৈশবাবস্থায় এই কুণ্ডে বা পুষ্করিণী-মধ্যেই আবির্ভূত হন। এতদসম্বন্ধে 'কাশীর উপাসক-সম্প্রদায়' অংশে আরও কিছু বর্ণিত হইল। উক্ত মন্দিরমধ্যে কবির-সাহেবের পাদুকাচিহ্ন রক্ষিত আছে, ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী তাহাকেই সাক্ষাৎ 'কবিরসাহেব' বলিয়া পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন, ইহাই 'কবির-সাহেবের বৈঠক'। এই স্থানে সর্ব্বদা একজন কবির-শিষ্য বা কবিরদাসী অবস্থান করিয়া থাকেন। মন্দির-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে কয়েকটী সাধকের সমাধি আছে।

মহামণ্ডল :—

লহরতলাওরের নিকট জগৎগঞ্জ মহল্লার চৌমাথার নিকট 'শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের' কার্য্যালয় অবস্থিত। 'মহামণ্ডল' প্রথমে মথুরায় প্রতিষ্ঠিত ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রেজেষ্টিকৃত হয়। পরে কাশীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অশেষ গুণাধার শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ ইহার প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দুজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মঠচতুষ্টয় তথা ভারতের বিভিন্ন হিন্দু-সম্প্রদায়ের দশজন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ইহার সংরক্ষক ও সহায়ক। ভারতের প্রায় সমস্ত হিন্দু স্বাধীন নৃপতিই ইহার সংরক্ষকরূপে সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কাশ্মীর, টিহরী, কিষণগড়, ডুঙ্গরপুর আদি রাজন্যবর্গ দানপত্রও লিখিয়া দিয়াছেন।

ভারতের নানাস্থানে ইহার শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া

প্রায় অযুতাধিক ব্যক্তি ইহার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও নানা বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। নিখিল-ভারতীয় এক 'কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির' দ্বারা এই মহামণ্ডলের সকল কার্য্য পরিচালিত হয়। ইহাতে রক্ষা-বিভাগ, প্রচার-বিভাগ আদি বহু বিভাগ আছে, সকলগুলিই বিভিন্ন শাখা-সমিতিদ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার প্রচার-বিভাগ হইতে নানা সদ্‌গ্রন্থ, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অবৈতনিক ও বেতনভোগী প্রায় চতুঃশত প্রচারক নিযুক্ত আছেন।

হিন্দুর প্রাচীন মন্দিরাদি ও তীর্থ-সংস্কারকল্পে ইহার অন্তর্গত 'ধর্ম্মালয়-সংস্কার-শাখাসমিতি' বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যোশীমঠের উদ্ধার, কেদারনাথ, কুরুক্ষেত্র ও বৃন্দাবন আদি প্রাচীন স্থানের মন্দিরাদির সংস্কার কার্য্য এই সমিতিকর্ত্তৃক বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গুণীব্যক্তির সম্মান-পূজাকরাও এই সভার একটী প্রধান কার্য্য। সেকারণ সভা হইতে উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদান করা হয়।

মহামণ্ডলের যজ্ঞবিভাগও একটী অপূর্ব্ব বস্তু। ভারতের এই দুর্দ্দিনে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য এখানে বহু বৈদিক ও তান্ত্রিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-উদ্দেশ্যে একটী স্থায়ী যজ্ঞমণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত বহু যজ্ঞও তথায় যথাবিধি অনুষ্ঠিত ও সংসাধিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টেরও এই সভার সহিত বিশেষ সহানুভূতি আছে। ভূতপূর্ব্ব অন্যতম গবর্ণর-জেনারল লর্ড মিণ্টো-প্রমুখ অন্যান্য গবর্ণরও সহানুভূতিসূচক পত্রদ্বারা এই সভাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করিয়া থাকেন।

এখানে একটী 'উপদেশক মহাবিদ্যালয়' ও 'বিদ্যাপরিষদ্' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। তাহাদের শিক্ষার অতি সুন্দর বিধি ব্যবস্থা আছে। বিদ্যাপরিষদে নানা বিষয়ক পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত 'আর্য্য-মহিলা-মহাবিদ্যালয়,' 'সমাজ-হিতকরি-কোষ' আদি নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ইহাতে আছে।

বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের পর শান্তির স্মৃতিস্বরূপে মহামণ্ডল "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-সদন" নামে এক অভিনব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়াছেন। ইহার জন্য একটী 'ট্রাষ্ট' গঠিত করিয়া এই সদনের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে একটী সাধারণ হলগৃহ, লাইব্রেরী, তুলনামূলক সর্ব্বদর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনার জন্য একটী বিদ্যামন্দির, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর থাকিবার জন্য অতিথিশালা, হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সাম্প্রদায়ীক ও অন্যান্য ধর্ম্মের অনুরূপ আদর্শ উপাসনালয় এবং আবশ্যকীয় মন্দিরাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাশীসহরের অন্তর্গত মহামণ্ডল কার্য্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে একটী সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড ক্রীত হইয়াছে। মহামণ্ডল ধীরে ধীরে এই সকল অভিনব অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব রক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে দেশের যে যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সময় যেরূপ প্রতিকূল এবং এই সকল কার্য্যে নিস্বার্থ, উদার ও সমদর্শী কর্ম্মীর যেরূপ অভাব দেখা যায়, তাহাতে এরূপ বিরাট কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যে নিতান্ত দুরূহ, তাহা বলাই বাহুল্য।

বাল্মীকিকুণ্ড ও বাল্মীকেশ্বর ঃ—

মহামণ্ডলকর্ত্তৃক ক্রীত উক্ত ভূমিতেই অতি প্রাচীন 'বাল্মীকি-কুণ্ড' অবস্থিত আছে। বহুদিন হইতে এই কুণ্ড ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায় মহামণ্ডলের উদ্যোগে ইহার পুনরুদ্ধার ও সম্পূর্ণ সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই বাল্মীকি-কুণ্ডের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ষ্টেসন-রোডের পার্শ্বে প্রসিদ্ধ 'বাল্মীকেশ্বরের' অতি প্রাচীন মন্দির একটী টিলা বা পাহাড়ের মত একটী উচ্চ মৃদ্স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে সময় সময় কোন না কোন সাধু অবস্থান করিয়া থাকেন।

চেৎগঞ্জ সমাধিভূমি ঃ—

মহারাজ চেৎসিংহের সহিত ইংরাজের মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, গবর্ণর-জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিং চেৎসিংহকে নজর-বন্দী রাখিবার আদেশ দেন। সেই উপলক্ষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে রাজার সৈনিকদিগের সহিত ইংরাজ সৈন্যের যে ঘোর যুদ্ধ হয়, তাহাতে এই চেৎগঞ্জে কয়েকজন 'অফিসার'-সহিত বহু ইংরাজ-সৈন্য হতাহত হয়। চেৎগঞ্জ-থানার পার্শ্বে সেই সকল ইংরাজ-সেনা ও সেনানায়কের শবদেহ সমাহিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সমাধির উপর সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানটী চারিদিকে ইষ্টক-প্রাচীরদ্বারা সুরক্ষিত। অনেকে বলেন, ইংরাজদিগের জনৈক চোপদার-সাহেব 'চেৎরামজী' এই স্থানে নিহত হন। তাঁহারই স্মৃতি-সম্মানের জন্য এই স্থান চেৎগঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ঈশ্বরগাঙ্গীতলাও ঃ—

'ঈশ্বরগাঙ্গীতলাও' বা এই কুণ্ডটী অনাদিকাল হইতেই

আছে, এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এতাধিক পুরাতন পুষ্করিণী এক্ষণে কাশীতে আর নাই। ইহার চারি কোণেও অন্যান্য দুই এক স্থানে অনেক দেব-বিগ্রহ পড়িয়া আছে; ইহাদের মধ্যে মকরবাহনে একটী 'গঙ্গামূর্ত্তি' ও আর একটী 'সূর্য্যমূর্ত্তি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কয়েকটী গৃহে 'রামায়ৎ সন্ন্যাসীরা' বাস করেন এবং তাঁহারা নিত্য সন্ধ্যার সময় তথায় রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাতৃতীয়ায় এই স্থানের হিন্দুস্থানী রমণীগণের একটী মেলা হয়, তাহারা ঐ দিবস এখানে দলবদ্ধ হইয়া কাশীর সুপ্রসিদ্ধ 'কাজরী-গীত' গাইয়া থাকে। ইহা তাহাদের 'তীজ' উৎসব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাগেশ্বর ও গুহাগঙ্গা :—

ঈশ্বরগাঙ্গীর নিকটেই 'যাগেশ্বরের' ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে 'যাগেশ্বর' মহাদেব ব্যতীত বাহিরে অন্যান্য বহু প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। প্রায় তিন হস্ত উচ্চ ও দশহস্ত পাবধিবিশিষ্ট শ্যামবর্ণ 'অগ্নিশ্বর' মহাদেব অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে কৃষ্ণপ্রস্তরের 'নন্দী' রহিয়াছে, কিছু দূরে 'অগ্নিশ্বরকুণ্ড' ইহাই 'ঈশ্বরগাঙ্গী' বলিয়া অধুনা প্রসিদ্ধ। যাগেশ্বরের মন্দিরে একটী ছোট গৃহমধ্যে এক ঘোর অন্ধকারময় গুহা আছে, তাহা 'গুহাগঙ্গা' বলিয়া বিখ্যাত।

পাতাল-পুরীয়াস্থান :—

উক্ত 'যাগেশ্বর'-মন্দিরের পার্শ্বেই "পাতাল-পুরীয়াস্থান"। ইহার বাহিরে কয়েকটী মোসলমানী সমাধি-স্তূপ ও একটী বিকৃত

'শার্দ্দূলমূর্ত্তি' দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে একটী বাটীতে দশটী সাধু থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে। দুই দশজন সাধু যাঁহারা সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণু-উপাসক সন্ন্যাসী। শিব ও হনুমানজী প্রভৃতির কয়েকটী মূর্ত্তি ব্যতীত ইহার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে—তাহা ভূমি-তলে একটী গহ্বর মাত্র। কথিত আছে, এই গহ্বর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার সীমা নাই। মর্ত্তলোক হইতে পাতালে যাইবার এই পথ, সেই কারণ ইহার নাম 'পাতালপুরীয়া স্থান'। গহ্বরের মুখ সততঃ তালাবন্ধ থাকে, কেহই তাহার ভিতর দেখিতে পায় না, হয়ত বহুদূর বিস্তৃত কোনও সুড়ঙ্গ থাকিতে পারে।

কর্ণঘণ্টা বা ঘণ্টাকর্ণ ও ব্যাসেশ্বর ঃ—

এ প্রদেশবাসী সাধারণ ব্যক্তি এই 'ঘণ্টাকর্ণ-তীর্থকে' 'করণ-ঘণ্টা' বা 'কর্ণঘণ্টা' বলিয়া উল্লেখ করে। প্রাচীন ইতিহাস সকলের মধ্যে ইহা 'ঘণ্টাকর্ণ হ্রদ' বলিয়াও বর্ণিত আছে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুষ্করিণী বা কুণ্ড। কাশীখণ্ডে দেখা যায়, এই হ্রদে স্নান করিলে কুদেশে মরিলেও কাশীতে মরণের ফল হয়। ইহারই তীরে 'ঘণ্টাকর্ণ' নামক জনৈক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ঘণ্টাকর্ণেশ্বর' শিবলিঙ্গ আছে। ইহার চারিপার্শ্বস্থ পল্লী 'করণ-ঘটা বা কর্ণঘাটা মহল্লা' বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান টাউনহলের অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এই মহল্লা অবস্থিত।

ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের তীরেই 'বেদব্যাসেশ্বর মন্দির'। এই মন্দির-মধ্যে বেদব্যাসের মূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত 'বেদব্যাসেশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের নিকটেই 'চিত্রঘণ্টা' ও 'চিত্রঘণ্টেশ্বরীর' মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরস্থিত মূর্ত্তি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই সকল তীর্থ দর্শন করিবার জন্য প্রতি শ্রাবণ মাসে এখানে বেশ একটী মেলা হইয়া থাকে।

কাশীদেবী :—

পূর্ব্বোক্ত মহল্লার অনতিদূরে কাশীপুরা নামক এক মহল্লা আছে, তথায় একটী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে কাশীর অধিষ্ঠাত্রী 'কাশী-দেবীর অতি প্রাচীন মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কাশী-দর্শনাভিলাষী ভক্ত যাত্রীগণ এই শক্তিপীঠ দর্শন করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। অনেকের বিশ্বাস, এই কাশীদেবীর মন্দিরই কাশীধামের কেন্দ্রস্থল। এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে 'ভূত-ভৈরবের' মন্দির, এই স্থানে 'বারগণেশ' ও 'জগন্নাথাদি' বহু দেব-মন্দির অবস্থিত আছে।

মৎস্যোদরী ও ওঁকারেশ্বর :—

কাশী সহর হইতে রাজঘাট যাইবার পথে টাউনহল ছাড়াইয়া উত্তর-পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইলেই 'মৎস্যোদরী'র প্রাচীন তীর্থ বা কুণ্ড দৃষ্ট হইত। কাশীখণ্ড ও শিবপুরাণাদিতে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। এই তীর্থে স্নান করিলে মানবের বারম্বার জন্মগ্রহণজনিত গর্ভযন্ত্রণা বিদূরিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পুণ্যকামী ভক্তের সে বাসনা পরিতৃপ্তির আর উপায় নাই। বহুদিন হইতে মৎস্যোদরী-কুণ্ডের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সরকার-পক্ষ হইতে তাহা ক্রমে মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাল্যকালে মৎস্যোদরী — সামান্য

জল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে, সে তীর্থের আর চিহ্নমাত্রও নাই বলিলে হয়। এক্ষণে মাত্র একটী ঘাট বিদ্যমান আছে। এখন আর কাহাকেও 'তীর্থ' বলিয়া তথায় যাইতে দেখা যায় না। ইহা 'গোকুলচাঁদ-মেমোরিয়াল-পার্ক' নামে পরিচিত হইতেছে। উহার নিকটেই একটী অতি জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ময়ূরবাহন 'মৎস্যেশের' মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির-মধ্যে 'নরসিংহের'ও একটী মূর্ত্তি আছে। নিকটেই মহর্ষি 'দুর্ব্বাসা'রও একটী জীর্ণ মূর্ত্তি রহিয়াছে। কাশীখণ্ডোক্ত প্রসিদ্ধ 'ওঁকারেশ্বরলিঙ্গের' বা 'প্রণবেশ্বর' মহাদেবের মন্দিরও এই মৎস্যোদরীর উত্তরদিকের গলির মধ্যে অবস্থিত। এই পল্লী 'ওঁকারেশ্বর মহল্লা' বলিয়া পরিচিত।

গঞ্জীসাহিদান মস্ক :—

ইহা একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন মস্‌জিদ। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইহা পুনরায় লোকনয়নের নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজঘাটের সন্নিকট জনৈক মোসলমান ভদ্রলোকের বাটীর পার্শ্বে তাঁহারই অধিকৃত কয়েক বিঘা পতিত ভূমি ছিল। এক দিবস তাঁহার ভৃত্য কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থানে যাইলে একটী বড় গর্ত্ত দেখিতে পায় ও অনতিবিলম্বে তাহার প্রভুকে এই বিষয়ে সংবাদ দেয়। সেই ভদ্রলোকটী সামান্য মৃত্তিকা উঠাইয়াই নিম্নে একটী গৃহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। গুপ্ত ধনাগার ভাবিয়া প্রথমে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তাহা খনন করিতে থাকেন, পরে এই সুন্দর মসজিদটী বাহির হয়। ৬০টী স্তম্ভ

বিশিষ্ট সুন্দর গৃহটী মোসলমানী ধরনে নির্ম্মিত হইলেও তাহার স্তম্ভাদির কারুকার্য্য দেখিলে বৌদ্ধ-স্থাপত্যের সুস্পষ্ট আভাস বলিয়া মনে হয়। অনেকেই অনুমান করেন, পূর্ব্বে ইহা কোন বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে মোসলমান আধিপত্য-সময়ে মস্‌জিদে পরিণত হইয়া থাকিবে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহা দেখিবার বিষয়।

লাটভৈরো :—

'রাজঘাট-ষ্টেসন' হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই 'বেঙ্গল নর্থওয়েষ্ট রেলওয়ে'র ছোট লাইন দৃষ্ট হইবে, সেই রেলপথ পার হইয়া সামান্য উত্তরদিকে যাইলেই 'জালালীপুরা' গ্রামে এই 'লাটভৈরবের' প্রসিদ্ধ স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বেই একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী, অথবা উক্ত পুষ্করিণীর উত্তর পাড়েই এই স্তম্ভটী প্রোথিত। এই পুষ্করিণীর বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে এই স্তম্ভের কথাই বলিতেছি—ইহার সহিত একটী বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। সাধারণের নিকট ইহা 'লাট-ভৈরব' বলিয়া পরিচিত হইলেও, ঐতিহাসিকগণ ইহাকে 'কুলস্তম্ভ' বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেও কুলস্তম্ভের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইহা বৌদ্ধরাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত, কেহ বলেন, তাহা নহে, বিক্রমাদিত্যই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। যিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা হউন না, ইহা এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ-স্তম্ভ

বলিয়া পূজিত। কাশীবাসী হিন্দুমাত্রের চির-বিশ্বাস ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মূলস্তম্ভস্বরূপ। ইহা আছে বলিয়াই এখনও ধর্ম্ম আছে—যেদিন ইহা সমূলে ধ্বংস হইবে, সেই দিন এই সনাতন-ধর্ম্মও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। সেই কারণ কাশীর প্রত্যেক ধর্ম্মযাজক পাণ্ডাগণ অতি সাবধানে ইহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পূর্ব্বে ইহা বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন সেই মন্দির ধ্বংস করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করেন, তখনও ইহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল, ইহাদ্বারা মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণের শোভা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই, বিশেষ ইহা হিন্দুর যে এত আদরের সামগ্রী, হয় ত তাহা সম্রাট বা তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের আদৌ জানা ছিল না, সুতরাং মস্‌জিদান্তর্গত হইলেও হিন্দুগণ নিরুদ্বেগে যথারীতি স্তম্ভের পূজার্চ্চনাদি করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মস্থানাধিকারী যাজক বা পূজারীদিগের অবস্থা সর্ব্বধর্ম্মে সর্ব্বস্থানেই প্রায় একরূপ; অর্থ-লালসায় এই সকল লোক ক্রমে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্ম্মস্থানের আবর্জ্জনারূপে পরিণত হয়। কোন ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষেই ইহার ব্যতীক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ এমনই অনর্থের মূল! হিন্দু যাত্রীগণ মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণে আসিয়া সেই স্তম্ভের পূজা করে—রীতিমত দর্শনী দেয়—হিন্দু পাণ্ডারই তাহা প্রাপ্য হইলেও সুবিধামত মোল্লাসাহেব ও তদনুচরগণ তাহাতে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিলেন।

লালসা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল. পূজা-দর্শনীর অংশমাত্র লইয়া তাঁহারা আর তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—সর্ব্বগ্রাসই তখন তাঁহাদের অভিপ্রেত হইল। কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ে তাহা সহ্য হইবে কেন? দুই এক কথায় অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। অনন্তর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে দৈবদুর্ব্বিপাকে হিন্দুর 'হোলী' ও মোসলমানের 'মহরম' পর্ব্ব একই সময়ে সংঘটিত হয়, উভয় পক্ষই তখন ধর্ম্মোন্মত্ততার আবরণে যেন রণোন্মত্ত হইল। স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গামাও চলিতেছিল—মোসলমানগণ সহসা সহিষ্ণুতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সেই স্তম্ভের কিয়দংশ ভগ্ন করতঃ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতে হিন্দুমাত্রই তখন ক্ষোভে ও রোষে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উভয় পক্ষের ভীষণ দাঙ্গায় শত সহস্র ব্যক্তি হতাহত হইল। ক্রোধোন্মত্ত মোসলমানগণকর্ত্তৃক সেই স্তম্ভের মূলোৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল—গো-রক্তে হিন্দুর পবিত্র মন্দির সকল কলুষিত হইল। হিন্দুগণও ঘোর প্রতিহিংসাবশে মসজিদসমূহ চূর্ণ ও ভস্ম করিতে আরম্ভ করিল এই সকল ঘটনা দেখিয়া শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, যোগী-সন্ন্যাসী, ধর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মভীরু আবালবৃদ্ধবনিতা পূর্ব্বধারণাবশে কুলস্তম্ভের ধ্বংস, দেবালয় ও দেববিগ্রহসমূহের এরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্টে সনাতন ধর্ম্মের এককালীন বিনাশ ও প্রলয়ের প্রত্যক্ষ্য পূর্ব্বাভাস বোধে সকলেই পতিতপাবনী গঙ্গাতে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য অকাতরে ঝাঁপ দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা, হিন্দু-সতীর 'জহরব্রতের' ন্যায় এরূপ সার্ব্বজনীন অদ্ভুত ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। এক

মুহূর্ত্তমধ্যেই কাশীর সকল সন্তপ্ত হিন্দু প্রজা ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত তৎকালিক সর্ব্বপ্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে বিশিষ্ট ও শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন ও বিবিধ বিধানে সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সকলকে বলিলেন, যথারীতি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিলে বিশ্বনাথের কৃপায় পুনরায় ভারতের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, অচিরে সকল গোলযোগ বিদূরিত হইবে এবং বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা যাহাতে আর কোনরূপ অত্যাচার না ঘটিতে পারে, সে বিষয় ব্রিটীশ-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, এরূপ ভরসা দিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনতিবিলম্বে এই সকল দুর্ঘটনার শান্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণী-তীরে পুনরায় সেই ভগ্ন 'কুলস্তম্ভ' প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন ও তিথি লক্ষ্য করিয়া তখন হইতে প্রতি বৎসর এই স্থানে একটী মহতী মেলা বসিয়া থাকে। সেই ভগ্নস্তম্ভ এক্ষণে প্রায় ৭ ফুট উচ্চ তাম্রাবরণে আবৃত আছে এবং নয় গজ লম্বা চৌড়া ঘেরার মধ্যে অবস্থিত। এই স্তম্ভের নিকটেই মসজিদের ভগ্নাবশেষ বহু প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র স্থান মোসলমানগণকর্ত্তৃক ও অতি যত্নে সংরক্ষিত আছে। তথায় তাহারা নিত্য নেমাজ করিয়া থাকে।

কপালমোচন তীর্থ :—

ইতিপূর্ব্বে 'লাটভৈরবের পার্শ্বে' যে পুষ্করিণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই 'কপালমোচন-কুণ্ড' বা তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ;

বখরিয়া কুণ্ড। (১২৭ পৃষ্ঠা)

কথিত আছে, আদিকালে ব্রহ্মাও পঞ্চানন-বিশিষ্ট ছিলেন, পরে কালভৈরব কর্ত্তৃক তাঁহার পঞ্চম মস্তকটী দেহচ্যুত হইলে, তিনি চতুরানন বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু কালভৈরব এই ব্রহ্মহত্যা-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইয়া তাহার অপনোদনজন্য সেই ব্রহ্ম-কপালহস্তে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করিলেন, নানা তীর্থ-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কোন স্থলেই তিনি সেই কপাল-মোচন করিয়া পাপবিমুক্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পরম পবিত্র পুণ্যভূমি কৈলাসসম কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, কাশী পরি-ক্রমামধ্যে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার সেই মহাপাপ বিমুক্ত হইল ও হস্ত হইতে সেই ব্রহ্ম-কপাল নিপতিত হইল। সেই ব্রহ্ম-কপাল পতিত হওয়াতে এই সুবৃহৎ কুণ্ড উৎখাত হইয়াছে। ইহাই 'কপালমোচন-তীর্থ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাত্রীগণ এখানে আসিয়া স্নান ও পূর্ব্ব-পুরুষের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বখরিয়াকুণ্ড ঃ—

আলাইপুরা বা 'বেনারস-সিটি' ষ্টেসনের দক্ষিণদিকে 'বখরিয়া-কুণ্ড'। কাশীখণ্ডে ইহাই 'বর্করিকুণ্ড' বা 'ছাগকুণ্ড' বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে। এই কুণ্ডটীর জলকর প্রায় ১০।১২ বিঘা হইলেও গ্রীষ্মকালে ইহা অনেকটা শুখাইয়া যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে মোসলমানদিগেরই বস-বাস অধিক, সুতরাং বখরিয়াকুণ্ড-মহল্লা অধুনা একপ্রকার দরিদ্র মোসলমান-পল্লীরূপে পরিণত। এই কুণ্ডের চারিদিকে নানা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর সংস্কার হয় না, ক্রমেই তাহা যেন পরিত্যক্ত জঙ্গলে পরিণত হইতেছে, ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহার অবস্থা

এরূপ ছিল না। সেই অতীত দিবসে ইহার অবস্থার কথা কল্পনার চক্ষে দেখিবার বিষয়, তখন ইহা অতীব সুন্দর, পরম শান্তিপ্রদ ও চিত্তবিনোদক ধর্ম্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখন এই কুণ্ডের চারিদিকে সুন্দর ও মনোহর মন্দির, স্তূপ, চৈত্য ও পরে বৌদ্ধ-বিহারেও সুশোভিত হইয়াছিল। আসিয়াখণ্ডের প্রান্ত-চতুষ্টয় হইতে কত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মা-লোচনায় সতত: এই কুণ্ডের চারিধার মুখরিত করিয়া রাখিতেন, সে ভাব এখন চিন্তা করিবামাত্র হৃদয় যেরূপ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়, কুণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলে সেইরূপই গভীর দুঃখ ও পরিতাপে হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কুণ্ডের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোনদিকেই আর সেই শ্রেণীবদ্ধ সোপান-সমূহ নাই, সোপানের উপর প্রস্তরময় সেই বিস্তৃত পথ নাই, পথিপার্শ্বে সেই পবিত্র চৈত্য, স্তূপ, বা মন্দিরাদিও নাই, সকলই চূর্ণ-বিচূর্ণ-দলিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাশি রাশি স্তম্ভ ও ইষ্টক-প্রস্তরাদি উপাদান অপহৃত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। যাহা আছে, তাহা কতক বিধ্বস্ত, কতক ভগ্নাবশেষ প্রস্তর ও আবর্জ্জনা-রাশিতে পর্য্যবসিত, আর অবশিষ্ট পল্লীবাসী মোসলমানদিগের আবাসগৃহ ও মসজিদে পরিণত হইয়াছে। বহুরূপী মহাকাল, তুমিই ধন্য! তোমার ধর্ম্ম—তোমার ক্রিয়া-কলাপাদি কোন কিছুই আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই, তুমি পক্ষপাত-পরিশূন্য অনাদি ও অনন্ত কাল, তোমার নিকট হিন্দু-মোসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের বিভেদ নাই; আবার তুমিই যে সাক্ষাৎ আশুতোষ, যে তোমাকে ভক্তি করে, তুমি তাহারই যে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া তোমায় অনেক সময় তাহারই সেবা করিতে

হয়। তাই তোমায় যে যেমন ভাবে সাজাইয়া সুখী হয়, তুমি সেই রূপই ধারণ করিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদন কর। ভারতের সেই দিন আর এই দিন দেখিলে, তুমি মহাকাল, তোমার হয় ত সুখ-দুঃখ না হইতে পারে, কিন্তু আমরা দুর্ব্বল-চিত্ত মানব, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এই তুলনা করিয়া সন্তপ্ত হই, তোমায় ঠিক ভক্তি-তুষ্ট করিতে পারি না, তবে অক্ষম হৃদয়ের অসন্তোষের ফল তোমায় কলঙ্কিত করিয়াই যেন কথঞ্চিত তৃপ্ত হইয়া থাকি।

কুণ্ডের চারিপার্শ্বস্থ পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে সম্মুখভূমির উপর তিনটী উচ্চ মসজিদ এবং তাহার মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত বহুসংখ্যক সমাধিস্তূপ এবং সম্মুখে কুণ্ডে নামিবার প্রস্তরময় ভগ্ন ও জীর্ণ সোপানশ্রেণীর শেষ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিমদিকের মসজিদ-প্রাঙ্গণে একটী অত্যুচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান আছে, তাহা দেখিলে দীপস্তম্ভ (চিরাক্‌দান) বা বাতিদান বলিয়া মনে হয়, পল্লীবাসিগণ এখনও তাহার উপরেই তৈলের সামান্য প্রদীপ রাখিয়া কুণ্ড-পার্শ্বস্থিত সেই অসংস্কৃত পথ কিঞ্চিৎ আলোকিত করিয়া রাখে। অষ্ট-স্তম্ভবিশিষ্ট উহাদের মধ্য-মসজিদটী অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, বিশেষ উহার পশ্চাতের চারিটী স্তম্ভ যেরূপ সুন্দর ধরণে গভীরভাবে খোদিত, তাহা দেখিয়া উহা যে বারাণসীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থাপত্যের আদর্শ, বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ এক বাক্যেই সে কথা স্বীকার করেন। সম্মুখের স্তম্ভচারিটীর নিম্ন-দেশ অষ্ট-পল বিশিষ্ট, মধ্যভাগ ষোড়শ-পল বিশিষ্ট এবং ঊর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ গোলাকার। এই আটটী স্তম্ভই বিশালদর্শন, কিন্তু অন্যগুলি

অতি অল্পমাত্রই স্থাপত্যালঙ্কারে পরিশোভিত। পূর্ব্বপার্শ্বের মসজিদেও চারিটী প্রাচীন স্তম্ভ আছে। চারিটীই প্রায় একরূপ চতুষ্কোণ, কিন্তু একটী অতি সামান্য অলঙ্কারযুক্তভাবে খোদিত। এই মসজিদের প্রবেশদ্বারটীও বিশেষ নয়নাকর্ষক। ইহার কারুকার্য্যগুলি প্রস্তরগাত্রে গভীরভাবে খোদিত না হইলেও ইহার সুতীব্র ও নিখুঁত সীমারেখাগুলি প্রকৃত সুশিল্পীর উন্নত শিল্প-নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক। ইহা দেখিয়া প্রাচীন বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য-শিল্প বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু ইহার উপরের অংশে কতকগুলি কার্য্য এমন আছে যাহা দেখিলে আধুনিক অথবা মোসলমানদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যখন মোসলমানগণ সেই প্রাচীন মঠ ও স্তম্ভগুলিকে লইয়া মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন, তখনই এই সকল নূতন কার্য্য নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের মসজিদটী একটী চতুষ্কোণ চৈত্যের অনুরূপ। ইহার গম্বুজটী মোসলমানীয়, কিন্তু স্তম্ভ চারিটী যে প্রাচীন যুগের, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ইহাদের নিম্নভাগ সরল ও চতুষ্কোণ, কিন্তু উপরের অংশ সারনাথের স্তূপের ন্যায় বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট, ইহার পশ্চিমদিকে 'বক্তিসখাম্বা' নামে একটী গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির আছে। গম্বুজটী বোধ হয় মোসলমানদিগের দ্বারা আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু স্তম্ভগুলি যে সেই অতীত যুগের, তাহা দর্শনমাত্রই সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার তিনপার্শ্বে তিনটী বারাণ্ডা আছে। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে ও উত্তর-পশ্চিমদিকে এবং কুণ্ডের পশ্চিম তীরে কয়েকটী মোসলমান ফকিরের সমাধি-স্তম্ভ রহিয়াছে। যাহা

হউক এই সকল স্থান বহুদিন মোসল্‌মানদিগের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে, সেই কারণেই বোধ হয় কোন পুরাতত্ত্ববিদের দ্বারা ভূগর্ভস্থিত অন্যান্য অংশ আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। আমাদের মনে হয়—কাশীর 'সারনাথ-স্তূপের' পর এরূপ প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প-পরিপূর্ণ স্থান কাশীর মধ্যে আর নাই। এখনও যেসকল প্রস্তর-স্তম্ভ ও ছাদ স্তূপীকৃত মৃত্তিকায় সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে ইহা যে বৌদ্ধযুগে একটী শ্রেষ্ঠ সংঘারাম ছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় না। যদিও এই পুণ্যময় প্রাচীন-তীর্থ ও সংঘারামের বহুসংখ্যক প্রস্তরাদি-উপাদান অপসারিত ও বিনষ্ট হইয়াছে, যদিও 'বেনারস-কলেজ' ও 'বরুণাব্রীজ' প্রস্তুতকালে ইহা হইতে যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তথাপি এমন অনেক জিনিস এখনও আছে, যাহাতে কালে প্রাচীন কাশীর অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে।

সারনাথ বা সারঙ্গনাথ :—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মহামুনি 'শাক্যসিংহ' বা 'গৌতমবুদ্ধ' তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মমত এই পুণ্যভূমি কাশীধাম হইতেই প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই পঞ্চবিংশতিশত বৎসর পূর্ব্বে, যখন ভারত বিকৃত-বৈদিক-যজ্ঞ ও তন্ত্র-সাধনার ব্যভিচার-কল্পে সিদ্ধ-সনাতন ধর্ম্মের আবরণে রসনাতৃপ্তি-লালসায় বীভৎস জীব-হিংসা-বৃত্তির চরম-সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনই জগৎ-প্রতিপালক ভগবান বিষ্ণু নিজ নবম-অবতারে 'বুদ্ধরূপে' ভারতে আবির্ভূত হইলেন ও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহামন্ত্রের প্রচার করতঃ জগতে পুনরায় শান্তি ও সাময়িক নূতন ধর্ম্ম

সংস্থাপন করিলেন। সেই নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রথম প্রচার-কার্য্য এই 'সারনাথ' বা 'সারঙ্গনাথের' মন্দির-সমীপবর্ত্তী স্থান হইতেই আরম্ভ হয়। সেই নির্দ্দিষ্ট জনপদস্থিত ভূমিখণ্ড, যথায় ভগবান বুদ্ধ নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতেন, যথায় উপবেশন করিয়া প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের সহিত সুগভীর ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা ও বিচার-সিদ্ধান্ত করিতেন, প্রচলিত ধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়া নিজ অভিনব মতের মণ্ডন ও সমর্থন করিতেন, যে শক্তিশালী স্থানের প্রভাবে সমগ্র জগতের অর্দ্ধাধিক মানব-সমাজ এখনও এই ভারতকে অসঙ্কোচে তাহাদের গুরুপীঠ বলিতে আনন্দানুভব করে,—ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভের অব্যবহিত পরেই সেই সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর তদীয় শিষ্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক তাঁহার একটী অনতিদীর্ঘ স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। অনন্তর প্রসিদ্ধ ভারত-সম্রাট বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচার-কর্ত্তা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা অশোক, সেই নির্ব্বাণ-ধর্ম্মোপদেশক বুদ্ধদেবের পূর্ব্বনির্ম্মিত সেই সংকীর্ণ স্মারক-স্তূপ বিচিত্র ও বিরাট আকারে পুনর্গঠিত করাইয়া দেন। তাহাই এক্ষণে 'সারনাথ-স্তূপ' বা 'ধমেক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র স্তূপ জীর্ণ-দীর্ণ হইয়াও ভারতের কত অতীত ঘটনা, কত জ্ঞান-গৌরব ও প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের কত অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপ, কত শক্তি-সামর্থ্যের যে পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-সমাজ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগী সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই 'ধমেক' দেখিবার জন্য এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাশীধামে সতত্তই আসিয়া থাকেন।
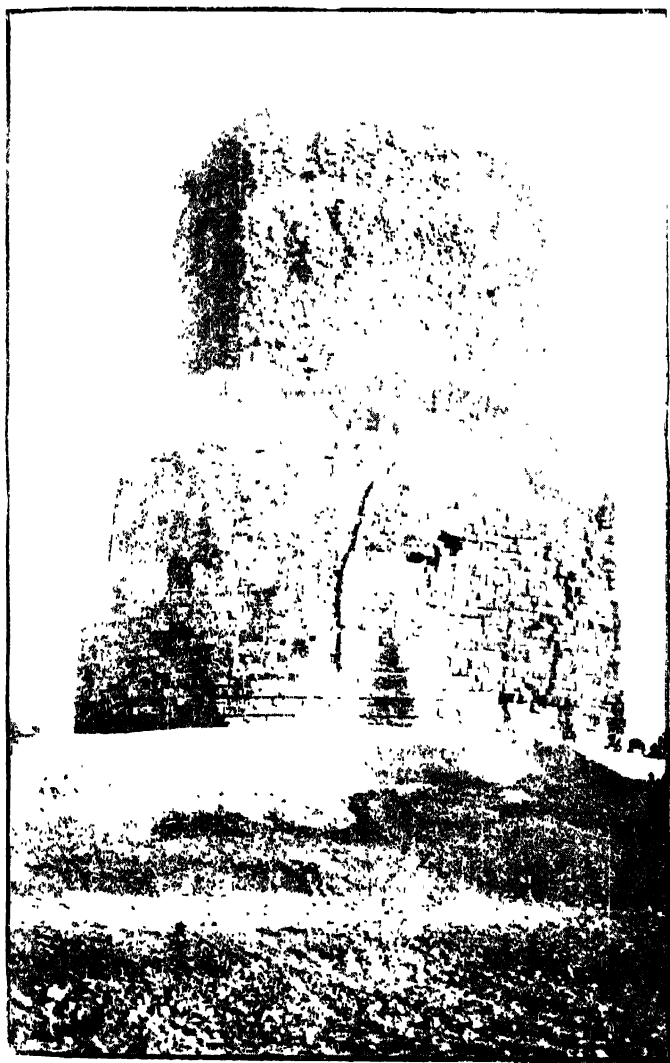
সারনাথের 'ধমেক্' (ধর্ম্মোপদেশক) স্তূপ। (১৩২ পৃষ্ঠা।)

'ধমেক' ইহা এক বিচিত্র শব্দ, সহসা ইহার কোনওরূপ অর্থ বোধ হয় না, তবে ইহা যে কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাচীন শব্দের অপভ্রংশ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেককেই এই বিচিত্র শব্দালোচনায় বিশেষ চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সুপণ্ডিত কানিংহাম প্রভৃতির গভীর আলোচনার ফলে সিদ্ধ হইয়াছে যে, পালা বা পাটলীপুত্রের ভাষায় 'ধর্ম্ম' শব্দ 'ধম্ম' এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে, সুতরাং তখন 'ধর্ম্মোপদেশক' 'ধম্মোপদেশক' এইরূপ ভাবে লিখিত হইত, ক্রমে উহা লোকমুখে সংক্ষিপ্ত হইতে হইতে 'ধম্মোদেশক' পরে 'ধম্মদেয়ক' অবশেষে 'ধমেয়ক' বা 'ধমেক' এইরূপ সঙ্কীর্ণতম শব্দে পরিণত হইয়াছে। 'স্তূপ' একটী সাধারণ শব্দ, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার বিশেষত্ব রক্ষার জন্য প্রধান-স্তূপ, অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মচক্র এইস্থান হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহারই স্মরণার্থে এই 'ধর্ম্মোপদেশক-স্তূপ' নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কাশী-সহরের ঠিক উত্তরদিকে, সহরের বাহিরে, সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে এই সারনাথ-স্তূপ বা ধমেক অবস্থিত। 'ক্যান্টনমেণ্ট-ষ্টেসন' হইতেও ইহা প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। সাধারণ যাত্রীগণ সহর হইতে গাড়ি বা একা করিয়া সারনাথ দেখিতে যান। কেহ বা বেনারস-ক্যান্টনমেণ্ট-ষ্টেসন হইতে বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্ট রেলগাড়িতে চড়িয়া 'সারনাথ-ষ্টেসনে' নামিয়া সারনাথ দেখিয়া আসেন। স্থানটী অধুনা বেশ নির্জ্জন, নিকটেই একটী সমুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ, নানা বৃক্ষ-লতায় তাহা সমাচ্ছাদিত ও তপোবন-সদৃশ অতীব মনোরম, মধ্যাহ্নে সেই বিমল ছায়া-শোভিত স্নিগ্ধ তরুমূল যথার্থই অতি প্রীতিপ্রদ, বড়ই রমণীয়

বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ, সেই তরুরাজিমধ্যে 'সারনাথেশ্বর' শিবমন্দির ও তৎসহ সেই অনতিদীর্ঘ বিশ্রাম-গৃহটী যাত্রীগণের নিতান্তই চিত্ত-বিনোদক। অনেকে সহর হইতে আসিয়া এখানে বন-ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাবণ মাসে প্রতি সোমবারে তাঁহারা প্রাতে রন্ধনাদির সকল উপাদানসহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, মধ্যাহ্নে সারনাথ-দর্শন করিয়া ভোজনান্তে বিশ্রাম করনান্তর সায়াহ্নে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহাতে সেই সময় তথায় বেশ মেলা হয়।

'সারনাথেশ্বর' মহাদেবের মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ইহা কাশীর সাধারণ প্রস্তরগঠিত মন্দিরের অনুরূপ নহে, বরং বঙ্গভূমির সুপ্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্তের প্রসিদ্ধ 'বর্গভীমার' মন্দিরেরই অনুরূপ বলিতে পারা যায়। মন্দিরমধ্যে 'সারনাথ' শিবলিঙ্গ বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই 'সারনাথ' ও বখতিয়ার-খিলিজি-বিধ্বস্ত 'সোমনাথ'-লিঙ্গ একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতগণের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে 'কাশীমাহাত্ম্য'-বর্ণিত 'সঙ্ঘেশ্বর' মহাদেব এই 'সারনাথ-শিবের' নামান্তর। সারনাথের বৌদ্ধ-প্রভাব মন্দীভূত হইলে, হিন্দুগণ এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ-বিহার বা সঙ্ঘারামের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হয় এই শিবলিঙ্গটী 'সঙ্ঘেশ্বর' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই বনাকীর্ণ স্থানটীর অবস্থা দেখিলে ইহা বহু প্রাচীন দেবালয় বলিয়াই বোধ হয়।

এই মন্দিরের পাদমূলে একটী অনতিদীর্ঘ পুষ্করিণী আছে। ইহার জল মন্দ নহে। পুষ্করিণীটী এক্ষণে ক্ষুদ্রাকার হইলেও পূর্ব্বে ঠিক এমনটী ছিল না, তখন ইহা এক প্রকাণ্ড হ্রদে

পরিণত ছিল। সে হ্রদের চিহ্নমাত্রই আছে, বর্ষায় তাহা সামান্য জলপূর্ণ হইলেও অন্যান্য ঋতুতে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তাহার উপর অনেক স্থলে রীতিমত হলকর্ষণদ্বারা চাষ হইয়া থাকে। সেই কারণ পরবর্ত্তী সময়ে হ্রদ-মধ্যস্থিত এই পুষ্করিণীটী খোদিত হইয়াছে। এই হ্রদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য ঋষিগণের নগরী, পল্লী বা তপোভূমিরূপে 'ঋষিপত্তন' অথবা 'ঈশিপত্তন' বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই অতীত যুগে ইহা মৃগদাব'-উপবন বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মৃগদাব সম্বন্ধে াতক' ও 'ললিতবিস্তরাদি' বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক কথা লিখিত আছে। সে সকল বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে। যাহা হউক 'ধমেক' শব্দের ন্যায় 'সারনাথ' শব্দ 'সারঙ্গনাথ' শব্দেরই অপ-ভ্রংশ মাত্র। মৃগদাব-উপবনের অধিপতি সারঙ্গনাথ বা সারনাথ-মহাদেব বহু প্রাচীনকাল হইতেই ঋষিপত্তনের ঋষিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইতেন, পরে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ-শ্রমণ বা সাধুগণ বুদ্ধ-দেবকেই সারঙ্গনাথ বা সারনাথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় দ্বাদশ শত বৎসরেরও পূর্ব্বে যখন সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক-গণ সারনাথ পরিদর্শন করেন, তখন ইহার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, এস্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-স্থানের উপর সম্রাট অশোক-নির্ম্মিত একশত ফিট উচ্চ পূর্ব্বোক্ত সেই ধমেক-স্তূপের যে ভগ্নাবশেষ ছিল, তাহার সম্মুখে ৭০ ফিট উচ্চ একটী সুন্দর প্রস্তর-স্তম্ভ, উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় দুইশত ফিট উচ্চ এক বৌদ্ধ-বিহার, প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপাদানে সুন্দরভাবে নির্ম্মিত ছিল। সে সময়

বিহারে সার্দ্ধসহস্র বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন। বিহারের চারিদিকে শত শত গবাক্ষ ছিল, আবার সেই সকল গবাক্ষ এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তিতে সুশোভিত ছিল। বিহারের মধ্যে তাম্রময় একটী সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারাদির চারিদিক সমুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে স্বচ্ছসলিলা তিনটী প্রকাণ্ড সরোবর ছিল। ইহাই পূর্ব্বে 'সারনাথ-হ্রদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখস্থিত হ্রদের শেষচিহ্ন এখনও জলপূর্ণ আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাই 'সারঙ্গতাল' বা 'নরোকর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'নরোকর' শব্দ বোধ হয় 'সরোবরের' অপভ্রংশ শব্দ হইবে। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন হাজার ফিট এবং প্রস্থে এক হাজার ফিট ছিল। ইহার সহিত সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব্বদিকে আর একটী সরোবর ছিল, আকারে প্রায় সারঙ্গ-তালেরই সমান হইবে, তবে ইহার কিনারাগুলি নিতান্ত অসমান; ইহার নাম 'চন্দোকর', 'চন্দ্র-সরোবর' বা 'চন্দ্রাতাল'। উত্তরদিকে আর একটী জলাশয় ছিল, তাহার নাম 'নয়াতাল' বা 'নব-সরোবর'। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে, প্রস্থে অন্যূন তিনশত ফিট। 'নয়াতাল' এই নাম শুনিলেই পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী জলাশয় অপেক্ষা ইহা যে পরবর্ত্তীকালে খোদিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে জানিতে পারা যায়, এই নয়াতালেই বুদ্ধদেব প্রথম প্রথম স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিতেন।

সারনাথস্থিত বৌদ্ধবিহারে যে সকল ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই উত্তর দিকে যে ক্ষুদ্র পল্লী ছিল, তখন হইতেই তাহা 'বারাহী-গ্রাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ কেহ

বলেন, ইহার নাম 'বজ্র-বারাহী' হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই গ্রামে 'বারাহী-দেবীর' কোন প্রাচীন মন্দির ছিল। সেই পল্লী-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে ইহা বারাহী-গ্রাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি সরকার-পক্ষ হইতে যে সকল প্রস্তরখণ্ড নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নাতিদীর্ঘ 'বারাহী-দেবীর' একটী সুন্দর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা সারনাথ-মিউজিয়ম-গৃহে রক্ষিত আছে। দেবী, সপ্তবরাহের উপর অধিষ্ঠিতা, তিনি ষড়ভুজা, সায়ুধা ও ত্রি-আনন-বিশিষ্টা। আনন-ত্রয়ের মধ্যে সম্মুখেরটী সুন্দর ত্রিনয়না ভগবতীর মুখ এবং দুইপার্শ্বের অন্য দুইটী বরাহীর বদন। অতি সুন্দর প্রতিমা। সম্ভবতঃ ইহাই বারাহী-গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন।

পশ্চিমে 'নয়াতালের' বাঁকের মুখে আর একটী পল্লী ছিল, তাহা 'গুরুণপুর-গাম' বা 'গুরুপুর-গ্রাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোধহয় কোন সময়ে সনাতন বা বৌদ্ধ-গুরুমণ্ডলী তথায় বাস করিতেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে জৈনদিগের প্রসিদ্ধ পার্শ্বনাথ দেবের একটী আধুনিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

যাহাহউক সারনাথের সর্ব্বপ্রধান বিরাট দৃশ্য 'ধমেক', তাহা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে তাহার বর্ণনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আর কিছু বলিতেছি।

সারনাথের এই বিরাট স্তূপ গম্বুজাকারে নির্ম্মিত। ইহার ব্যাস ৯৩ ফিট এবং উচ্চতায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকারাশির উপর ১০০ ফিট হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

কাশীর সাধারণ সমতলভূমি হইতে ১২৮ ফিট উচ্চ। ইহার ভিত্তি বড় বড় ইষ্টক-সাহায্যে ভূমিমধ্য হইতে গ্রথিত। ইহার নিম্নাংশের পরিধি প্রায় ১৯৩ ফিট হইবে। এক্ষণে অন্যান্য বিহার ও ধ্বংসাবশেষ সমূহ ইষ্টক-মৃত্তিকা-দ্বারা প্রায় ২৮ ফিট প্রথিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণকালে কেবল ১০ ফিটমাত্রই ভূমিমধ্যে অবস্থিত ছিল। ভূমিতল হইতে ইহার প্রায় ৪৩ ফিট পর্য্যন্ত কেবল বিন্ধ্যাচলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, এই সকল পাথর আবার পরস্পর লৌহের বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধীকৃত আছে। স্তূপের প্রস্তরগাত্র অতি সুন্দরভাবে বিচিত্র লতা-পাতা ও ভাস্কর্য্যালঙ্কারে খোদিত। সে সকল কারুকার্য্যের জীর্ণ অংশ যাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতই অত্যন্ত রুচি-বিশুদ্ধ, তাহা দেখিয়া এখনও সকলে বিমোহিত হইয়া থাকেন। ইহার উপর অংশ ভিত্তিস্থিত বড় বড় প্রস্তর-খণ্ডের অনুরূপ ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত। কিন্তু ইহার বাহ্যাবরণ ক্রমে জল-বায়ুর প্রভাবে জীর্ণ বা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। কেবল সেই ধ্বংসোন্মুখ ইষ্টকগুলি শীর্ণ নরকঙ্কালসদৃশ বা শবমুণ্ডস্থিত দন্তপংক্তির ন্যায় বাহির হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর কোন-রূপ চূণ-সুরখীর আবরণ বা ঐরূপ কোন মশলাদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অথবা খোদিত কারুকার্য্যযুক্ত স্বতন্ত্র প্রস্তরস্তরে আবৃত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে কেবল ইষ্টক-গুলির গাঁথুনি দেখিয়া অনুমান করা যায়, ইহার উপর নিশ্চয়ই চূণ-সুরখীর আবরণ বা 'পলেস্ত্রা' ছিল। ইহার উপর এখনও ৮ ফিট ব্যাস ও ৪ ফিট উচ্চ একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে

উহার উপর সছত্র বুদ্ধদেবের কোন প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্তূপের নিম্নাংশেও পূর্ব্বে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, উপস্থিত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল স্তূপের চারিদিকে ছয় ইঞ্চি উচ্চ আটটী স্তম্ভোন্নত চূড়ার ন্যায় গ্রথিত আছে, শুনা যায় তাহার মধ্যেও আটটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

সারনাথস্থিত বৌদ্ধস্তূপাবলীর যে সকল ধ্বংসাবশেষ আছে, তন্মধ্যে 'ধমকেই' শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বস্তু, দ্বিতীয় জগৎসিংহ-খোদিত ইষ্টকনির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড স্তূপ, যাহার ধ্বংস-চিহ্ন, ধমেক হইতে প্রায় ৫২০ ফিট পশ্চিমদিকে বৃত্তাকার ইষ্টক-প্রাচীরমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বেনারস-মহারাজ চেৎসিংহের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খোদিত হয়, এবং তাহার ইষ্টক-প্রস্তরগুলি স্থানান্তরিত করিয়া সহরের মধ্যে তাঁহার নিজের নামে 'জগৎগঞ্জের' বাজার নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন তিনি সেই বাজারের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরাদি সংগ্রহ-কল্পে সারনাথস্থিত সেই স্তূপাবলীর সংহার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন তাহার মধ্য হইতে দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে কতকগুলি মানবাস্থি এবং কতিপয় বিকৃত মুক্তাফল, কয়েকখণ্ড স্বর্ণপত্র ও ধনরত্নপূর্ণ স্ফটিক-নির্ম্মিত কৌটা আবদ্ধ ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মেকেঞ্জি সারনাথের ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেঃ কানিংহাম যখন এইস্থানে পুনরায় অনুসন্ধান করেন, সেই সময় একটী বৃদ্ধ, (তাহার নাম শঙ্কর) কানিংহামকে জগৎসিংহ কর্ত্তৃক সেই খোদিত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জেঃ কানিংহাম তাহারই কথানুসারে সেই স্থান পুনরায় খোদিত করিয়া

একটী প্রকাণ্ড গোলাকার পাথরের টাঁকা বা সিন্দুক দেখিতে পান। তাঁহার অনুসন্ধান-ফলে বহু প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তাহা এক্ষণে কলিকাতার 'মিউজিয়মে' রক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মেজর কিটো (Kittoe) সারনাথ ও বর্থরিয়া-কুণ্ডের বহু অংশ অনুসন্ধান করেন। তিনি বেনারসের কুইন্স-কলেজ প্রস্তুতকালে বহু সংখ্যক প্রস্তরখণ্ড এস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য্য প্রস্তরগুলি বহুদিন অবধি কুইন্স-কলেজের প্রাঙ্গনেই পড়িয়া ছিল। পরে কতক লক্ষ্ণৌএর 'মিউজিয়মে' ও কতক পুনরায় সারনাথেই নূতন মিউজিয়ম-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ এফ, ও, অরটেল (F. O. Oertel) এবং তদনন্তর মিঃ জে, এচ্, মারস্যাল (J. H. Marshall) প্রভৃতি কতিপয় য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ বহু অনুসন্ধান করতঃ সারনাথের ভূগর্ভ হইতে অসংখ্য ভাস্করমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ উদ্ধার করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ধমেক ও বিহার ব্যতীত সারনাথের নবোদ্ধৃত অশোক-স্তম্ভটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু। কয়েক বৎসর গত হইল, ইহা গভীর মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন সুন্দর বিরাট অশোক-স্তম্ভ আমি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখিনাই। স্তম্ভটী সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০ ফিট দীর্ঘ। স্তম্ভচূড়ায় বা স্তম্ভের উপরে চারিটী বিশাল সিংহের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে খোদিত, তাহার নিম্নে একটী গোলাকার বেদি, উহারই উপরে সিংহ-চতুষ্টয় অবস্থিত। বেদির অঙ্গে ক্ষুদ্রাকারের গজ, সিংহ, বৃষ ও অশ্ব এই চারিটী পশুমূর্ত্তি যথাক্রমে এক একখানি চক্রের

সারনাথ—অশোক-স্তম্ভ। (১৮০ক পৃষ্ঠা)
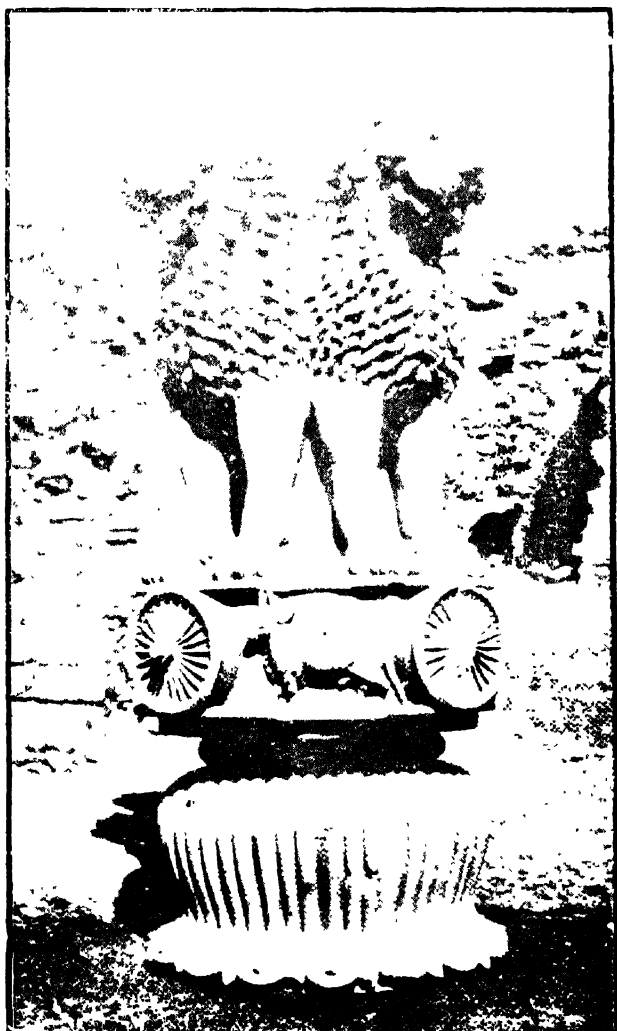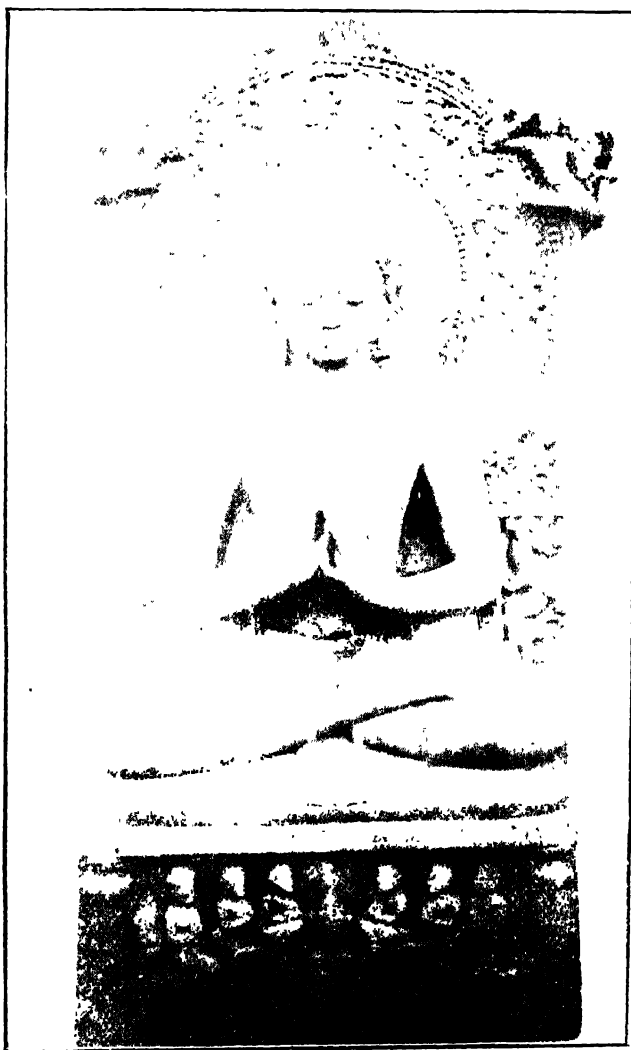
রনাথ-মিউজিয়ম—শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব। (১৪১ পৃষ্ঠা)
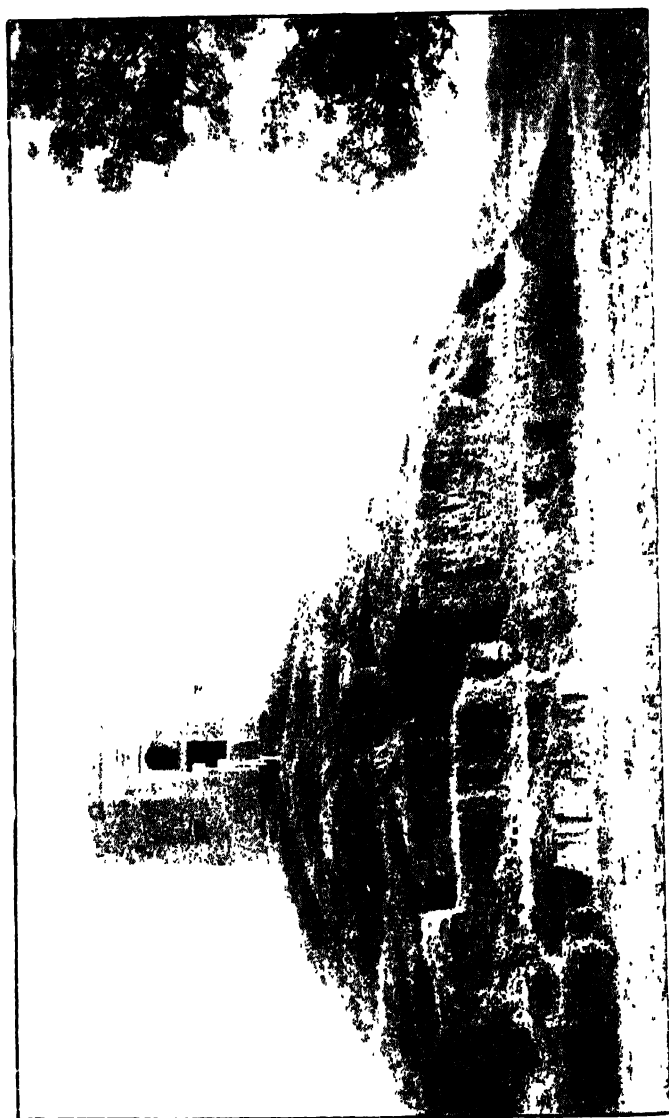
ব্যবধানে খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটী কুম্ভালঙ্কার স্তম্ভের উপর নিম্নমুখে খোদিত হইয়াছে। যে প্রস্তরে স্তম্ভ খোদিত হইয়াছে, তাহাও এক অপূর্ব্ব জিনিস, তাহা যেমন মসৃণ, তেমনি দর্পণের ন্যায় চাক্‌চিক্যশালী।

ধমেকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সারনাথের পথের বামপার্শ্বে 'চৌখণ্ডী' নামে একটী অষ্টপল আকারের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমি হইতে প্রায় ৭৪ ফুট উপরে ইহা নির্ম্মিত ইহার উপর দিল্লীশ্বর আকবর কর্ত্তৃক একটী স্মারক-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও উহা বিদ্যমান আছে। একটী দ্বারের উপরে আরবী অক্ষরে লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"হুমায়ুন বাদসাহ এখানে সিংহাসন পাতিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর এই স্মৃতিরক্ষাকল্পে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন।" হুমায়ুন্ সেরসার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে বেহারে যাইবার পথে এখানে আসিয়াছিলেন।

সারনাথস্থিত ভূগর্ভ হইতে যে সকল বস্তু উদ্ধৃত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে 'সারনাথ-মিউজিয়মে' রক্ষিত হইতেছে। সেই সকল ভাস্কর-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী দেখিতে যেমন বিরাট, তেমনই সুন্দর। অনেক স্থলেই ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটীর মস্তকে একটী বৃহৎ ছত্র ছিল। সেই প্রস্তর-নির্ম্মিত ছত্রটীও এক্ষণে তাহারই পার্শ্বে রক্ষিত আছে। অনেকে অনুমান করেন, ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্ব সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি উক্ত মিউজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে

রামসীতা, শিবদুর্গা, বারাহী প্রভৃতি মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবের তাণ্ডব-নৃত্যের একটী অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি আছে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এ সকল মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাহা হউক সারনাথের ভগ্নস্তূপোদ্ধৃত মূর্ত্তিসকল দেখিয়া বোধ হয়, মৃগদাব এক সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অতি প্রশস্ত লীলা-নিকেতন থাকিলেও, এস্থলে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিশেষ হিংসা দ্বেষ ছিল না। উভয়ে যেন মিলিয়া মিশিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। অধুনা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বলিলে যেমন অনেকের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই বরং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম! বাস্তবিক চীন, জাপান, সিংহল ও ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তীয় যে সকল বৌদ্ধ বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংস্কার ও হিন্দুদিগের সহিত তাঁহাদের আচরণ দেখিলে খ্রীষ্ট বা মোসলেম ধর্ম্মের ন্যায় সম্পর্কশূন্য বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব-সময়ে ঠিক তেমনটী ছিল না। এক্ষণে শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে যে ভাব অথবা আর্য্য-সমাজ বা আদি-ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে ভাব, পূর্ব্বে সনাতন-হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে সেইরূপ ভাবই প্রচলিত ছিল। হয় ত এক পরিবারের মধ্যেই এক ভ্রাতা ভগবান বুদ্ধের উপাসক, অন্য ভ্রাতা বৈদিক-ক্রিয়াভিলাষী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের জাতীয় বা সামাজিক ধর্ম্ম নষ্ট হইত না। বোধ হয় এই সকল কারণেই ভগবান 'বুদ্ধ' হিন্দুর নবম অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। বারাণসী ও সারনাথ-উপবনের পুরাকীর্ত্তি আলোচনায় এক্ষণে তাহাই স্পষ্ট জানিতে পারা যাইতেছে। বিশেষ একই স্থান হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধের

এতাধিক দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে দেখিলে, কাহারও আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। 'সারনাথ-মিউজিয়মে' সে সকল অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা দেখিলে প্রভূত আনন্দ অনুভব করিবেন। ছোট বড় সকল জিনিসেরই পরিচয়-সূচক নামাদি অতি যত্নে তাহাদের পার্শ্বে ও গাত্রে লিখিত হইয়াছে।

সারনাথের এই সমুদায় বৌদ্ধ-প্রভাব ও কীর্ত্তি-কলাপ পরবর্ত্তী সময়ে যবন-হস্তেই ক্রমে বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং যে সকল বৌদ্ধ-শ্রমণ ও সেবক এইস্থানে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তাঁহারাও সেই সময় মোসলমান-শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় ভারতের বৌদ্ধকুল একেবারেই প্রায় নির্মূল হইয়াছিল। 'মহাবোধি সোসাইটীর' বর্ত্তমান সম্পাদক অঙ্গরিকা ধর্ম্মপাল মহাশয় জানাইয়াছেন—"দুইহাজার পাঁচশত তের বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৮৯ অব্দে ভগবান বুদ্ধদেব পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে এইস্থানে তাঁহার প্রথম বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মোসলমানগণকর্ত্তৃক এইস্থান অবরুদ্ধ হয় এবং বহু ভিক্ষু তাহাতে নিহত হইয়াছিল। 'মহাবোধি-সোসাইটি' এইস্থানে এক বিহার নির্ম্মাণ করাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাহাতে একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ পড়িবে বৌদ্ধ-সাধারণ যথাসাধ্য দান করিতে যেন কুণ্ঠিত না হন।"

কাশীর পশ্চিম ও দক্ষিণ যাত্রা ঃ—

কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির হইতে উত্তর-প্রান্ত পর্য্যন্ত কাশীর প্রায় সকল মঠ, মন্দির, মসজিদ ও তীর্থাদির বিষয় সংক্ষেপে

এক প্রকার বলা হইল, এক্ষণে বিশ্বেশ্বরের পশ্চিম-দক্ষিণ ও অন্যান্য দিকের মন্দিরাদির বিষয় বলিব।

সাক্ষিবিনায়ক ঃ—

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে 'ঢুণ্ঢিরাজের' সম্মুখ হইয়া 'সাক্ষি-বিনায়কের' গলিতে দক্ষিণ পার্শ্বে এই সাক্ষি-বিনায়ক-গণপতির মন্দির বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। সন ১৮২৭ সম্বতে বা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরের কিছু অধিক হইল একজন মহারাষ্ট্রীয় মহাত্মা কর্ত্তৃক এই মন্দিরটী পুনরায় সংস্কৃত বা নূতন করিয়াই বিনির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চ-ক্রোশী ও অন্যান্য যাত্রীগণ যাত্রার পর এই সাক্ষিবিনায়কের পূজা করিয়া থাকেন। অন্তিমকালে ইনিই বিশ্বনাথ ও কাল-ভৈরবের নিকট কাশীবাসীর সকল পাপ পুণ্যের পরিচয় বা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন।

গোদৌলিয়া ঃ—

'সাক্ষিবিনায়ক' হইতে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইয়া 'দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে' বড় রাস্তায় আসিলে পশ্চিমদিকে কিছুদূর যাইলেই 'গোদৌলিয়া' বা গোদাওলিয়ার মোড় বা চৌমহানী পাওয়া যায়। গোদাওলিয়া কাশীর একটী প্রাচীন তীর্থ, কাল বশে সে তীর্থের লোপ হইয়াছে, কিন্তু নামটী লুপ্ত হয় নাই, কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে মাত্র। এতদ্বিষয়ে সামান্য জানিবার বিষয় আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোদৌলিয়া ইহা বিকৃত শব্দ। প্রকৃত পক্ষে ইহা "গোদাবরী" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বে এই স্থানে গোদা-বরী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। সেই গোদাবরী শব্দ ক্রমে

গোদাবরীয়া', 'গোদাওরীয়া' বা 'গোদাওলিয়া' এক্ষণে 'গোদৌলিয়ায়' পরিণত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে এই গোদৌলিয়া বা গোদাবরী একটী নাতিদীর্ঘ নদী বা নালা ছিল। দশাশ্বমেধের রোড বলিয়া এক্ষণে যে প্রসিদ্ধ পথ দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে এই পথটীর পরিবর্ত্তে এই স্থান দিয়াই সেই প্রাচীন গোদাবরী নদী প্রবাহিতা ছিল। কালে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইলে, (অধুনা অসী নদীর যেরূপ অবস্থা সেইরূপ হইয়া যাইলে,) বহুদিন নালারূপেই উহা পরিণত ছিল। বর্ষাকালে গঙ্গার জল বাড়িলে তাহার কিয়দংশ জলে পূর্ণ হইত, বর্ষাকালে চারিদিকের ধোয়াট জল এই নালাপথেই তখন গঙ্গায় যাইয়া পড়িত। কাশীর আধুনিক বড় বড় পথগুলি তখন এতাধিক বিস্তৃত ছিল না। সাক্ষিবিনায়কের গলি, কচুরির গলি, ঠাটেরিবাজার প্রভৃতিই কাশীর প্রধান পথ ছিল। সুতরাং বাঙ্গালীটোলা হইতে বিশ্বনাথ যাইতে হইলে সেই গোদাবরীর উপরিস্থিত সেতু পার হইয়া যাইতে হইত। ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরাতন সেতুর চিহ্ন এখনও ভূগর্ভে নিহিত আছে। দশাশ্বমেধ বাজারের সম্মুখে কালীতলাতেও একটী সেতু ছিল, সেই কারণ এখনও প্রাচীনেরা উক্ত কালী দেবীকে "পোলের কালী" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর একটী সেতু ছিল সাক্ষিবিনায়কের গলি হইতে ভূতেশ্বরের গলির মুখে। 'মিস্‌রির-পুখরা' বা মিশ্রের পুষ্করিণী হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত পথ সেই নদী-ভরাটী জমী। শুনিতে পাওয়া যায় :—মিঃ গবিন্ (Mr. Gobbin) নামে এক সিবিলিয়ান প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি কাশীর অতি দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাদিগকে শাসন করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন। এক সময় তিনি কোন

মামলার তদারকে আসিয়া সহসা সেই গোদাবরীর নালায় পড়িয়া যান। তাহার পর তিনি স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকের পরামর্শে ও সহায়তায় এই শুষ্ক নালা ক্রমে ভরাট করাইয়া দেন। এই নদী বা বর্ত্তমান দশাশ্বমেধ-রোডের দুই পার্শ্বে যে সকল বাড়ী আছে, পূর্ব্বে তাহার সদরদ্বার গুলি গলির দিকেই ছিল, পরে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে কিছু কিছু ভরাটী-জমীর পাট্টা লইয়া সকলেই এই রাস্তার উপর নূতন সদর দরজা বসাইয়াছেন। এই রাস্তাটীর নদী-সুলভ বক্রতা ও ক্রম-বিস্তার দেখিলে এখনও তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। দশাশ্বমেধের প্রধান বাজারটী গোদাবরী নদীর গঙ্গাসঙ্গমের প্রায় মুখের উপরেই এক্ষণে অবস্থিত। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ উত্তরাখণ্ডের নদী-গুলির গতি ও মিলন স্থান দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রায় দুইটী নদী, বিশেষ গঙ্গার সহিত কোন প্রসিদ্ধ নদীর মিলন স্থানকেই প্রয়াগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বোধ হয় সেই নিয়মেই গঙ্গা-গোদাবরীর এই মিলন-স্থানকেও প্রয়াগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের মধ্যে প্রসিদ্ধ পুঁটীয়ারাণীর অধিকৃত অংশকে এখনও লোকে 'প্রয়াগ-ঘাট' বলে। দশাশ্বমেধে স্নান করিবার সঙ্কল্প-সময়ে ঘাটের ব্রাহ্মণেরা সেই প্রাচীন 'প্রয়াগতীর্থেরই' উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্‌সম্বন্ধে "ঘাট বর্ণনা" অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক গোদাবরীতীর্থটী প্রাচীনকালে গোদোলিয়ায় মোড়ের নিকটেই ছিল। সে স্থানে এক্ষণে 'মাড়োবারী-হিন্দু-হাঁসপাতাল' বা 'শ্রীরাম-লক্ষ্মীনারায়ণ-হাঁসপাতাল' হইয়াছে, সেই স্থানেই বহুদিন ধরিয়া একটী কুণ্ড বিদ্যমান ছিল। তথায় গোদাবরী তীর্থের পূজা হইত। বেনারস-মিউনিসিপ্যা-

মিটী তথায় কিছু দিন ধরিয়া "ষ্টোর ও ওয়ার্কসপ" রাখিয়াছিলেন পরে সেই জমী হস্তান্তর করিয়া দেন। জনৈক হিন্দু মাড়োয়ারী মহাজন তথায় উক্ত হাসপাতাল করিয়া দশের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইলেও এরূপ একটী প্রাচীন 'তীর্থের' লোপ করিয়া দেওয়ায় ধার্ম্মিকজগতের বিশেষ ক্ষতিবিধান করিয়াছেন।

গৌতমেশ্বর ঃ—

উক্ত গোদাবরী-তীর্থের তীরেই প্রসিদ্ধ 'গৌতমেশ্বর' মহাদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ত্তমান কাশী-নরেশের মাতা ভূতপূর্ব্ব মহারাণী মাতার প্রতিষ্ঠিত গোদৌলিয়ার কালী-মন্দিরের পার্শ্বেই সেই গৌতমেশ্বর শিবলিঙ্গটী সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। উহা মহর্ষি গৌতমের প্রতিষ্ঠিত অতি প্রাচীন লিঙ্গ। অনেকেই এখনও তাহা দর্শন করিতে যান।

মহারাণীর মন্দির ঃ—

পূর্ব্ববর্ণিত গোধূলিয়ার চৌমোহানীর সন্নিকটেই বেনারস-মহারাণীর নব-প্রতিষ্ঠিত সেই 'কালী-মন্দির'। মন্দিরটী অতি সুন্দর, ইহার গোপুর বা ফটকটীরও প্রস্তর-খোদিত কারুকার্য্য অত্যন্ত মনোরম। আধুনিক এ দেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্করশিল্পের ইহা একটী সুন্দর নিদর্শন। বাস্তবিক এমন কারুকার্য্য অধুনা প্রায় দেখা যায় না, তাই কিয়ৎক্ষণ তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে! আহা! ভারত, চিরকালই শিল্প-সৌন্দর্য্য লইয়া পাগল! তাহার অস্থি-মজ্জায় শিল্পের বিশ্ব-বিমোহিনী মাধুরী পূর্ণ হইয়া থাকিলেও, কেবল এক দুঃসহ জঠরের আশঙ্কাতেই শিল্পের সেই আজন্ম-সম্বন্ধটুকু যেন সে ভুলিতে বসিয়াছে। প্রকৃত শিল্প বা

'আর্টের' আদর এখন নাই, এখন 'ইউটিলিটী' বা কার্য্য-পরিচালন-সমর্থ বিদ্যারই আদর অধিক। অর্থাৎ কোনরূপে জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া কায-ক্লেশে মাথা গুঁজিয়া দিন কাটাইতে পারিলেই হইল! এখন ত আর আমাদের নিজের নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই! যাঁহাদের আদর্শে আজ আমরা এত অনুপ্রাণিত, তাঁহাদেরই কার্য্যের ধারা যে এইরূপ! তাঁহাদের কোনকার্য্যেরই যে প্রকৃত বিকাশ বা নিজস্ব শিল্প প্রাচুর্য্য আদৌ নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। এখন ভারতের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরাও অট্টালিকার গাত্রে সুরখী-বালুকা-চূণ অথবা অধিকতর ব্যয়-সাপেক্ষ সুন্দর পঙ্খের কার্য্য না করাইয়া, সরকারী সাধারণ অট্টালিকা ও 'পায়খানার' অনুকরণে অল্প ব্যয়ে টিপকারা বা 'পয়েন্টিং' করাইয়া তাহাতেই গর্ব্ব অনুভব করেন। অবশ্য সরকারী খাস-অট্টালিকা বা প্রাসাদে অর্থাৎ গবর্ণর-জেনারল বা গবর্ণরের পুরাতন বাটীতে সাধারণতঃ পয়েন্টিং-কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক ভারতের এ হেন দুর্দ্দিনে সহসা এমন শিল্প-সোহাগ দেখিলে কাহার হৃদয় না আনন্দানুভব করে! আমরা প্রত্যেক কাশী-যাত্রীকেই গোদোলিয়ায় যাইতে পথের ধারে এই সুন্দর মন্দির-দ্বারটী দেখিতে অনুরোধ করি।

যোগাশ্রম ঃ—

উক্ত মন্দিরের অনতিদূরে 'খোদাইচৌকীর' থানা। সেই থানার অতি নিকটেই পরিব্রাজক স্বামী শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত 'যোগাশ্রম'। এই স্থানটী বিশ্বনাথের অন্তর্গৃহেরই অন্তর্গত। এখানে পশ্চিমোত্তর ও বঙ্গদেশীয় সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সাধকগণ মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন।

যোগাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর মূর্ত্তি অতি মনোরম। এরূপ প্রতিমা কাশীতে আর নাই। যাঁহারা কাশীতে তীর্থ দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। "সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্মবুদ্ধি বৃদ্ধি হউক" এই সাধু-সঙ্কল্পে পরিব্রাজক মহাশয় এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'যোগাশ্রমকে' ভাবতে জ্ঞান ও ভক্তি বিকাশেব আদর্শ কবাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রণীত "গীতা" ও "বক্তৃতাদি" সদ্‌গ্রন্থসমূহের বিক্রয়লব্ধ আয় হইতেই প্রধানতঃ এই আশ্রমেব ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা, শ্রীগুরু-পূর্ণিমা (চাতুর্ম্মাস্যারম্ভ), ঝুলন-দ্বাদশী (পরিব্রাজকের জন্মোৎসব), শারদীয়া মহাষ্টমী (আশ্রমের জন্মোৎসব), শিবরাত্রি, অশোকাষ্টমী (অন্নপূর্ণা পূজা) প্রভৃতিতে বিশেষ বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। পরিব্রাজকমহাশয়েব নির্দ্দিষ্ট 'ট্রষ্টীব' ব্যবস্থানুসারে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করেন। আশ্রম হইতে পরিব্রাজকের উপদেশপূর্ণ বিবিধ পুস্তক "কুমার-পরিব্রাজক-সিরিজ" বিনামূল্যে বিতরিত হয়। স্বামী শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ মহাশয় উক্ত পরিব্রাজক মহাশয়েরই সহোদর, ইনি উচ্চ ইংরাজী ও সংস্কৃত-ভাষায় শিক্ষিত সন্ন্যাসী, মিতভাষী, সচ্চরিত্র ও ত্যাগী মহাত্মা। তিনি মঙ্গলমঠে অবস্থান করেন, নিত্য প্রাতঃকালে আসিয়া যোগাশ্রমের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। যাহা হউক কাশীর এই যোগাশ্রম বঙ্গবাসীর পুণ্যকীর্ত্তি। যাহাতে ইহা বজায় থাকে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। পরিব্রাজক-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত একটী বেদ-বিদ্যালয় ছিল। তাহার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দেহ-

ত্যাগের পরই সব বন্ধ হইয়া যায়। উপস্থিত সেই অসম্পূর্ণ গৃহাদি বিক্রিত ও হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, মহা-মণ্ডলের শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ সেই পুণ্যকীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান হইয়াছেন।

গোদৌলিয়ার গির্জ্জা ঃ—

গোদৌলিয়া-চৌমোহানা হইতে ঠিক পশ্চিমে অনতিদূরে 'চার্চ্চমিসনারী-সোসাইটির' এক প্রকাণ্ড গির্জ্জাগৃহ আছে। ইহা 'গোদৌলিয়াকা গির্জ্জাঘর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে এখন খৃষ্টান ও অ-খৃষ্টান সকলকেই খৃষ্ট-ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। দেশীয় খৃষ্টানদিগের জন্যই এই গির্জ্জা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূর্য্যকুণ্ড ঃ—

যোগাশ্রম হইতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমদিকে 'আরাঙ্গাবাদ' বা 'নারাঙ্গাবাদের' পথে যাইলে 'সূর্য্যকুণ্ড' দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘমাসের শুক্লসপ্তমীতে এই সূর্য্যকুণ্ডে একটী মেলা হইয়া থাকে। এই দিবস স্নানান্তে সূর্য্যদেবের মন্দিরে পূজা করিলে যাবতীয় উৎকট রোগের শান্তি হয়। পুষ্করিণীটীর অবস্থা তত ভাল নহে —ইহাতে জলও অতি সামান্য আছে। জাম্ববতী-নন্দন 'সাম্ব' কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, এই স্থানে আদিত্য-ভগবানের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, কাশীখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে। সেই কারণ কাশীখণ্ডে ইহা 'সাম্বকুণ্ড' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আরঙ্গাবাদ-সরাইঃ—

সূর্য্যকুণ্ডের অনতিদূরে আরঙ্গাবাদ সরাই অবস্থিত। সাধারণ লোক ইহাকে 'নারঙ্গাবাদ কা সরাই' বলিয়া থাকে। বাদসাহ্ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই সরাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বারাণসীর মধ্যে এইরূপ আরও দুইটী সরাই আছে, তাহাদের একটীর নাম 'কাঁচ্চি-সরাই,' অপরটী 'হড়হা-সরাই'। মোসলমানযুগে প্রধান প্রধান সহরে এবং রাজপথের ধারে এইরূপ সরকারী সরাই প্রতিষ্ঠিত হইত। হিন্দুদিগের যেমন ধর্ম্মশালা অথবা ইংরাজ আমলে অনেক স্থলে যেমন, ডাকবাঙ্গালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাও সেই ধরণের। এই সরাইগুলি এক একটী 'ভাটিয়ারিণের' জিম্মায় রক্ষিত হইত। এখনও সেই সকল ভাটিয়ারিণের বংশধরেরা তাহা পৈতৃক-সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা ও অধিকার করিয়া আছে। উক্ত আরঙ্গাবাদ-সরাইয়ে অনেক লোকের থাকিবার স্থান আছে; অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাতে অনেক গৃহ আছে। হিন্দু বা মোসলমান যে কেহ তথায় যাইয়া থাকিতে পারেন। তবে প্রত্যেক গৃহের জন্য ভাটিয়ারিণেরা নিত্য এক পয়সা করিয়া ভাড়া আদায় করে। এ নিয়ম সেই বাদসাহি আমল হইতেই প্রচলিত আছে। এই ভাড়ার পয়সা অবশ্য সরকারে কখন জমা হয় না, ইহা সরাই পরিষ্কার রাখিবার জন্য ভাটিয়ারিণের বেতন-স্বরূপ তাহাদেরই প্রাপ্য। এতদ্ব্যতীত যাত্রীর নিকট হইতে তাহারা আরও কিছু পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলে। ভাটিয়ারিণগণ জাতিতে মোসলমান, সুতরাং আবশ্যক হইলে মোসলমান যাত্রীগণের আহার্য্য-সামগ্রীও তাহারা প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহাতেও

তাহাদের কিছু লাভ হয়। হিন্দু-যাত্রী আসিলে, তাহারা হিন্দু 'কাহার'-জাতীয় ভৃত্যের দ্বারা সমস্ত সরবরাহ করাইয়া দেয়। পূর্ব্বে সমস্ত সরাইটী একজন ভাটিয়ারিণেরই অধীনে ছিল, ক্রমে তাহাদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে কাহারও দুইখানি ঘর, কাহারও চারিখানি ঘর, কাহারও বা দশখানি ঘর এইরূপ ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা পৈতৃক-সম্পত্তির মত তাহারই উপসত্ব গ্রহণ করিয়া সংসার-নির্ব্বাহ করে ও সেই সকল গৃহের আবশ্যক মত সংস্কার করিয়াও রাখে।

পিতৃকুণ্ড ও মাতৃকুণ্ডঃ—

সূর্য্যকুণ্ড অথবা আরঙ্গবাদ-সরাইয়েব কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিম-দিকে 'পিতৃকুণ্ড-পুষ্করিণী' অবস্থিত। ইহার দুইদিকে পাথরের বাঁধা ঘাট আছে, ইহা প্রচুর জলে পরিপূর্ণ। এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে হয়। পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে ঘাটের উপর শিবলিঙ্গসহ তিনটী শিবমন্দিব প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই কুণ্ডের অব্যবহিত পশ্চিম পার্শ্বে 'মাতৃকুণ্ড' নামে আর একটী পুষ্করিণী আছে। এই তীর্থে মাতৃপিণ্ড প্রদত্ত হইত, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুণ্ডে নামিবার একমাত্র ভগ্ন প্রস্তর-সোপান ব্যতীত তাহার আর কোন চিহ্নই নাই। এক্ষণে কেবল মাতৃকুণ্ড বা 'মাতাকুণ্ড' বলিয়া এই মহল্লাটীর মাত্র নামই বর্ত্তমান আছে।

পিশাচমোচন তীর্থ ঃ—

সূর্য্যকুণ্ড হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে আরও কিছু দূব অগ্রসর হইলে, 'পিশাচমোচন তীর্থে' উপস্থিত হওয়া যায়। ইহারই পূর্ব্বদিকে 'হাতোয়ার মহারাণীর' প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা এবং

'মহাশ্মশান-সিণ্ডিকেট' অবস্থিত। পূর্ব্বে পিতৃ ও মাতৃকুণ্ডেই শ্রাদ্ধাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, অধুনা সে স্থানে তাহা কমিয়া গিয়াছে—তৎপরিবর্ত্তে পিশাচমোচন-তীর্থেই আজ-কাল সকল যাত্রীই সমস্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই প্রাচীন তীর্থটী সম্বন্ধে কাশীমাহাত্ম্য ও কুর্ম্মপুরানাদি গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে এক পিশাচ কাহারও কোন বাধা আপত্তি না মানিয়া কাশীর ক্ষেত্র-মধ্যে প্রবেশ করে—তাহাতে 'কাশী-কোতোয়াল' কালভৈরব, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্থ করেন ও তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের সমীপে সেই মুণ্ড সহ উপস্থিত হন। দুরন্ত পিশাচ দেহবিচ্ছিন্ন হইলেও বাক্-শক্তি-বিহীন হয় নাই। সে তখন বিশ্বেশ্বরের সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করে যে, "দেব! আমার এ অবস্থায় আর কোনও অভিলাষ নাই, দীনের কেবল এই নিবেদন, কাশী হইতে আর আমাকে বিতাড়িত করিবেন না।" আশুতোষ কৃপা করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অনন্তর সে নানা স্তব স্তুতি করিয়া পুনরায় বলে, "ঠাকুর, যখন এ দাসের প্রতি এতই কৃপা করিলেন, তবে অনুমতি করুন—গয়াযাত্রীগণ কাশী হইতে যাইবার সময়—যেন আমায় দর্শন করিয়া যায়।" বিশ্বনাথ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। তদনুসারে ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীগণ এখনও পিশাচমোচন-তীর্থ দর্শন করিয়া গয়াযাত্রা করেন। ভূতভাবন কালভৈরব সেই পিশাচ-মুণ্ড এই কুণ্ডমধ্যেই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইকারণ ইহা পিশাচমোচন-তীর্থ বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে।

তীর্থ-কুণ্ডটী আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, বোধ হয় অধুনা কাশীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুণ্ড হইবে। জলও ইহাতে যথেষ্ট আছে। ইহার ঘাটটী প্রথমে ভক্তপ্রবরা মিরাবাই প্রস্তরদ্বারা বাঁধাইয়া দেন, অবশিষ্টাংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় তিনশত বৎযর পূর্ব্বে কুণ্ডের দক্ষিনাংশ রাজা শিবশঙ্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং উত্তরাংশ প্রায় শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে রাজা মুরলিধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঘাটগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অবস্থা নিতান্তই খারাপ। এই অংশের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল পূর্ব্বদিকের ঘাটটী অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে, এবং এই পূর্ব্ব দিকেই কপালমোচন-তীর্থের মন্দিরগুলি বিনির্ম্মিত। এই স্থানে সেই পিশাচের এক প্রকাণ্ড মুণ্ডমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রীগণ এই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

জানা গিয়াছে, পিশাচমোচন-তীর্থের সংস্কার-কল্পে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ ইহার বিশেষ উদ্যোগী, শুনিতে পাওয়া যায়, কিছু কিছু সংস্কার-কার্য্য আরম্ভও হইয়াছে।

এখানে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ-শুক্ল-চতুর্দ্দশী হইতে প্রতি চতুর্দ্দশী তিথিতে পর পর পাঁচটী "লোটাভাণ্টার" মেলা হয়। তন্মধ্যে প্রথম মেলাটীই সর্ব্বপ্রধান। এই সময় সহস্র সহস্র ব্যক্তি মেলায় উপস্থিত হইয়া পিশাচমূর্ত্তি দর্শন করে। মেলা উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড বাজারও বসিয়া থাকে, তাহাতে অতি বৃহৎ আকারের মুলা ও স্থূল ইক্ষুর একরূপ আমদানী হইয়া থাকে।

যে, তাহাকে মূলা ও ইক্ষুর প্রদর্শণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ মূলা ও ইক্ষু আনিয়া এই দিবস বিক্রয় করে। মেলা-দর্শনার্থী সকলেই কিছু না কিছু তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বোধ হয় পূর্ব্বে খুব বড বড় বেগুণও এই মেলায় বিক্রয় হইত। হয়ত সেই কারণেই লোটা বা বড় ঘটীর মত ভাণ্টা অর্থাৎ বেগুণের ক্রয় বিক্রয় দেখিয়া সাধারণে এই মেলাকে 'লোটাভাণ্টার' মেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবে।

*

লক্ষ্মীকুণ্ড :—

পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যকুণ্ড হইতে সামান্য দক্ষিণ পশ্চিমদিকে, অথবা পূর্ব্বোক্ত গোদৌলিযা হইতে ঠিক পশ্চিমদিকে 'লক্সা' যাইবার পথের উত্তরদিকে 'লক্ষ্মীকুণ্ড' নামে এই প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ আছে। কুণ্ডটীর যেমন পরিসর তেমনি তাহার চারিধার পাথরদিয়া সুন্দর ভাবে বাঁধান। পরিষ্কার পুষ্করিণী—অগাধ জলে পরিপূর্ণ, কিন্তু উহারও জল প্রায় এদেশের সাধারণ পুষ্করিণীর ন্যায়ই দুর্দ্দশাপন্ন—বাঙ্গলার সেই স্বচ্ছসলিলা সরোবরের সহিত তুলনাই হয় না। এরূপ হইবার কারণ—বোধহয় কুণ্ডগুলি বহু প্রাচীন, ধর্ম্মপ্রাণ ধনীদিগের এ সকল সংস্কার করিবার প্রবৃত্তি নাই, কেবল নূতন মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। অথচ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মেলা উপলক্ষে এই কুণ্ডে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহাতেও কুণ্ড-সলিল কলুষিত হইয়া থাকে, তাহার উপর বাঙ্গলার ন্যায় এই সকল সরোবর বর্ষে বর্ষে বর্ষাসলিলে ভাসিয়া যাইবার উপায় নাই, তাহাহইলেও পুষ্করিণী-জল নির্ম্মল হইতে পারিত। একেত এই দেশ বাঙ্গলা অপেক্ষা শত

শত ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপিত, তাহাতে আবার পর্জ্জন্যদেবের কৃপাও তেমন নাই, সুতরাং পবিত্র তীর্থ-সলিল নব্য-যুগে অপবিত্র বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। সে যাহাহউক এই কুণ্ড বর্ষার জলে পূর্ণ করিবার জন্য লক্সা হইতে ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত একটী সুদীর্ঘ পাকা নল নির্ম্মিত আছে, শুনা যায় বিজনা-গ্রামের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বহু অর্থব্যয় করিয়া এই নল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহাতে কেবল বর্ষার জলই যাইবার ব্যবস্থ ছিল, কিন্তু আজকাল পথিপার্শ্বস্থিত অশিক্ষিত স্বার্থান্ধ ও কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিরহিত অধিকাংশ গৃহস্থ গোপনে স্ব স্ব গৃহের মলমূত্রের নলও ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে কুণ্ড কলুষিত হইয়াছে। কিন্তু এত অত্যাচারে কাশীর অন্যান্য পুষ্করিণী অপেক্ষা লক্ষ্মীকুণ্ডের জল উত্তমই আছে বলিতে হইবে। তাহার একমাত্র কারণ ইহার বিশালত্ব। শুন যায়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ইহার আংশিক সংস্কা হইয়াছিল।

কুণ্ডের পার্শ্বে কয়েকটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারাণসীর মধ্যে ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি ভাদ্র শুক্লাষ্টমী হইতে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত এক-পক্ষব্যাপী একটী মহৎ মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়। বিশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-কুললক্ষ্মীগণের এরূপ মিলনস্থান আর কোথা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা যখন দলে দলে লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া পূত-হৃদয়ে লক্ষ্মীমন্দিরে মহালক্ষ্মীর দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হন, তখন দু

হইতে স্বর্গের নন্দন-কানন বলিয়া ভ্রম হয়, মনে হয় বুঝি বা দেবকন্যাগণ একত্র জলক্রীড়া করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সুমনোহর পবিত্র বিরাট দৃশ্য বস্তুতই দেখিবার যোগ্য।

মেলা-উপলক্ষে এখানে ভাঁড়, পুতুল, হাতা, খুন্তি প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যবহার্য্য বিবিধ সামগ্রীর এক প্রকাণ্ড বাজার বসিয়া থাকে। মেলা হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু খরিদ করিয়া থাকেন। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন মেলায় কিছু খরিদ না করিলে, তাঁহাদের তৃপ্তি বা পুণ্য হইবে না।

কুণ্ডের পশ্চিম ঘাটে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে বহু জীর্ণ দেবমূর্ত্তি ও প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে, পুরাতত্ত্ববিদগণের তাহা দেখিবার বিষয়।

কালিকামঠ :—

এই কুণ্ডের নিকট 'কালিকামঠ' নামে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন মঠ আছে। বহু বীরাচারী তান্ত্রিকসাধক সতত এইস্থানে আসিয়া স্ব স্ব শিক্ষা-দীক্ষা-উপদেশ ও প্রবৃত্তি অনুসারে সাধনা করিয়া থাকেন। বহু বাহ্যতত্ত্বামোদী শাক্ত-শিষ্য ইহাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছেন। লোকপরম্পরায় শুনা যায়—সাত্ত্বিকতার আবরণে তামসিক-আচরণই ইহাঁদের প্রধান অবলম্ব্য। যাহাহউক এরূপ প্রাচীন শক্তিমঠ শক্তি-উপাসকগণের অবশ্য বরেণ্য।

দক্ষিণামন্দির :—

ইহার নিকটে নূতন সংস্কৃত এই ক্ষুদ্র মন্দিরটী সাত্ত্বিক সাধকগণের বিশেষ আদরের স্থান। মন্দিরটী ক্ষুদ্র ও আধুনিক ভাবে নির্ম্মিত। মন্দিরমধ্যে সুন্দর দক্ষিণাকালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

শুনা যায়, দক্ষিণা-মন্দিরটী বহু প্রাচীন, কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাহা সমভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিলনা, জনৈক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু একটী সামান্য মৃণ্ময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটী দেবী-মূর্ত্তিকে সংগোপনে রক্ষা পূর্ব্বক স্থানটীর মর্য্যাদা রক্ষা করিত, পরে একটী ধর্ম্মাত্মা হিন্দু-মহিলা যথা-বিধানে তাহাব সংস্কার করিয়া দিয়াছেন, কেহ কেহ 'তুরীয়ামঠ' বলিয়াও ইহার উল্লেখ করেন। ইহার নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেকগুলি মঠ ও মন্দির আছে, পূর্ব্বে বহু সাধু-সন্ন্যাসী সতত এই সকল স্থানে বাস করিয়া থাকিতেন। এক্ষণে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু গৃহস্থের ঘন বাস ভবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম ও অদ্বৈতমঠ :—

লক্ষ্মীকুণ্ডেব অনতিদূরে "রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রম" অবস্থিত। এই 'সেবাশ্রম' প্রত্যেক কাশীযাত্রীরই একবার দর্শন করা কর্ত্তব্য। এইস্থানে দুঃস্থ, অনাথ ও পীড়িত নরনারীগণকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য ও আহার্য্য প্রদান করা হয়। আশ্রমে রোগীদিগের থাকিবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে, এতদ্ব্যতীত দীন-দরিদ্র রোগীদিগের গৃহে যাইয়াও সেবকগণ ঔষধ-পথ্যদ্বারা সমাদরে সেবা করিয়া থাকেন।

এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতি চিত্তাকর্ষক। গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কতিপয় ভদ্রবংশীয় বালক স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাদি পাঠে উদ্বোধিত হইয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন-উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহাদের মধ্যে 'চারুচন্দ্র দাস', 'বিরাজ মোহন মজুমদার' ও অন্যটীর নাম ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় 'রাখাল' হইবে। চারু ও বিরাজ কায়স্থ অন্যটী ব্রাহ্মণ-সন্তান।

তাহারা অচিরেই কাশীর পথঘাট হইতে অনাথ ও পীড়িতগণকে উঠাইয়া লইয়া ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া সেবা করিতে আরম্ভ করে। সে সময় তাহারা রামাপুরার মধ্যে একটী সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়া 'সেবাশ্রমের' কার্য্য আরম্ভ করে। কাশীর প্রধান প্রধান লোকের সহিত এই গ্রন্থকারই তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেন ও নানা স্থানে চাঁদা-সংগ্রহ করিয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করেন। তাহারাও প্রাণপণে এই নিঃস্বার্থ-মহৎকার্য্য ধীরে ধীরে সম্পাদন করিতে থাকে। পরে আশ্রমের কার্য্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেবাশ্রমের ভার 'রামকৃষ্ণ-মিশনের' হস্তে সমর্পিত হয়। অনন্তর জনৈক সুহৃৎ আশ্রমের জন্য কিছু জমী খরিদ করিয়া দিলে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে আশ্রমের হাঁসপাতাল গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'সেবাশ্রম' নূতন গৃহে উঠিয়া আসে। সম্প্রতি আশ্রম-সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ড গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে এবং বহু দানশীল মহাত্মগণের কৃপায় উক্ত জমীর উপর নূতন নূতন গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বনে সেবাকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। এযাবৎ বহু সহস্র নরনারী আশ্রমের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই আশ্রমের সুচারু কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া যথার্থই হৃদয়ে বিপুল আনন্দ হয়। ইহা হিন্দু অহিন্দু সকলেরই সমান আদরের বস্তু। দেশবাসী সকলের নিকটই অসঙ্কোচে অনুবোধ করিতে পারা যায় যে, এমন নিষ্কাম-সেবাকার্য্যে প্রত্যেকের সাধ্যমত সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এই আশ্রমেব সংলগ্ন "অদ্বৈতাশ্রম" বা "অদ্বৈতমঠ" নামে

একটী নূতন মঠ রামকৃষ্ণ-সেবক সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক বহুদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিশনের সাধুসন্ন্যাসীগণ তথায় সাধন-ভজন করিয়া থাকেন।

ছাতুয়া-বাবার মঠ ঃ—

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের পশ্চিমদিকে মণিকর্ণিকাঘাটস্থিত প্রসিদ্ধ ছাতুয়া-বাবার একটী মঠ আছে। এস্থানে প্রায়ই দুই একজন সন্ন্যাসী স্ব স্ব সাধন ভজন করিতেন। এই মঠটী আধুনিক। এতদ্‌সংলগ্ন বাগান এক্ষণে রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কেবল মন্দির ও কুয়াটীই ছাতুয়া বাবার অধিকারে আছে। একজন পণ্ডিত মন্দিরের সেবা করেন।

বেদান্ত মঠ ঃ—

ছাতুয়া-বাবার মঠের প্রায় সম্মুখেই পথের উত্তর ধারে বেদান্তমঠের প্রকাণ্ড বাগান ও মঠ। মঠটী দেখিলে প্রাচীন বলিয়াই মনে হয় বহু সাধু সন্ন্যাসী সতত এই স্থানে অবস্থান করিয়া বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সময় সময় কোন উচ্চ অধিকারীর সাধকও এখানে আসিয়া থাকেন ও বেদান্তের গভীর উপদেশসমূহ প্রদান করিয়া শিক্ষার্থীদিগকে পরিতৃপ্ত করেন।

শিখগুরুমঠ ঃ—

শিখ-গুরু নানকজী-মহারাজের প্রবর্ত্তিত শিখ-সম্প্রদায়ের এই মঠটীও বহুদিন হইল এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মঠমধ্যে পবিত্র 'গ্রন্থমহারাজ' সিংহাসনোপরি রক্ষিত আছে। বহু শিখ-সাধু সতত এই স্থানে বাস করিয়া স্ব স্ব সাধন ভজন করিয়া থাকেন।

থিয়োজফিক্যাল-সোসাইটি বা তত্ত্বসভা :—

শিখ-মঠের আরও সামান্য পশ্চিমদিকে প্রসিদ্ধ "থিয়োজফি-ক্যাল-সোসাইটীর" ভারতবর্ষীয় প্রধান কার্য্যালয় ও মঠ অবস্থিত। বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া থিয়োজফিক্যাল-সোসাইটীর নানা বিভাগ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমতী 'আনি বেসান্তের' ভক্তবৃন্দ ও সোসাইটীর বর্ত্তমান পরিচালকগণ অনেকে এই স্থানে অবস্থান করেন। কাশীদর্শনাভিলাষী 'থিয়োজফিষ্টগণ' এই স্থানে থাকিয়াই প্রায় সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যেই "ভারত-ধর্ম্ম-লজের" প্রধান কার্য্যালয় ও মঠ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই থিয়াজফিক্যাল-সোসাইটীর ঠিক সম্মুখে প্রসিদ্ধ 'গৌরীশঙ্করের' বাগান। এই বাগানস্থিত কুঁয়ার জল কাশীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। সহরের অসংখ্য লোক প্রত্যহ এই কুঁয়ার জল পান করিয়া থাকেন।

হিন্দুকলেজ-স্কুল :—

থিয়োজফিক্যাল-সোসাইটীর পিছনেই অর্থাৎ দক্ষিণদিকে শ্রীমতী আনিবেসান্ত-প্রবর্ত্তিত প্রসিদ্ধ হিন্দুকলেজ ও বোর্ডিং-গৃহ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথমে 'সপ্তসাগরে' স্থাপিত হয়, পরে 'নন্দনসাহু মহল্লায়' উঠিয়া আসে। এই সুন্দর অট্টালিকাসহ ১৬/ বিঘা জমী বর্ত্তমান 'বেনারস-মহারাজ' কলেজের জন্য প্রদান করিয়াছেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন 'বোর্ডিং-গৃহ' ও অন্যান্য বহু অংশ নির্ম্মাণ করতঃ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কলেজ-বিভাগ এখান হইতে উঠিয়া 'নাগোয়াস্থিত' 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের' সহিত মিলিত

হইয়াছে। এখানে কেবল স্কুল-বিভাগই বিদ্যমান আছে। কাশীর মধ্যে ইহাও যে একটী দেখিবার বস্তু তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বৈদ্যনাথ, বটুক-ভৈরব ও কামাখ্যা-দেবী :—

হিন্দু-কলেজ-বোর্ডিংএর ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যে পথ কিছু দূর দক্ষিণদিকে গিয়া পরে পশ্চিম মুখে গিয়াছে, সেই পথেই যথাক্রমে 'বৈদ্যনাথ', 'বটুক-ভৈরব' ও 'কামাখ্যা দেবীর' মন্দিরে যাইতে হয়। পথটী সহরের তুলনায় নির্জ্জন, নিস্তব্ধ অর্থাৎ খুব কম লোকই এ পথে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন ইহার পরিসরও অধিক নহে, সাধারণ গলি-রাস্তামাত্র।

এই পথে প্রথমেই বৈদ্যনাথজীর প্রকাণ্ড প্রাচীন মন্দির ও মঠ। বহু সাধু-সন্ন্যাসী সততই এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। মঠের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ গৃহ ও বারাণ্ডা বা রক। এই সকল গৃহ সাধুদিগের জন্যই ব্যবহৃত হয়। সময় সময় অনেক উচ্চ-সাধকেরও এখানে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

'বটুক-ভৈরব' ও 'কামাখ্যাদেবীর' মন্দিরদ্বয় প্রায় সংলগ্ন 'বৈদ্যনাথজীর মন্দির' এখান হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। এই মন্দির দুইটী নাতিবিস্তৃত, বেশ শান্তিময়, গম্ভীর ও উগ্রশক্তি সমন্বিত। বহু সাধক ও সাধনাকাঙ্খী ব্যক্তি সময় সময় এখানে আসিয়া সাধন-শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়েন। পূর্ব্বে সাধারণ যাত্রীর দল এই স্থানের সংবাদ জানিতেন না। সুতরাং মেলা-হিসাবে তেমন ভিড় হইত না। এখন অনেকেই এখানে আসিয়া থাকেন তাহাতে স্থানের উগ্রতা-মাহাত্ম্য সামান্য মন্দিভূত হইলেও এখনও

যথেষ্ট শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। শক্তি-সাধকদিগের ইহা একটী অপূর্ব্ব স্থান। ভক্তি ও ক্রিয়াবান সাধক ব্যতীত তাহা অন্যের উপলব্ধ নহে। বাস্তবিক কিয়ৎক্ষণ এই মন্দিরমধ্যে বসিয়া একাগ্রমনে জপ করিলে সাধারণ ব্যক্তিরও শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। সাধকমুখে শুনা যায়, তন্ত্রোক্ত নিশাপূজার সময়ে তাঁহারা এখানে বহু অলৌকিক দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কখন কখন গভীর নিশাকালে উচ্চতম সাধকগণ আগমন করিয়া এখানে দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। মন্দিরদুইটী দেখিতে নিতান্ত আধুনিক নহে। উভয় মন্দিরই পশ্চিম মুখে যাইতে পথের বাম পার্শ্বে অবস্থিত। "দক্ষিণ-মানসযাত্রা বিধিতে" কামাখ্যা-তীর্থে স্নানাদি করিয়া প্রথমে কামাখ্যা-দেবীর পূজা, পরে বটুক-ভৈরবের পূজা করিয়া 'রেবা-কুণ্ড' প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে যাইবার উল্লেখ আছে। কাশীযাত্রী ভক্তিবান সাধকের ইহা অবশ্য দর্শনীয় স্থান। এই সকল স্থান 'কামাচ্ছা মহল্লা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমি প্রথমেই বৈদ্যনাথ, পরে বটুক-ভৈরব ও কামাখ্যা-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বৈদ্যনাথের মন্দির কামাখ্যাদেবীর মন্দির হইতে আরও কিছু পশ্চিমে, সুতরাং হিন্দু-কলেজের দিক হইতে বটুকদেবের মন্দিরই প্রথমে পড়ে, পরে কামাখ্যাদেবী, তদনন্তর বৈদ্যনাথের মন্দির।

রথযাত্রা স্থানঃ—

কামাখ্যা বা কামাচ্ছাতে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথ-যাত্রা হইয়া থাকে। সে সময় এখানে ভারি মেলা হয়। রথটী এক স্থানে পথের ধারে দাঁড় করানই থাকে, টানা হয় না।

শঙ্করাচার্য্য মঠ বা কৈলাসারণ্য ঃ—

উক্ত কামাখ্যাদেবীর মন্দির হইতে বৈদ্যনাথের মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে পশ্চিমোত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল সঙ্কীর্ণ পল্লী-পথ ধরিয়া যাইলে ভগবান 'শঙ্করাচার্য্য-দেবের মঠে' বা 'কৈলাসারণ্যে' উপস্থিত হওয়া যায়। মঠমধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত আদি শঙ্করাচার্য্য-দেবের অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সে পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় আনন্দে গদ গদ হইয়া উঠে। উৎকল-তীর্থ পুরীর গোবর্দ্ধন-মঠেও ঠিক এইরূপ মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। পরম পূজ্যপাদ ভূতপূর্ব্ব গোবর্দ্ধন-মঠাধীশের মুখে শুনিয়াছি, সে মূর্ত্তিটী কাশীর কোনও প্রাচীন মূর্ত্তিরই অনুকরণে গঠিত। বেনারস সহরের মধ্যেও বিশ্বনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধ-ঘাটে যাইবার রাস্তায় ঠিক এইরূপ আর একটী মর্ম্মর-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারঘাটেও একটী মূর্ত্তি আছে। কিন্তু এই মঠস্থিত মূর্ত্তিটীই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। মঠটী বিস্তৃত কাননের মধ্যে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে বিবিধ তরুরাজী-মধ্যে প্রশান্ত 'শঙ্করমূর্ত্তি' হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই পূত শঙ্কর-মঠ ভাব-সৌন্দর্য্যে যেমন গম্ভীর তেমনি প্রকাণ্ডরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। মুক্তিকামী সাধু-সন্ন্যাসিগণ অনেক সময় এই মঠে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কাননের নানাস্থানে তাঁহারা আসন রচনা করিয়া নির্জ্জনে সাধনা করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে, অবিশ্রাম কোলাহলময় সহরের উপকণ্ঠে এমন নির্জ্জন তপোবন-সদৃশ স্থান সাধনাভিলাষীর অবশ্য উপ-ভোগ্য। সাধারণ যাত্রীগণ কাশীধামে আসিয়া বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন ও মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়াই চলিয়া যান, যেন বালক-

দিগের 'চোর-চোর খেলার' ন্যায় 'বুড়ি-ছুঁইয়াই' নিশ্চিন্ত হন, সুতরাং এ সকল শান্তিময় পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিতে তাঁহারা আদৌ অবসর পান না, আবার অনেকেই এ সকল স্থানের সংবাদও জানেন না। যাঁহাদের অবসর আছে, তাঁহারা কাশীতে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকাতীর্থ দর্শনান্তর এই সকল পরিদর্শন করিলে সংসারের চির-কোলাহলময় নিত্য-অশান্তির জ্বালামালা হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে পূতশান্তির স্নিগ্ধধারায় সুশীতল হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঠাকুর সদানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব এই স্থানে 'ধনেশ্বর বাবা' নামে অনেকদিন অবস্থান করিয়া ছিলেন।

রেবড়ীতলাও ও জয়নারায়ণ-কলেজ :—

পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-কলেজের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কিয়দ্দূর আসিয়া সম্মুখে একটী অসংস্কৃত বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই 'রেবড়ীতলাও' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইহা তীর্থরূপে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহা আর হয় না। অধুনা উক্ত পুষ্করিণীটী বুজাইয়া ফেলা হইতেছে। নিকটে মোসলমান ও নীচ হিন্দুদিগেরই বসতি অধিক।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ভূ-কৈলাসের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ জয়নারাণ ঘোষালের প্রবর্ত্তিত স্কুল ও কলেজ ইহার নিকটেই অবস্থিত। মহারাজ নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার দ্বেষ অথবা হিংসা ছিল না। তিনি মোসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনায় যেরূপ সহায়তা করিতেন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও সেইরূপ সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া

স্বীয় উদারতার পরিচয় দিতেন। তিনি কাশীতে বহু পুণ্য-কর্ম্ম করিয়া চিরকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার এই 'কলেজ' প্রতিষ্ঠাও অন্যতম। তিনি এই কলেজ স্থাপনা করিয়া খৃষ্টান পাদ্রীদিগ্নের হস্তেই তাহার পরিচালনা-ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে হিন্দু, মোসলমান, জৈন ও খৃষ্টানাদি যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী বালকগণ রীতিমত বিদ্যালোচনা করিতে পারে, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এতদর্থে তিনি বহু অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলেজ-বিভাগ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও স্কুলের এখনও বেশ সুনাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত একটী সংস্কৃত-উপাধিবিভাগও আছে, তাহাতেও বহু বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

এই বিদ্যালয়ের সম্মুখে পূর্ব্বে বহু চিত্র-শিল্পির আবাস ছিল। ভারতীয় মোগল-চিত্র-কলায় অর্থাৎ হস্তিদন্ত প্রভৃতির উপর অনুচিত্রে (Mineature Painting) তাহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দুই একজন আধুনিক প্রতীচ্য-শিল্পেও বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এক্ষণে ইহাদের আর তেমন উন্নতি নাই, ক্রমেই ইহাদের বংশ লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ডঁউরিয়াবীর ও রুণ্ডিকা-দেবী :—

কাশীর মধ্যে 'ডঁউরিয়াবীর' একটী প্রসিদ্ধ মহল্লা। রেউড়ী-তলাও হইতে দক্ষিণ দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ডঁউরিয়াবীর-মহল্লায় 'ডঁউরিয়াবীর-দেবতার' মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি শ্রাবণ মাসে এখানে এক মহতি মেলা হইয়া থাকে। এই

মন্দিরের নিকটেই ছাগ বা বখরার একটী বাজার অর্থাৎ হাট আছে। এই স্থানে বহু ছাগ সর্ব্বদা বিক্রয় হইয়া থাকে। ডঁউরিয়াবীরের নিকটও ছাগবলি হইয়া থাকে।

ডঁউরিয়াবীরের মন্দিরের নিকটেই রুণ্ডিকা-দেবীর মন্দির অবস্থিত।

ডঁউরিয়া শব্দেরই অপভ্রংশ রেউড়িয়া হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলে রেউড়ি বা রেউড়িয়া তলাও প্রাচীনকালে 'ডঁউরিয়া-তলাও' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল বলিতে হইবে।

বড়হর-রাণীর মন্দির ঃ—

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরসমূহ হইতে দক্ষিণদিকে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, বড়হর-রাণীর সুন্দর উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরমধ্যে পঞ্চোপাসক হিন্দুর গণেশাদি পঞ্চদেবতার সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি বিগ্রহগুলি অবস্থিত। মন্দিরের এক পার্শ্বে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর মর্ম্মর-নির্ম্মিত একটী অতি মনোহর মূর্ত্তি আছে। স্বামী ভাস্করানন্দ দেব কাশীর একজন প্রসিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন।

গুরুধাম ঃ—

সহর হইতে দুর্গাবাড়ী যাইবার পথে, দুর্গাবাড়ী-থানার ঠিক সম্মুখে প্রকাণ্ড কাননমধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ভূকৈলাসাধিপতি রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত গুরুধাম অবস্থিত। এই গুরুধাম-মন্দির এক অভিনব সামগ্রী। অষ্টদলাকার মন্দির-মধ্যে সহস্রদল কমলোপরি শুদ্ধ-স্ফটিক-সদৃশ শ্বেতবর্ণ বরাভয়কর দ্বিভুজ স্বপ্রকাশরূপ সশক্তি গুরুমূর্ত্তি অবস্থিত। উপরে স্বতন্ত্র

মন্দিরমধ্যে মহারাজের ইষ্টদেবতা যুগলমূর্ত্তি পদ্মাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন। এমন ভক্তি ও সুরুচি-সঙ্গত কীর্ত্তিকলাপ দেখিলে মহারাজের অদ্ভুত কল্পনা ও নিষ্ঠাশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই গুরুধামের সম্মুখেই 'মেনকা-দেবীর' প্রসিদ্ধ মন্দির সকলেই দর্শন করিয়া থাকেন।

দুর্গাজীর মন্দির বা দু বাড় ঃ—

কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করা ভক্তের যেরূপ আদর ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়, 'দুর্গাবাড়ী'-দর্শনও সেইরূপ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। প্রায় দেখা যায়, যিনি কাশীতে আসিয়া কিছু না করিবেন অথবা অন্য কিছুই না দেখিবেন, তিনি অন্ততঃ বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও দুর্গাজী অবশ্যই দর্শন করিয়া যাইবেন। নতুবা হিন্দু-সন্তানের কাশী-আগমনই বৃথা!

এই দুর্গাবাড়ী কাশীতীর্থের একপ্রান্তে, অসী-সঙ্গম-সমীপে বারাণসীর সেই দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মহা-পুণ্যবতী অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী বা রাণী-ভবানী কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান দুর্গামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের মোহনটী তৎকালের সুবেদার মহাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য মন্দ নহে। মন্দিরমধ্যে কয়েকটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে, তন্মধ্যে একটী নেপালরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যটী জনৈক য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয়-গণ বিশ্বনাথ-মন্দিরকে যেমন 'Golden Temple' বা 'স্বর্ণ-মন্দির' আখ্যা দিয়াছেন, দুর্গাবাড়ীকেও তেমনি 'Monkey Temple'

দুর্গাবাড়ীর অন্তর দৃশ্য। (১৬৯ পৃষ্ঠা)

বা 'কপি-মন্দির' বলিয়া উল্লেখ করেন। বাস্তবিক দুর্গাবাড়ীতে এত অধিক সংখ্যক বানরের আশ্রয়স্থল যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা চতুর্দ্দিকে অসঙ্কোচে লাফালাফি করিতেছে, যাত্রীর কাপড় ধরিয়া খাবার আদায় করিতেছে, যূপকাষ্ঠের নিকট কুক্কুর ও বানর-শিশুগুলি কেমন একত্র মিলিয়া-মিশিয়া খেলা করিতেছে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! কোন এক ইংরাজ মহিলা তাঁহার 'কাশীদর্শন' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন—"যখন তিনি দুর্গাবাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন মন্দির-সংলগ্ন 'কুণ্ডে' জনৈক গোপ স্নান করিতেছিল, কুণ্ডের সোপানোপরি রক্ষিত বস্ত্রমধ্যে তাহার উপার্জ্জিত ৩০৲ ত্রিশটী টাকা ছিল। ইত্যবসরে একটী প্রকাণ্ড বানর আসিয়া টাকাসহ সেই বস্ত্রগুলি লইয়া একটী বৃক্ষে আরোহণ করে। গোপ এই ব্যাপার দেখিয়া তাড়াতাড়ি কুণ্ড হইতে উঠিয়া যেদিকে বানরটী উঠিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিত হয়। কলা, ছোলা ও নানাবিধ প্রলোভনের বস্তু দেখাইতে লাগিল, কিন্তু বানর কিছুতেই সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিল না। গোপ বাধ্য হইয়া তখন তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল, ক্রমে লোকের ভিড় হইয়া গেল, অনেকেই বানরের সেই কীর্ত্তি দেখিতে লাগিল, বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ মহিলাও সেই তামাসা দেখিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বানরটী দাঁত দিয়া বস্ত্রখানি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া এক একটী টাকা ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল, গোপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিল, কিন্তু দুষ্ট বানর ৩০৲ ত্রিশটীর মধ্যে ১৫৲ পনেরটী কুণ্ডমধ্যে ও ১৫৲ পনেরটী টাকা পথে ফেলিয়াছিল। গোপ বহু চেষ্টা করিয়া কুণ্ড হইতে একটী টাকাও উদ্ধার করিতে পারিল না। গোপ "বোধ হয়

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বুঝিয়া কাতরচিত্তে বাড়ী চলিয়া গেল।”
বিবি আরও লিখিয়াছেন, যে—“বোধ হয় গোপ দুগ্ধে আধাআধি
জল মিশাইয়া বিক্রয় করিত।”

যাহাহউক দুর্গাবাড়ীতে বানরের এইরূপ উপদ্রব পূর্ব্বে
প্রায়ই হইত। সময় সময় যাত্রী লোকজনের বস্ত্রাদিও ছিন্ন
করিয়া দিত। একসময় উহারা জনৈক সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় মহিলার
বস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে সরকার পক্ষ বানরগুলিকে
মারিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু কাশীবাসী হিন্দুগণের ঘোর
প্রতিবাদে তাহাদিগকে না মারিয়া বহুসংখ্যক ধরিয়া দূরে বনমধ্যে
নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন বানরের আর
তেমন উৎপাত নাই। কিন্তু ক্রমেই যেন তাহাদের বংশবৃদ্ধি
হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

কালীঘাটের ন্যায়, কাশীর এই দুর্গাবাড়ীতেও যথেষ্ট
ছাগ-বলি হইয়া থাকে। কাশীবাসী অনেকেই দুর্গাবাড়ীর সেই
প্রসাদী মাংস ক্রয় করিয়া আনেন ও ভক্তিসহকারে ভোজন
করেন। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার এখানে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি
হইয়া থাকে, তবে শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে
দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং বাসন্তী পূজা আদি সময়ে ভারি
মেলা হয়।

কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, দেবী প্রথমে বিন্ধ্যাচলে
আবির্ভূতা হইয়া দুর্গাসুরকে বধ করণান্তর, ‘দুর্গা’নামে প্রসিদ্ধা
হইয়া কাশীর দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া অবস্থান করেন। বিন্ধ্যা
চলান্তর্গত ‘চুনার’ নামক স্থানে দুর্গাসুরকে যথায় বধ করিয়াছিলেন,
তথায় প্রসিদ্ধ ‘দুর্গাখো’ বা ‘দুর্গাকুণ্ড’ অথবা “দুর্গাভৈরব কুণ্ড”

এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত রাজা সুরথের পূজিত শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত আছে।

দুর্গাকুণ্ড ঃ—

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড সকলের ন্যায় শ্রীশ্রীদুর্গামাতার এই কুণ্ডেরও অবস্থা অতি শোচনীয়, তবে জনশ্রুতি এইরূপ যে, সরকারপক্ষ শীঘ্রই ইহার জল সর্ব্ব সময় পূর্ণ রাখিবার জন্য গঙ্গার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গণপতি-মন্দির ঃ—

দুর্গামন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী প্রাচীন 'গণপতিমন্দির' আছে। এই মন্দিরটী সম্বন্ধে কাশীবাসী ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'আমরা বংশপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, ইহা অপেক্ষা প্রাচীন মন্দির কাশীতে আর নাই, ইহা সেই সত্যযুগের নির্ম্মিত। বাস্তবিক মন্দিরটীর কোন শিল্প-পারিপাট্য বা কোনরূপ সৌন্দর্য্য নাই, নিতান্ত সাদাসিধা কয়েকখানি মাত্র পুরাতন প্রস্তরে গ্রথিত। তাঁহাদিগের কথা সত্য হইলে এই পুরাতন প্রস্তর কয়খানাই হিন্দু পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের যে অত্যন্ত আদরের বস্তু ও প্রণম্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাস্করানন্দ-মন্দির ঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গাজীর প্রসিদ্ধ মন্দির ও কুণ্ডের অনতিদূরে পশ্চিম পার্শ্বে পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজির সমাধি ও তাঁহারই নামে নূতন আশ্রম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বহুদিন কাশীবাস করিয়া পরে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞ সাধু, পরম

পূজ্যপাদ প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ স্বামীর পর আর দেখা যায় নাই তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায়ই সতত নগ্নাবস্থায় নির্ব্বিকারভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত উপনিষদ ব্যাখ্যাদি বহু শাস্ত্রগন্থ চিরদিন তাঁহার কঠোর সাধনা, পাণ্ডিত ও অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবে।

এই সমাধিমন্দির বা আশ্রম স্বামীজির দুইজন শিষ্য কর্ত্তৃক প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর দ্বারা এমন মনোহর করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে প্রকৃতই নয়ন-মন তৃপ্ত হয়।

সঙ্কটমোচন ঃ—

দুর্গাজীর দক্ষিণ কিছু দূর যাইলে 'সঙ্কটমোচনের' প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই পরম ভক্ত তুলসীদাসের উপাস্য মহাবীরের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এই সকল স্থান ঘোর অরণ্যময় ছিল। এই স্থানেই পরম পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমৎ সদানন্দ সরস্বতী দেব 'মৌনীবাবা' নামে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র ঃ—

পূর্ব্বকথিত দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে প্রাচীন 'কুরুক্ষেত্র-তলাও' নামক এই সুবৃহৎ পুষ্করিণী অবস্থিত। ইহারও জল অন্যান্য কুণ্ডেরই অনুরূপ। পরম পুণ্যবতী রাণী-ভবানী কর্ত্তৃক এই 'কুরুক্ষেত্র' তীর্থটী একবার ভাল করিয়া সংস্কৃত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এই তীর্থে অনেকে স্নান করিয়া থাকেন।

নানকপন্থীমঠ ও পঞ্চমন্দির ঃ—

ইহার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম পার্শ্বে নানকপন্থীদিগের একটী আখড়া বা মঠ আছে। নিকটে পঞ্চমন্দির নামে আরও কয়েটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কাশীতলবাহিনী গঙ্গাতট ঃ—

শিবময় কাশীর ধনুষাকার পবিত্র পাদমূলে উত্তরবাহিনী পূতসলিলা গঙ্গা কত রঙ্গে-ভঙ্গে কেমন তরঙ্গ-বিক্ষেপে প্রবাহিতা! উপরে আনন্দকানন বারাণসীর দক্ষিণ সীমা অসিসঙ্গম হইতে উত্তর প্রান্ত বরণাসঙ্গম পর্য্যন্ত অসংখ্য সোপানশ্রেণী অঙ্কে ধারণ করিয়া কত স্বর্ণধ্বজ ত্রিশূলশীর্ষ শিবমন্দির, কত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুন্দর সৌধরাজি ও আকাশচুম্বিত বিশালদৃশ্য মিনারেটসমূহ কাশীর সেই অদ্ভুত সৌন্দর্যকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গার সেই সুন্দর সোপানতট নিত্য স্নাননিরত অগণ্য নরনারী দ্বারা সততই পরিশোভিত, সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে বিবিধ তরণী-শ্রেণী ইতস্ততঃ কেমন পরিচালিত, সে স্বর্গীয় শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয় বিমোহিত হইয়া যায়, চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্ম্মান্তর-বিশ্বাসী প্রতীচ্চ সুধীমণ্ডলীও তাহাতে অল্প আনন্দানুভব করেন না। তাঁহারাও এই মনোমুগ্ধকর শোভা সন্দর্শনার্থ নিত্য নৌকারোহণে গঙ্গায় বিচরণ করিয়া থাকেন।

প্রত্যূষে যখন অরুণরাগরঞ্জিত পূর্ব্ব-গগন সাবিত্রী-গায়ত্রী-

রঞ্জিত তরুণ সবিতাদেবতার প্রথম আগমন সমাচার প্রচার করিতে থাকে, যখন তাঁহার সেই নূতন রশ্মিপ্রভা পশ্চিমপ্রান্তে প্রতিফলিত হইয়া অর্দ্ধগোলাকার কাশীধামের প্রতি অঙ্গ পুলকিত করিয়া তুলে, তখন গঙ্গা-বক্ষ হইতে সহসা সেই শুভ্রোজ্জ্বল অট্টালিকা-শোভিত সমগ্র বারাণসীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, যেন কাশীপতি বিশ্বনাথ স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত হইয়া অসি-বরণা পর্য্যন্ত উভয় দিকে নিজ বিরাট বাহুদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক উদীয়মান জগজ্জ্যোতিঃ বালসূর্য্যকে ক্রোড়ে লইবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। অহো! সে অলৌকিক পবিত্র নিসর্গশোভা বস্তুতই বর্ণনাতীত, সে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতে হৃদয় তখন ভরিয়া যায়, আর মুখে বুঝি বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবারও অবসর থাকে না। যে মানব কাশীতে আসিয়া বারাণসীর এহেন স্বর্গীয় রূপমাধুরী দেখিবার সুযোগ পায় নাই, তাহার মানব-জন্মই বৃথা! আবার যাঁহারা কাশীধামে আসিয়া নব্যবিলাস-রঙ্গে ডুবিয়া যান এবং দিবারাত্রি তাহাতে মধুভাণ্ডে পতিত মক্ষিকার ন্যায় মত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কাশীপতির নিতান্ত কৃপাভাজন! বিশ্বনাথ তাঁহাদিগের সুমতি প্রদান করুন।

অসিসঙ্গম হইতে বরণা পর্য্যন্ত প্রায় দুই ক্রোশব্যাপী অর্দ্ধ গোলাকার কাশীর গঙ্গাতট শ্রেণীবদ্ধ সোপানসমূহে সমাবৃত। এমন সোপানবহুল স্নানঘাট ভারতের আর কোন তীর্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল ঘাট কত স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মার কত অর্থব্যয়ে কত কাল ধরিয়া যে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। তবে প্রত্যক্ষ-ইতিহাসই এখনও তাহার সাক্ষ্য

প্রদান করিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সে পুণ্যময় অতীত-কীর্ত্তির রক্ষাকল্পে আর যেন কাহারও দৃষ্টি নাই। ঘাটের যে অংশ কালের অপ্রতিহত-প্রবাহে ক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, বর্ষার প্রবল গঙ্গাস্রোতে প্রতিহত হইতে হইতে যাহা ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে, তাহার সংস্কারকল্পে আর কাহারও আদৌ লক্ষ্য নাই, ফলে যাহা একবার নষ্ট হইতেছে, তাহা সেইরূপেই কছুদিন থাকিয়া ক্রমে অনেক ঘাটের ধ্বংসেরই পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে কাশীপ্রবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের সাধ্যানুসারে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন, আর আজ হিসাববুদ্ধিসম্পন্ন আত্মসুখপরায়ণ সামান্য গৃহস্থ হইতে রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই ইংরাজী ঢংএ স্ব স্ব বিলাসভবনরূপ আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিতেই তৎপর। পুণ্যতীর্থে আসিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সেও অনেকে সাময়িক বানপ্রস্থাশ্রম ছাড়িয়া মোহ ও বিলাস-পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। হায়! হায়! তাঁহাদের প্রবৃত্তিগুলিও কি এই কালেরই অধীন, না এ বিভ্রম তাহাদের পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা পরিপুষ্ট! যাহা হউক, সেই সকল প্রাচীন-কীর্ত্তি ঘাটসমূহ—যাহা নিত্য সায়াহ্নে আধুনিক সংস্কারধ্বজী বিলাসী বড়লোকদিগের মাত্র বিহার-স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রাতে তাহারই পবিত্র সোপানপথে অসংখ্য নরনারী (আধুনিক শিক্ষিতদিগের মতে ইহারা কুসংস্কারপরায়ণ!) ভক্তি-গদগদ-চিত্তে পতিতপাবনী সুরধুনীর স্নিগ্ধসলিলে স্নান করিয়া তাহাদের জীবন মন কৃতার্থ করে,—পাঠকগণের অবগতির জন্য পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাদির ন্যায় সেই ঘাটগুলিরও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

অসিসঙ্গম ও পঞ্চতীর্থ ঘাট ঃ—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বারাণসীর দক্ষিণসীমা 'অসি' নদী। ইহা অতি প্রাচীনকালে একটী ক্ষুদ্র-স্রোতস্বতী ছিল, কিন্তু অধুনা অসির সে স্বভাব-স্রোত নাই। নদী একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বর্ষাকালে ইহাতে জল-পূর্ণ হইলে স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মানা হয়। বোধ হয় সেই কারণ অনেকে এক্ষণে 'অসি-নালা' বলিয়াও ইহার উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ ইহা নালা নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইহা গঙ্গার একটী প্রসিদ্ধ উপনদী বলিয়া পরিচিত। বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্তে গঙ্গার সহিত যে স্থানে ইহা মিলিত হইয়াছে, তাহারই নাম অসিসঙ্গম বা অসিঘাট। ইহা কাশীতলবাহিনী গঙ্গার প্রসিদ্ধ 'পঞ্চতীর্থের' অন্যতম বা সর্ব্ব-প্রথম তীর্থ। এই (১) অসিসঙ্গম তীর্থে যাত্রিগণ প্রথমে স্নান করিয়া পরে (২) দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করেন, অনন্তর (৩) বরণাসঙ্গম, তদনন্তর (৪) পঞ্চগঙ্গা, সর্ব্বশেষে (৫) মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। কাশীস্থ গঙ্গার এই প্রসিদ্ধ পাঁচটী ঘাটই 'পঞ্চতীর্থ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পঞ্চক্রোশী যাত্রীগণও এই স্থান হইতে পঞ্চক্রোশী পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বরণা-সঙ্গমে আসিয়া পথের যাত্রা শেষ করেন

অসিঘাট কাশীর অন্যান্য ঘাটের ন্যায় প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত নহে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল, কি না, তাহারও কোন চিহ্ন বা ঐতিহাসিক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে এই ঘাটের উপরে অনেক মন্দির, মঠ ও আখড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ঃ—

সেই সকল মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরটী

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অসিঘাটের উপরেই, সামান্য দক্ষিণ-দিকে, জগন্নাথপ্রভুর প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রাঙ্গন, অতিথিশালা ও গৃহাদি বহু বিস্তৃত। জগন্নাথের স্নানযাত্রা উপলক্ষে এখানে এক প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। সে সময় বহু যাত্রী প্রভু-দর্শনার্থে এই স্থানে সমবেত হয়।

লোলার্ক কুণ্ড ও ভদ্রেশ্বর ঃ—

অসিঘাটের বাম পার্শ্বে প্রসিদ্ধ 'লোলার্ককুণ্ড' অবস্থিত। াকদ্বিপী ব্রাহ্মণগণের লোলার্কশাখা কর্ত্তৃক অতি প্রাচীন কালে এই কুণ্ডটী প্রতিষ্ঠিত। কুণ্ডটী বহুদিন হইতে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, পরে রাণী অহল্যাবাই, অমৃতরাও ও অন্যান্য কতিপয় জমিদারের যত্নে পুনরায় সংস্কৃত হইয়াছে। ইহা একটী প্রকাণ্ড কুপ ও বাওলী। কুপ বা কুণ্ডস্থিত জলে নামিবার জন্য বাওলী হইতে সুন্দর সোপানশ্রেণী বিন্যস্ত।

সম্বৎসরের মধ্যে এখানে সাধারণ যাত্রীর সমাগম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বর্ষাকালে এখানে যে লোকার্ক মলা হয়, তাহাতে বহু নর নারীর সমাগম হইয়া থাকে। বিশেষ স্ত্রীলোকগণ এই মেলা উপলক্ষে কুণ্ডে স্নান করিয়া পরে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। এই কুণ্ডেরই অনতিদূরে 'ভদ্রেশ্বর' মহাদেবের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। কার্ত্তিক মাসে এখানে 'অলর্ক-চতুর্দ্দশীর' মেলা হইয়া থাকে। ইহার নিকটবর্ত্তী ঘাট পূর্ব্বে ভদনী' বা 'ভদৈনীঘাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ভদনী বোধ হয় ভদ্রেশ্বরের অপভ্রংশ সংক্ষিপ্ত শব্দ হইবে। এই ভদৈনীঘাটের পার্শ্বে পূর্ব্বে 'পরেশনাথ ঘাট' বা 'পার্শ্বনাথ ঘাট' ছিল, এক্ষণে

সে নামের অস্তিত্ব নাই। তবে ঘাটের ধারে জৈন-দেবালয় এখনও আছে।

রলামিশ্র ঘাট ও বাজীরাও ঘাট ঃ—

অসি হইতে উত্তরদিকে প্রথমেই যে বিরাট প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 'রলা' বা 'ললামিশ্রের' ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, মহারাজ রণজীৎ সিংহ যাঁহাকে বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়া সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দিবার ভার দিয়াছিলেন, তিনি তাহা হইতে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া নিজ নামে এই ঘাট ও ঘাটের উপর এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধুনা এই অট্টালিকা ও ঘাট 'রেঁওয়া মহারাজের' সম্পত্তি। সেই কারণ কেহ কেহ 'রেওয়া ঘাট'ও বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই 'রলামিশ্র-ঘাট' নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ইহা 'ভদনী' বা 'ভদৈনী-ঘাট' বলিয়া পরিচিত ছিল। কাশীর প্রারম্ভকাল হইতে এইরূপ কত ঘাট যে নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার কত ঘাট যে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। যখন যে অংশ স্বনামধন্য পুণ্যাত্মার অধিকারে আসিয়াছে, তখন তাঁহারই নামে সেই অংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। রলামিশ্র-ঘাট রেঁওয়াধিপতির অধিকারে আসিলেও এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট মহারাজের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। এই রলামিশ্রের ঘাটসংলগ্ন আর একটী ঘাট 'বাজীরাও-ঘাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুনার 'বাজীরাও পেশয়া' এই ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাকেও কেহ কেহ রলামিশ্রের ঘাট বলিয়া থাকে। যাহা হউক ইহাও এক্ষণে রেঁওয়া

মহারাজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এই ঘাটদ্বয়ের উপরে দুর্গ-সদৃশ সুন্দর প্রকাণ্ড সৌধ বিরাজিত রহিয়াছে। সৌধপ্রান্তদ্বয় প্রস্তরনির্ম্মিত বিশাল স্তম্ভ-সমন্বিত।

তুলসীঘাট :—

'তুলসীঘাট' পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার উত্তর পার্শ্বেই অবস্থিত। হিন্দিভাষার অমর দার্শনিক কবি হিন্দি রামায়ণকার পরমভক্ত গোস্বামী 'তুলসীদাসের' নামে ইহা প্রসিদ্ধ। ভক্তচূড়ামণি তুলসী-দাসগোস্বামী উত্তরকালে এই স্থানেই আপন সাধন ভজন করিয়া-ছিলেন এবং এই স্থান হইতেই তাঁহার পূতলেখনী-প্রসূত রাম-কথামৃত দোঁহাবলী প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্তকবির স্মৃতি-সৌন্দর্য্য ব্যতীত ঘাটের দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। ঘাটটী সাদাসিধা প্রাচীন ঢংএ নির্ম্মিত। ঘাটের উত্তরদিকে একটী অতি সাধাবণ বাটীর মধ্যে তিনি বাস করিতেন। তাহাই তাঁহার পবিত্র মন্দির। সে গৃহ এখনও অনেকেই ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া থাকেন। গৃহমধ্যে তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা ও কন্থা আদি অনেক দ্রব্য এখনও অতি যত্নে রক্ষিত আছে। ভক্তিবান রামায়ৎ বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে মহাপুরুষ হিন্দিভাষায় এমন অমূল্য রত্নরাজী রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা হিন্দিভাষাবিদ্ সকলেই অতি ভক্তি-গদগদ হৃদয়ে নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই পবিত্র সাধন-পীঠের প্রকৃত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মাত্মাই কিছু করেন নাই। কাশীবাসী জনসাধারণের এ বিষয়ে মনো-যোগী হইয়া অগ্রসর হওয়া বিধেয়। গোস্বামীজী ১৬৩১ সম্বতে

রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সন ১৬৮০ সম্বতে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। ইং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ৩০০ তিনশত বর্ষ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

অসিমাধবাদি কতিপয় প্রাচীন লুপ্ত ঘাট ঃ—

তুলসীঘাটের নিকটেই 'অসিমাধবের' ঘাট। কিন্তু এই ঘাটটী অধুনা তুলসীঘাটের নামেই উক্ত হইয়া আসিতেছে প্রাচীনকাল হইতে ঘাটের যে সকল নাম ছিল, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অসি হইতে বরণা পর্য্যন্ত পুরাণ-প্রসিদ্ধ কতিপয় ঘাট ব্যতীত প্রায় সমস্ত গুলির নামই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। অনেকগুলি ঘাট এরূপে নষ্ট হইয়াছে যে, তাহার ভগ্নাবশেষ ইষ্টক-প্রস্তরাদি চিহ্নসহ তাহার সেই প্রাচীন নামটীও কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে। 'পরেশনাথ ঘাট', 'অক্রুর ঘাট', 'বৈদ্যনাথ ঘাট', 'নির্জ্জলী ঘাট', 'নির্ব্বাণী' ও 'হিঙ্গু' আদি প্রাচীন ঘাটগুলির কোন চিহ্নই নাই অথচ তাহাদের স্মরণার্থে এখনও স্থানীয় সামান্য সামান্য মেলা হইয়া থাকে; এবং উপরে কোন কোন ঘাটের নামানুসারে যে সকল মন্দিরাদি আছে, তাহাতেই ইহাদের পূর্ব্ব-অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ জৈন-তীর্থাঙ্কর 'পরেশ-নাথের' ঘাট নাই, কিন্তু তাঁহার মন্দির আছে। 'বৈজনাথের' মন্দির আছে, কিন্তু ঘাটের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ শিব-চতুর্দ্দশীর দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। 'নির্জ্জলীঘাটের' নামটী পর্য্যন্ত কালস্রোতে জলাঞ্জলি হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে মেলা হয় পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠমাসে ভৈমী-একাদশীর সন্ধ্যার সময়ে এখানে মহতী

কাশী গঙ্গা-স্নান। (১৮০ পৃষ্ঠা।

মেলা হইত, কিন্তু সে মেলা এখন বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন দশাশ্বমেধ হইতে প্রায় সকল ঘাটে প্রাতঃ-কাল হইতেই মেলার মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এক সময় কাশীতে থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে নির্জ্জলা একাদশী করেন, অপরাহ্নকালে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে এই ঘাটে আনয়ন করতঃ স্নান করাইয়া তাঁহার চৈতন্য আনয়ন করেন। সেই কারণ এখানকার লোকে প্রাচীনকাল হইতে এই ভীম-সেনী একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করিয়া সায়াহ্নে এই ঘাটে স্নান করিয়া যাইত। কিন্তু সে ঘাটের বিলোপ হওয়ায় এখন যে কোনও ঘাটে সকলে স্নান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই ঘাটে মেলা-উদ্দেশ্যে গঙ্গায় সন্তরণ করিয়া পরপারে যাইবার জন্য ভয়ানক প্রতিযোগিতা হইত। এখনও সে প্রতিযোগিতা দশাশ্বমেধ ও মুন্সিঘাট আদি হইতেই হইয়া থাকে। হিন্দু মোসলমান সকলেই এই প্রতিযোগিতায় এখন অগ্রসর হয়। 'অহল্যা' ও 'মুন্সিঘাট' হইতে সে দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম!

কলঘাট ও জানকীঘাট ঃ—

কলঘাট—এই স্থান হইতে 'ওয়াটার ওয়ার্কসের' (Water works) কয়েকটী সুবৃহৎ নল 'পাইপ' গঙ্গার সলিলমধ্যে নিমজ্জিত আছে। কাশীর জলের কলের জন্য এই স্থান হইতেই জল, গৃহীত হইয়া থাকে। এই জল ভেলুপুরার নিকটবর্ত্তী 'পম্পিং ষ্টেসনে' পরিষ্কৃত হইয়া সহরময় প্রতিগৃহে নিত্য প্রদত্ত হইতেছে। প্রায় ৩০ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত ঘাটগুলির সহিত রামসীতার মন্দিরদ্বয়ও বিনষ্ট করিবার

জন্য কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ মনস্থ করেন এবং সে কার্য্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ অগ্রসরও হন। এই কথা জানিতে পারিয়া কাশীবাস সাধারণ হিন্দুগণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আবাল বৃদ্ধ যুবকগণ যষ্টি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া তখনই মন্দির-রক্ষার জন্য মন্দিরসমীপে উপস্থিত হয়। এদিকে দুষ্ট ব্যক্তিগণ অবসর বুঝিয়া 'বেঙ্গলব্যাঙ্ক' প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, ক্ষণকালের জন্য চতুর্দ্দিকে এক ভীষণ হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় যে সেই ভয়ানক দাঙ্গায় কত যে খুন জখম হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই। পরে অতি কষ্টে গবর্ণমেণ্ট সে দাঙ্গা মিটাইয়া দেন ও রামসীতার পবিত্র মন্দির কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। এই কলঘাটের নিকটেই 'সীতা' বা 'শ্রীজানকী ঘাটের' নূতন সংস্কার হয়। সুরসরের রাণী এই ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন। ঘাটের উপর রাণীর মন্দির বাড়ী আছে। ঘাটের নিকট বহু অট্টালিকা ও শিবালয় শোভিত রহিয়াছে

বৎস্যরাজঘাট ঃ—

পূর্ব্বোক্ত কলঘাট ও জানকীঘাট হইতে অন্য কয়েকটী ভগ্ন ঘাটও অধুনা বৎস্যরাজঘাট বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। এই ঘাটগুলিরও অবস্থা অতি শোচনীয়, কোনটীর সামান্য অস্তিত্ব আছে, আবার কোনটীর চিহ্নমাত্রও নাই। এখানে ঘাটের সোপানশ্রেণীও অধিকাংশ নাই, ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জানকীঘাটের পরেই 'ছেদীলালের' নামে একটী 'জৈন-মন্দির' আছে। তাহার পর অতি জীর্ণ অট্টালিকা ও সোপান-বিশিষ্ট 'রায়সাহেবের' ঘাট, অনন্তর 'ইমলিয়া ঘাট,' 'প্রভুদাসের ঘাট'

'বংস্যবাজ ঘাট'; কিন্তু এই সকল ঘাটই এক্ষণে এক কথায় :
.স্বরাজঘাট বলিয়া পরিচিত।

গবালয়ঘাট ঃ—

শিবালয়ঘাট কাশীর ইতিহাসে একটী অতি প্রসিদ্ধ ও
রণীয় ঘাট। মহারাজ বলবন্ত সিংহের পক্ষ হইতে বৈজনাথ
শ্র দ্বারা প্রথমে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, পরে মহারাজ
ং সিং এর সময় কাশীস্থিত এই প্রাসাদ অধিকতর সুন্দরভাবে
স্কৃত হয়। প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে বহু শিবমন্দির পূর্ব্ব হইতেই
তিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অদ্যাবধি ইহা 'শিবালয়' নামে উক্ত হইয়া
াসিতেছে। অট্টালিকাটী গঙ্গার ধাবে উত্তর দক্ষিণে বহুদূর
র্য্যন্ত বিস্তৃত। বাহ্য দৃশ্য দেখিতে কতকটা সেকালের দুর্গের
নুরূপ। উত্তর অংশে বৃহৎ তোরণ-সমন্বিত উচ্চ অট্টালিকা।
না যায়, এই অংশেই মহারাজ চেৎ সিং সময় সময় কাশীবাস
রিতেন। তোরণসম্মুখে সোপানসম্বদ্ধ সুন্দর ঘাট গঙ্গাগর্ভে
মে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণদিকে দুর্গানুরূপ সেই
দীর্ঘ প্রাচীরপাদে সোপানশোভিত কোনও ঘাটের চিহ্নমাত্রও
খন নাই। কেবল গঙ্গামৃত্তিকাজাত উচ্চ তীরভূমি, তাহাও বর্ষার
ফীত গঙ্গাজলে প্রতি বৎসর সমাহিত হইয়া যায়। তখন
নৌকারোহণে অনেকেই অট্টালিকাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে
ারেন। বর্ষাকালে সেই সৌধস্থ তোরণপার্শ্বে প্রাচীরসংলগ্ন
প্রস্তরখণ্ডে বহু নৌকা বাঁধা থাকে। যখন মহারাজ চেৎ সিংহ
দৈব-দুর্ব্বিপাকে 'ওয়ারেণ হেষ্টিংস' কর্ত্তৃক এই শিবালয়মধ্যে অব-
রুদ্ধ হইয়া পড়েন, তখন তিনি অনন্য-উপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে

অতি দুঃসাহসিকভাবে এই উত্তরস্থিত জানালা হইতে সপরিবারে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নিম্নে কয়েকখানি নৌকার উপর পতিত হন ও তখনই ছদ্মবেশে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। শিবালয়-স্থিত সেই জানালা তিনটী দেখিতে দেখিতে এখনও কত লোকে কত অতীতস্মৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ প্রাসাদের উত্তরাংশ যেমন মহারাজ চেৎ সিংহের পলায়ন-প্রসঙ্গ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সেইরূপ দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সৌধাংশও আর এক ঐতিহাসিক ঘটনায় এখনও সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের শেষ মোসলমান-সম্রাট দিল্লীশ্বরের বংশধর 'সাজাদাগণ' বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া শিবালয়ের এই দক্ষিণ সৌধে বহুদিন হইতেই অবস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। বেনারসের 'কলেক্‌টার' সাহেব বড়-লাটের এজেণ্টরূপে তখন তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। সাজাদাগণের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হইয়া ক্রমে তাঁহারা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং বৃটীশ-গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বা ভাতা প্রত্যেকের অংশে এখন এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় এখানে সেখানে বাস করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিগত 'দিল্লীদরবার' উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে একজন দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য সরকারে আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু বচন-চতুর সম্রাট-প্রতিনিধি 'কর্জ্জন' বাহাদুর নাকি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "যে দরবারে এক সময় আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাধীনভাবে অধিনায়কতা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে আপনারা আজ কোন মুখে নিতান্ত হেয় দর্শকরূপে উপস্থিত হইতে অভিলাষ করিয়াছেন, এরূপ প্রস্তাব মনে উদিত

হইবার পূর্ব্বেই আপনাদের লজ্জা অনুভব করা উচিত ছিল।" যাহা হউক তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে দুঃখ না করিয়া থাকা যায় না।

বেনারস-মহারাজ শ্রীমান্ প্রভুনারায়ণ সিংহ সন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অর্দ্ধ-স্বাধীনতা বা সামন্তরাজ্যের অধিকার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। 'রামনগর', 'ভদোঁহী' ও কেরাযঙ্গরোর আদি পরগণার স্বতন্ত্র শাসনাধিকার পাইয়াছেন। মহারাজ তেরটী তোপের সম্মানও লাভ করিয়াছেন। বৃটিশ আধিপত্যের সূত্রপাত হইতে কোন জমিদারই এপর্য্যন্ত এরূপ সম্মান ও অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাজ বাহাদুর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই 'শিবালয়' নামক প্রাচীন সৌধটী পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ক্রয় করিয়া তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়া লইয়াছেন। শিবালয়ের মন্দিরাদির জীর্ণোদ্ধারও করিয়াছেন।

এই ঘাটের পরেই কিয়ৎপরিমাণ স্থান এমনই পড়িয়া আছে, তাহাতে উপস্থিত কোনরূপ বাঁধা ঘাট নাই। একটী নেপালী পরিবার চিরস্থায়ীরূপে এই স্থানে বসবাস করিবার কারণ কেহ কেহ ইহাকে 'নেপালী ঘাট' বলিয়াও উল্লেখ করেন।

দণ্ডীঘাট, হনুমানঘাট ও মহাপ্রভুর বৈঠক :—

'দণ্ডীঘাট' পূর্ব্বোক্ত 'নেপালীঘাটের' পরেই অবস্থিত। ঘাটটী অতি প্রাচীন, দণ্ডী-সন্ন্যাসীরা এখানে নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। এই ঘাটের উপরে কয়েকটী মঠ আছে, তাহাতে সন্ন্যাসীরা অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ 'বল্লভা-

চায্যের' নামে একটী প্রসিদ্ধ বাটীও আছে। ইহার পরেই অতি প্রাচীন 'হনুমান ঘাট' ও তাহার সোপানশ্রেণী। ঘাটের উপর নাগা-সাধুদিগের সুন্দর অট্টালিকা শোভিত রহিয়াছে। এখানে বড় হনুমানজীর সুন্দর আছে। পার্শ্বেই 'মহাপ্রভুর বৈঠক' এখানেও মহাপ্রভু শ্রীমৎ চৈতন্যদেব অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্মশানঘাট বা হরিশ্চন্দ্রঘাট ঃ—

'হনুমানঘাটের' পরেই কাশীর অতি প্রাচীন 'শ্মশান ঘাট', মহারাজ 'হরিশ্চন্দ্রের ঘাট' বলিয়াও ইহা প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ঘাটের মত ইহা প্রস্তরদ্বারা সোপানবদ্ধ নহে, এ ঘাটে লোক জনও তত অধিক স্নান করে না, তবে শ্মশানকার্য্যে এখনও ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি কাশীর মধ্যে দুইটী শ্মশানঘাট, একটী মণিকর্ণিকার পার্শ্বে ও অন্যটী এই হরিশ্চন্দ্র-ঘাট। শুনিতে পাওয়া যায় এইটীই কাশীর প্রাচীন ও প্রথম শ্মশান বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্মশানের সেই চিরপ্রসিদ্ধ সংসার-বৈরাগ্যের গম্ভীরভাবপূর্ণ উন্মুক্ত দৃশ্য মণিকর্ণিকা অপেক্ষা এই স্থানেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। মানবের শেষ শান্তির লীলা-ভূমি—হিংসা, দ্বেষ, গর্ব্ব ও অভিমান-পরিবর্জ্জিত—উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন সকল উপাধিরই সমন্বয় ক্ষেত্র, ইহা একটী মহান পুণ্যময় প্রাচীন তীর্থ; বিলাস-আভরণবিহীন এমন পবিত্র স্থান দেখিলে চিত্ত তৎক্ষণাৎ সংসারের সকল ছায়াময়ী খেলা ভুলিয়া যায়, হৃদয় সহসা গভীর পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। শ্মশানমাত্রেই এই অপ্রতিহত অভিনব শক্তি প্রত্যক্ষীভূতা হইলেও মহাশ্মশান হরিশ্চন্দ্রঘাটের বৈচিত্র্য বস্তুতই অদ্ভুত! যে ঘাট সেই স্মরণা-

কর্ত্তৃক সময় সময় সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, কেবল কেদারনাথ শিবলিঙ্গই দৈবক্রমে কোন বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক কখনও কলঙ্কিত হয় নাই।

কেদারনাথের মন্দির-গাত্র শ্বেত ও রক্তবর্ণ ঊর্দ্ধলম্ব রেখাকারে সুন্দররূপে চিত্রিত। এই ধরণে মন্দির চিত্রিত করা প্রায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মূল মন্দির ব্যতীত গণেশ লক্ষ্মীনারায়ণ, অন্নপূর্ণা, ভৈরবনাথ, চিন্তামণি বিনায়ক আদি বহু দেবমূর্ত্তি মন্দিরের চারিদিকে ও ঘাটের উপর স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে অবস্থিত আছেন। সোপানশ্রেণীর নিম্নদেশে একটী কূপ বা কুণ্ড আছে, তাহা গৌরীকুণ্ড বা মানসতীর্থ বলিয়া অভিহিত। কথিত আছে, পুরাকালে হিমসুতা 'গৌরী' মানস করিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, সেই কারণেই ইহা উক্ত নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ত্রিবিধ জ্বরহর, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে শ্রীকেদারকৃপায় তাহার অবশ্যই মুক্তি হইয়া থাকে।

এই কেদারঘাটের নিকটেই তাহিরপুরাধিপতির সুবৃহৎ অট্টালিকা বিদ্যমান আছে।

চৌকিঘাট ও সোমেশ্বরঘাট :—

কেদারঘাটের পরই 'চৌকিঘাট' নামে একটী ক্ষুদ্র ঘাট আছে। ঘাটের উপর একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ, সেই বৃক্ষমূল প্রস্তরাদি দ্বারা সুন্দর করিয়া বাঁধান। তাহাতে নাগ-দেবতার মূর্ত্তি আছে।

ইহার পর 'সোমেশ্বরঘাট'। ঘাটের উপর 'সোমেশ্বর-দেবমন্দির' অবস্থিত।

মানসরোবর, তিলভাণ্ডেশ্বর ও মানসরোবরঘাট ঃ—

কেদারনাথের মন্দির হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মানসরোবর নামে একটী প্রকাণ্ড সুগভীর জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। সরোবরমধ্যে জল অতি সামান্য, বর্ষাকালে কিছু বাড়িয়া থাকে। মহারাজ মানসিংহ এই সরোবরটী একবার ভাল করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আবার উহার অনেক স্থল জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার চারিদিকে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি, মন্দিরে ও বাহিরে পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 'রাম-লক্ষণের' মন্দিরই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই মন্দির প্রান্তে 'দত্তাত্রয়ের' একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক 'মানেশ্বর' মহাদেবও তাহার সুন্দর মূর্ত্তির এই সরোবরের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের কিয়দ্দূর পশ্চিমে প্রসিদ্ধ 'তিলভাণ্ডেশ্বরের' অতি প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে প্রায় তিন হাত উচ্চ তিলভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রত্যহ তিল তিল পরিমাণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটী অতি প্রাচীন। অনেকে বলেন, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে কোন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দির-গাত্রস্থিত কারুকার্য্য সকল ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটেই এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে 'বীরভদ্র' নামে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত মানবাকৃতি এক প্রকাণ্ড মহাদেব মূর্ত্তি মৃন্মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার কটীদেশ হইতে কেবল উত্তমাঙ্গই প্রায় তিন হস্ত পরিমাণ হইবে। একটী বাহু একেবারে নাই, ভাঙ্গিয়

রহিয়াছে। মূর্ত্তিটী দেখিলে নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ ইহা বৌদ্ধ-সময়ের খোদিত বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক এরূপ মূর্ত্তি অধুনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরগাত্রেও এই রূপ আর একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির সমসাময়িক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহার নিকটেই মুক্তেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে এইরূপ আরও একটী মূর্ত্তি আছে।

এই 'মানসরোবরের' প্রায় সম্মুখেই গঙ্গার ধারে 'মানসরোবরঘাট' বলিয়া আর একটী সুন্দর ঘাটও মহারাজ মানসিংহ বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু কালধর্ম্মে এক্ষণে তাহা ধ্বংস ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

নারদাদি কতিপয় প্রাচীন সাধারণ ঘাটঃ—

ইহার পর রাজা 'অমৃতরাওঘাট' প্রসিদ্ধ। তবে ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বর্ণনা কিছুই নাই। 'রাজা-অমৃতরাওঘাটটী' 'রাজা-বিনায়কঘাট' বলিয়াও পরিচিত। এই ঘাটটী 'পেশওয়ার' নায়েব রাজা বিনায়ক রাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘাটটী প্রস্তর দ্বারা সোপান-সংবদ্ধ। ঘাটের উপর রাজার অতিথিশালা আছে।

এই ঘাটের পরেই 'ধোবীঘাট'। এখানে কাশীর রজকগণ বস্ত্র-ধৌত করিয়া থাকে। ঘাটের সোপান নাই। এখানে কেহই স্নান-আহ্নিকও করে না। ইহা রজককুলেরই যেন নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ইহার পর 'অন্নপূর্ণাঘাট'। কেহ কেহ 'গঙ্গামহল' বলিয়া ইহার উল্লেখ করেন। এই ঘাটেরও বিশেষ বর্ণনীয় কিছুই নাই।

উক্ত অন্নপূর্ণাঘাটের উত্তরে 'পাণ্ডে' বা 'পাঁড়েঘাট'। কাশীর প্রসিদ্ধ পাণ্ডাদিগেরই ইহা অধিকারভুক্ত। এই ঘাটের উপরেই একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। তাহার মূলদেশে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই গঙ্গার ধারে সুন্দর লোহিত বর্ণে রঞ্জিত একটী শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

চতুঃষষ্টি যোগিনীঘাট :—

সাধারণের নিকট ইহা 'চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট' বলিয়া পরিচিত। ঘাটটী বহুদূর পর্য্যন্ত পাথর দিয়া বাঁধান। বঙ্গের শেষ স্বাধীন ও অতি পরাক্রমশালী কায়স্থ-নরপতি বীরশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই ঘাটটী বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘাটের উপরেই অনতিদূরে চতুঃষষ্টি-যোগিনী-পরিবৃতা 'মহিষ-মর্দ্দিনী 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ও 'শ্রীশ্রীভদ্রকালীর' যে মন্দির এখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কাশীতে চতুঃষষ্টি-দেবীগণের ইহা অতি প্রাচীন 'দেবীপীঠ'। কাশীখণ্ডের ৪৫ অধ্যায়ে যোগিনীদেবীগণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীভদ্রকালীর মূর্ত্তিটী প্রতাপাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শক্তি-উপাসক বঙ্গীয় কায়স্থ-কুলরবি প্রতাপাদিত্য যথার্থই শক্তি-আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনি অন্তরে বাহিরে অকপটে শক্তি-সাধক ছিলেন। তাঁহার রাজধানী যশোহর* নগরে তিনি নিজ অভীষ্টদেবী 'যশোরেশ্বরী' কালীমূর্ত্তি

* প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর বা 'যশোর' নগর। উহা যশোর-জেলার (Dist. Jessore) অন্তর্গত 'যশোর' নহে। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত "মধু

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহকর্ত্তৃক প্রতাপ পরাজিত ও বন্দিকৃত হইলে, মানসিংহ যশোরেশ্বরী শ্রীশ্রীকালী-প্রতিমাখানিকে তাঁহার নিজ রাজধানী 'অম্বরে' বা 'আমেরে' লইয়া যান ও তথায় যথারীতি দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কাশীধামের এই চতুঃষষ্ঠী-যোগিনী-পরিবৃতা মহিষমর্দ্দিনীর সম্মুখে ভদ্রকালীর মূর্ত্তিটীও প্রতাপাদিত্যের সেই একনিষ্ঠ শক্তিসাধনার অন্যতম পরিচয় স্থল। তখন কাশীরাজ্য মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গগৌরব প্রতাপের জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে বা যেন তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, তাঁহার অভীষ্টদেবী ও তাঁহার শত শত কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই কর্পূরের মত কোথায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল, চতুঃষষ্ঠীদেবীর দেবোত্তর সম্পত্তিগুলিও যাহা দেবোদ্দেশ্যে তদ্‌কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল প্রতিবেশীকর্ত্তৃক সহজেই অধিকৃত হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, উদয়পুরাধিপতি মহারাণা-বংশের ভূতপূর্ব্ব কোন নরপতির সময়ে পূর্ব্বোক্ত চতুঃষষ্ঠী-মন্দিরের উত্তরদিকস্থিত কতিপয় দেবত্তর সম্পত্তি, তাহাদের 'রাণামহলের' অন্তর্গত হইয়া "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই প্রসিদ্ধ নীতিবাক্যের সার্থকতা করিয়াছে। অধুনা চতুঃষষ্ঠীর একটীমাত্র যোগিনীও এই মন্দিরমধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, দুই

"ট" পরগণার মধ্যে তাহা অবস্থিত। প্রতাপের সেই প্রসিদ্ধ রাজধানী এক্ষণে সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে ও ভীষণ ব্যাঘ্রাদির আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার অভিষ্টদেবী 'যশোরেশ্বরী' সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। এক্ষণে সেস্থান "ঈশ্বরীপুর" বলিয়া পরিচিত।

একটী রাণামহলের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহাও অধুনা আর প্রত্যক্ষীভূতা হয় না। কেবল মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তিটী চতুঃষষ্ঠীর পরিচয়স্বরূপ এখনও মন্দিরের শোভা-সম্পদ রক্ষা করিতেছে, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মাণের সময় তাঁহার নির্বাচিত পাণ্ডাগণের বংশধরগণ এখনও তাহাব উপভোগ ও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মন্দির-সংলগ্ন বাটীতেই পাণ্ডারা বংশ-পরম্পরায় বসবাস করিয়া সেই ভদ্রকালীর ও চতুঃষষ্ঠীআদি দেব-দেবীর সেবা করিতেছেন। মন্দিরটী বহুদিন যাবৎ জীর্ণ হইয়াছিল, সম্প্রতি প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতিবংশের অন্যতম (টাকীর) প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীমান্ সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় তাহার সংস্কাব করিয়া দিয়া প্রতাপের কীর্ত্তি-সংরক্ষণে সহায়তা করিয়াছেন। চতুঃষষ্ঠীর ঘাটটীও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বেনারসের মিউনিসিপ্যালিটীর আদেশ লইয়া তাহারও সংস্কার করিয়া দিলে, প্রতাপকীর্ত্তি চির-স্মরনীয় হইয়া থাকে। কাশীতে বাঙ্গালীর এমন প্রাচীনকীর্ত্তি রক্ষাকরা নিজনামে নূতনকীর্ত্তি-স্থাপনা অপেক্ষা প্রশংসনীয়। কাশীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকলাপ যতই রক্ষা হয়, ততই বাঙ্গালীর প্রকৃত গৌরবের কথা! যাহা হউক শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—আশ্বিন মাসের নব-রাত্রি উপলক্ষে চতুঃষষ্ঠী যোগিনীদের এখানে পূজা করিলে সাধকের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাসী হইয়া রাত্রি-জাগরণ করিলে, মহতী সিদ্ধি হয়। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা-প্রতিপদে যাত্রা করিলে ক্ষেত্রবিঘ্ন শান্তি হয়।

রাণামহলঘাটঃ—

রাজপুতানাবাসী মহারাণার বংশধর উদয়পুরাধিপতি এই ঘাটটীর বর্ত্তমান অধিকারী। প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে উদয়পুরের কোন ধর্ম্মপ্রাণ মহারাণা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই কারণ ইহা 'রাণামহলঘাট' বলিয়া বিখ্যাত। ঘাটের প্রস্তর বিনির্ম্মিত সোপগুলির অধিকাংশ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া গিয়াছিল, কেবল 'মহল' বা রাজ-অট্টালিকার দ্বার-সম্মুখস্থ সোপানটী অপেক্ষাকৃত অক্ষুণ্ণ ছিল। উদয়পুররাজের প্রতিনিধি যিনি এই সম্পত্তি দেখিবার জন্য এখানে নিযুক্ত আছেন, তিনি কাশীবাসী জনসাধারণের স্বাক্ষর করাইয়া একখানি আবেদন-পত্র রাজসরকারে প্রেরণ করিয়া ঘাটের পুনঃসংস্কারে যত্নবান হইয়াছিলেন। মহামণ্ডলের শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামীজী মহারাজও এবিষয়ে মহারাণাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যাহা-হউক রাণামহলের ও ঘাটের পুনরায় সংস্কার হইতেছে।

মুন্সীঘাট বা দ্বারভাঙ্গাঘাট ঃ—

বেরারনিবাসী মুন্সী শ্রীধরপ্রসাদ কর্ত্তৃক এই ঘাটটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা ইহার দক্ষিণাংশ মহারাজ দ্বারভাঙ্গা কর্ত্তৃক অধিকৃত। ঘাটের সোপান ও তাহার সম্মুখস্থিত প্রাসাদপ্রতিম সুন্দর অট্টালিকাটী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও দেখিলে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ভূতপূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা-নরেশ মহারাজ লক্ষ্মী-প্রসাদ নামমাত্র মূল্যে ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহা-রাজ যথেষ্ট স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, ঘাটের দিকে সামান্য পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা রাখিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। কাশীবাসী বহু সাধু সন্ন্যাসী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নিত্য সন্ধ্যাকালে 'দশাশ্বমেধঘাট' হইতে 'অহল্যাবাইঘাট' পর্যন্ত বিস্তৃত সোপানের উপর পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার পরেই অপরিচ্ছন্নতা হেতু মুন্সীঘাট বা দ্বারভাঙ্গাঘাটে বড় কেহ যাইতে অগ্রসর হন না। এই ঘাটের প্রতি মহারাজের সামান্য দৃষ্টি থাকিলে এটীও সাধারণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ স্থানে পরিণত হইতে পারে।

অহল্যাবাইঘাট ঃ—

অনন্ত-কীর্ত্তিমতী প্রাতঃস্মরণীয়া ইন্দোরেশ্বরী অহল্যাবাই ১৭৬৪ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার রাজত্বসময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পথ, ঘাট, কুণ্ড, মন্দির, ধর্ম্মশালা ও অন্নক্ষেত্র বা ছত্র প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পুণ্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অহল্যাবাইঘাট সেই সকলেরই অন্যতম। ঘাটটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি পাথর দিয়া সুন্দররূপে বিস্তৃত করিয়া বাঁধান। ঘাটের উপর বহু অট্টালিকা ও মন্দিরের মধ্যে অহল্যাবাইয়ের ধর্ম্মশালা ও নহবৎখানা প্রতিষ্ঠিত। নিত্য সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ সানাইওয়ালা যখন এই নহবৎখানার সম্মুখে বসিয়া গৌরী, শ্রী, পূরবী, পুরিয়া, ইমনকল্যান প্রভৃতি মধুর-রাগ-রাগিনীগুলির আলাপ করিতে থাকে, শত শত সম্ভ্রান্ত শ্রোতা ঘাটের উপর নানা স্থানে বসিয়া বা বিচরণ করিয়া তাহা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে থাকেন, তখন মনে হয়, বুঝি বা কোন্ পুণ্যফলে সহসা আজি স্বর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পার্শ্বে কল-কল-ভাষিনী পতিত-পাবনী গঙ্গা পুণ্যবতী অহল্যাবাইয়ের প্রস্তরগ্রথিত পূত-রম্য-ঘাট স্পর্শকরতঃ যেন সেই সৌভাগ্যবতী

গণীর কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন, আর পরে সেই প্রাণ-মন-মুগ্ধকারী বিশুদ্ধ সুরলয়-যুত অপূর্ব্ব ও তুলনীয় সানাই-ধ্বনি সতত্‌ই শ্রবণ-পথে অমিয় আনন্দধারা ঢালিয়া দিতেছে, সন্ধ্যাসমাগমে শুক্ল-রজনীর আগমন-পরিজ্ঞাপক আলোকোজ্জ্বল শশধর পূর্ণগগনে বিরাজিত, তাহা আবার ভাগীরথীবক্ষে বীচিবিক্ষেপে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন প্রকৃতই অসংখ্য চন্দ্রমার অপূর্ব্ব উল্লাসভরে নর্ত্তিত, এবং গঙ্গার সেই পবিত্র তটে কত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, সাধু সজ্জন, মহাত্মাগণ তন্ময়ভাবে সন্ধ্যা-নিরত। সন্ধ্যার সময় এই ঘাটের উপর হরিকীর্ত্তন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও নানা ধর্ম্মালোচনাও হইয়া থাকে। আহা, সে স্বর্গীয় শোভা, সে পূত-আনন্দ দর্শককে নিত্য কত যে অভিনব পুলকে পূর্ণ করিয়া তুলে, তাহা বস্তুতই অনির্ব্বচনীয়, তাহা উপভোগ ব্যতীত অনুমাত্রও উপলব্ধ হইবার নহে।

শীতলাঘাট ঃ—

উক্ত অহল্যাবাইঘাটের সংলগ্ন 'শীতলাঘাটও' অন্য ঘাটগুলি অপেক্ষা অল্প উল্লেখযোগ্য নহে। এ ঘাটটীও পাথর দিয়া সুন্দর বাঁধান। উপরে শুভ্র-ধবলিত একটী মন্দির-গৃহমধ্যে 'শীতলেশ্বর' মহাদেব ও 'শীতলাদেবী' বিরাজিত রহিয়াছেন। এই স্থানে কি প্রাতে কি সায়াহ্নে অসংখ্য নরনারীর নিত্য সমাগম হইয়া থাকে, সকলেই ঘাটের ধারে স্নান, সন্ধ্যা, আহ্নিক অথবা এইরূপ কোন নিত্যকর্ম্মে নিরত। উপরে বৃদ্ধ ও প্রবীন অনুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ মিলিত হইয়া নানা ধর্ম্মালোচনায় বিমল আনন্দ অনুভব করিতেছেন, আবার কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা সংসারের সকল

মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াও তাঁহাদের আজন্ম-পুষ্ট সংস্কারগুলি সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ধর্ম্মালোচনার অভিনয়ে দ্বেষ, হিংসা, পরচর্চ্চা ও পরকুৎসা-প্রচারকল্পে ইহাই যেন তাঁহাদের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়াছে—ইহাতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ আলোক ও অন্ধকারের যেন কি এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ক্ষেত্র হইয়াছে! অবিচলিত নেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন ও পর্য্যালোচনা করিলে এ স্থলে সাধারণের দেখিবার ও শিখিবার সামগ্রী যথেষ্টই পাওয়া যায়।

দশাশ্বমেধঘাট, কালীতলা ও কামরূপ মঠ ঃ—

কাশীর মধ্যে এই দশাশ্বমেধঘাটটীই যেন কাশীর কেন্দ্রস্থল। অসি-বরুণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বারাণসীর ভিতর এমন সুমনোহর ও জনাকীর্ণ স্থান আর কোথাও নাই। যে কেহ কাশীতে আসিবেন, একবার দশাশ্বমেধঘাটটী তাঁহার দর্শন করা চাইই। এই দশাশ্বমেধ ব্যতীত আর কোনও ঘাটে যাইবার জন্য এরূপ প্রশস্ত রাজপথ না থাকায়, প্রতীচ্য-প্রদেশবাসী পর্য্যটকগণও নিত্য প্রাতে ও সায়াহ্নে গাড়ি করিয়া আসিয়া এই ঘাট হইতেই নৌকা-বিহারে গঙ্গার সমস্ত ঘাট-শোভা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। রাজা, মহারাজ হইতে দীন দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলকেই এই স্থানে কোন না কোন দিন আসিতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত শীতলাঘাট ও অহল্যাবাইঘাট প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলেও এই ঘাট অতিক্রম করিয়া সকলকে যাইতে হয়। ঘাটের উপর "দশাশ্বমেধেশ্বর" মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। "দশহরেশ্বর" মহাদেবও এই ঘাটের উপর অবস্থিত। কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়, এক

... শীতলাদেবীর মন্দির। (১ ... পৃষ্ঠা)

(পূর্ব্বে যাহাকে ঘোড়াঘাট বলিত) তাহাও যে, সেইরূপ দশাশ্বমেধেরই অন্য অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ঘোড়াঘাট বা নবনির্ম্মিত দশাশ্বমেধঘাট বহুদিন হইতেই ধ্বংস হওয়ায়ও সাধারণের স্নানাদির পক্ষে অব্যবহার্য্য বোধে পরিত্যক্ত হওয়ায়, গো, মহিষ, বিশেষ অশ্বাদির জলপান ও তাহাদের স্নানকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, এখনও কাষ্ঠ, প্রস্তরাদি নানা সামগ্রীর আমদানি রপ্তানি ঐস্থানেই হইয়া থাকে। এই সমুদায় কারণে উহা ক্রমে 'ঘোড়াঘাট' নামেই পরিচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাণ্ডাগণ যাত্রী-সাধারণকে ক্রমে উহার দক্ষিণাংশেই লইয়া গিয়া দশাশ্বমেধের সংকল্প পড়াইতে থাকে, ফলে অধুনা প্রয়াগঘাট নামে পরিচিত দশাশ্বমেধের অংশমাত্রকেই যেন প্রকৃত সমগ্র দশাশ্বমেধ বলিয়া সকলে জানিয়া রাখিয়াছে। প্রয়াগঘাট বলিয়া পূর্ব্বে কোন ঘাট ছিল না, তবে শাস্ত্রে আছে—দশাশ্বমেধের এই অংশে স্নান করিলে গঙ্গা-গোদাবরী-সঙ্গম বশতঃ 'প্রয়াগসঙ্গমের' ফলই লাভ হয়, বহু যাত্রী এই ঘাটে আসিয়া শিরোমুণ্ডন ও পিতৃ-পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া থাকে, সেই কারণ ইহার এক অংশ 'প্রয়াগঘাট' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ আশপাশের অন্যান্য ঘাটসহ এই উভয় ঘাটই পূর্ব্বে দশাশ্বমেধঘাট বলিয়া পরিচিত ছিল। নবনির্ম্মিত দশাশ্বমেধ বা পূর্ব্বপরিচিত ঘোড়াঘাটের উত্তরাংশ এখনও অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত আছে। এই স্থান এখনও গো, অশ্ব ও মহিষাদির স্নানপান জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহার উত্তরে কিয়দংশে পাথরের ব্যবসাদারগণ পাথর নামাইয়া থাকে, সেই কারণ কেহ কেহ ইহাকে আবার 'পাথরঘাট' বলিয়া পরিচিত করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই দশাশ্বমেধের সম্মুখ-

স্থিত পথ দিয়া বাঙ্গালীটোলার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রবেশপথে বামদিকে একটী "কালীর মন্দির" এবং সম্মুখে প্রসিদ্ধ "কামরূপমঠ"। এই মঠের মঠাচার্য্য বাঙ্গালী, তীর্থনামা দণ্ডী, সন্ন্যাস-ধর্ম্মেই ইহাঁরা দিক্ষীত। মঠটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কয়েকজন দণ্ডী-সন্ন্যাসী এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। বিখ্যাত মহাত্মা শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীজী মহারাজ এই মঠেরই একজন প্রধান ব্রহ্মচারী শিষ্য।

ভূতেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর ও পাতালেশ্বর ঃ—

এই পথ ধরিয়া বাঙ্গালীটোলার মধ্যে প্রবেশ করিলে ভূতেশ্বর', 'পুষ্পদন্তেশ্বর', 'পাতালেশ্বর' প্রভৃতি বিখ্যাত দেব-মন্দির সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীখণ্ডে ইহাঁদের মাহাত্ম্য ও বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

শূলটঙ্কেশ্বর ও পুঁটীয়ার মন্দির ঃ—

দশাশ্বমেধঘাটে প্রয়াগতীর্থের উপর 'শূলটঙ্কেশ্বরের' মন্দির। মন্দিরটী বর্ষাকালে গঙ্গার জলে ডুবিয়া যায়। কোন কোন বর্ষে মন্দিরের চূড়ামাত্র জলের উপর জাগিয়া থাকে, নতুবা সবই তখন গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত থাকে। বর্ষার পর জল সরিয়া যাইলে সেই মন্দিরের মধ্যে গঙ্গামাটী পূর্ণ থাকে; তখন সেই মাটী কাটিয়া তবে বাবার দর্শন হয়। ইহার কিছু দক্ষিণে পুঁটীয়ারাজের মন্দির অবস্থিত, গৈরিক-রঞ্জিত মন্দিরটী অতি সুন্দর। মন্দিরের চারিদিকে যে বারাণ্ডা আছে তাহাতে সায়ংকালে বহু লোক আসিয়া বিচরণ করেন। বারাণ্ডার চারিদিকে কোন 'রেলিং' বা বেড়া নাই। তাহাতে সময় সময় নানা

দুর্ঘটনা হয়। পুটিয়া-মহারাণী যদি সেই মন্দিরের চারিধার পাথর দিয়া ঘেরিয়া দেন, তবে অনেক গো-ব্রাহ্মণ 'অপঘাত-মৃত্যু' হইতে রক্ষা পায়। তাঁহারও পুণ্য-কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি ঘাট বাঁধাইয়া দিয়া বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করিয়াছেন।

জ মবাড়ী ঃ—

দশাশ্বমেধঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চিমদিকে 'অসি' যাইবার পথে বিখ্যাত '<u>জঙ্গমবাবার</u>' আশ্রম বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গমবাবা দাক্ষিণাত্য-নিবাসী শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত মহান্তজী। তাঁহার বহু সহস্র শিষ্য-সেবক আছে, তন্মধ্যে সন্ন্যাসী-শিষ্য-পরম্পরায় মহান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া এ যাবৎ এই মঠ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান মহান্তজী সন্ন্যাসী হইলেও অধুনা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। কাশীর মধ্যে বিশেষ জঙ্গমবাড়ী মহল্লায় অধিকাংশ স্থাবর-সম্পত্তি তাঁহারই অধিকৃত। শুনা যায়, এতদ্ব্যতীত তাঁহার এক প্রকার তেজারতি (Banking business) ব্যবসাও আছে। বহু নর নারী শেষ বয়সে যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া কাশীবাসের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া জঙ্গমবাড়ীর মহান্তজীর নিকট তাহা জমা দিয়া থাকে। মহান্তজী তাহারই কুশীদস্বরূপ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিয়া সেই সকল ব্যক্তির শেষ কাশীবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

জঙ্গমবাড়ী বা জঙ্গম-মঠটী বহুবিস্তৃত। বহু শিবলিঙ্গ ও শিবালয় ইহার অন্তর্গত। বোধ হয় দুই সহস্রেরও অধিক শিবলিঙ্গ এই মঠের প্রাঙ্গণে ও তাহার চতুর্দ্দিকে রক্ষিত আছে, তদ্ব্যতীত এই মঠের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহান্তগণের অনেকগুলি

সমাধিও আছে। এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ রজতাবরণস্থিত এক একটী শিবলিঙ্গ সূত্রে গথিত করিয়া যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্কন্ধে ধারণ করিয়া থাকেন। বহু সন্ন্যাসী-শিষ্য সতত মঠের মধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাসের যেমন উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে, সেইরূপ বহু যাত্রী থাকিবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। তবে এস্থানে দক্ষিনী (মারাঠী) যাত্রীরই অধিক সমাবেশ ও প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক জঙ্গমবাড়ী যে সাধারণের একটী দেখিবার জিনিস সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মানমন্দিরঘাট:—

পূর্ব্বোক্ত ঘাটের অব্যবহিত উত্তরদিকে মানমন্দিরঘাট। ঘাটের উপরেই 'মানমন্দির' নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকা সুশোভিত। অনেকের দৃঢ় ধারণা অম্বরাধিপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক এই মন্দিব প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমাত্র। সাধারণের এরূপ ভ্রম হইবার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ এই সৌধটী সাধারণভাবে 'মানমন্দির' বলিয়া পরিচিত, দ্বিতীয়তঃ জয়পুর বা প্রাচীন অম্বররাজ্যের অধিপতিগণ বংশপরম্পরায় এই প্রসিদ্ধ সৌধটীরও উত্তরাধিকারী। মানসিংহ অম্বর-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি, মহাবীর ও কীর্ত্তিমান পুরুষ, সুতরাং 'মানমন্দিরে' তাঁহার নামের সৌসাদৃশ্য থাকায়, সাধারণে ইহাও মানকীর্ত্তি বলিয়া সহজেই ধরিয়া লইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অম্বরপতি মানসিংহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অযোগ্য পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে রাজ্য লাভ করিয়া উভয়েই ঘোর পানাশক্তি ও লাম্পট্য-দোষজনিত রাজ্য-পরিচালনায় অসমর্থ হইয়া অকালে
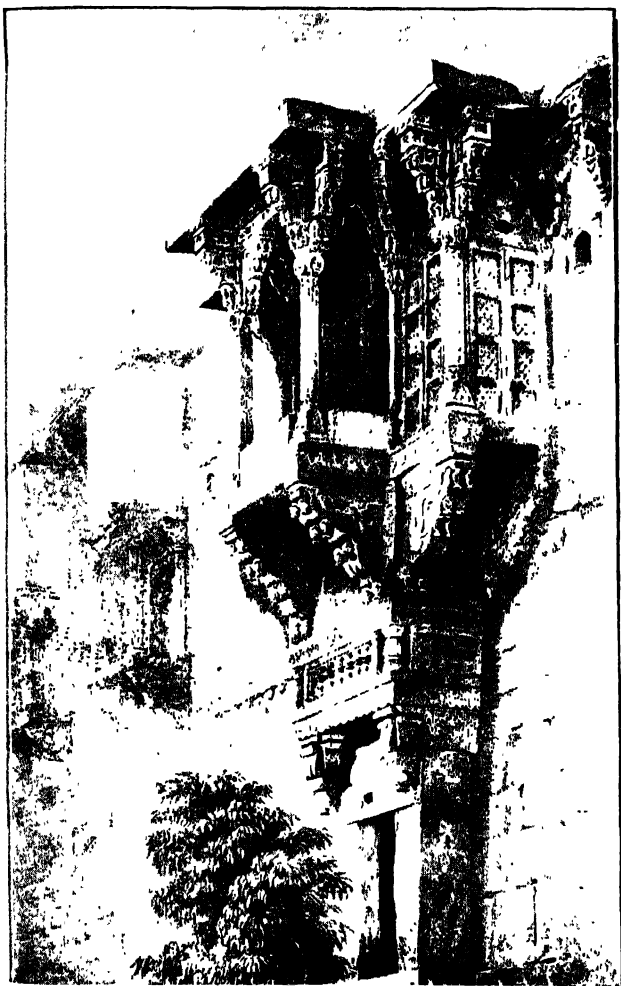
মানমন্দিরে প্রাচীন স্থাপত্যের আদর্শ। (২০৬ পৃষ্ঠা)

(১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ জে, প্রিন্সেপ কৃত 'বেনারস-ইলাষ্ট্রেটেড্ হইতে গৃহীত—মেঃ কার এণ্ড কোংর সৌজন্যে।)

পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দিল্লীসম্রাট জাহাঙ্গীর নিজ রাজপুতনী ভার্য্যা যোধাবাইয়ের প্ররোচনায় স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের সহোদর জগৎসিংহের পৌত্র জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। জয়সিংহই মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত বংশধর। তিনি অনতিকালমধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া দিল্লীশ্বরেরও ভীতির উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক দৈব-দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ পরে বিষণসিংহ অম্বর-রাজ্যে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদেরও মৃত্যু হইলে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দ্বিতীয় জয়সিংহ অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ইনি "শোবে জয়সিংহ" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরাক্রমে একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাজনীতি, সমরনীতি, ধর্ম্ম, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রভৃতি সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি নিজ নামে জয়পুর রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রাচীন অম্বররাজ্য জয়পুররাজ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

শোবে জয়সিংহ 'বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী' নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর সাহায্যেই বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্যোতিষাদি বিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তদানিন্তন দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহার অসাধারণ জ্যোতির্বিদ্যার পরিচয় পাইয়া সাম্রাজ্যমধ্যে পঞ্জিকাসংশোধনজন্য মহারাজের উপরই তাহার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন। সেই কারণেই তিনি দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা ও বারাণসীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ উদ্ভাবিত আর্য্য-যন্ত্রাদি তাহাতে

সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। জয়সিংহ কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা-কল্পে তাহার পূর্ব্বপুরুষ প্রসিদ্ধ মানসিংহের নির্ম্মিত ঘাটের উপরই তাঁহাদেরই নিজ বাটীর উপরে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। এক্ষণে বলা বাহুল্য 'মান' অর্থে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতির পরিমাণ-মাত্র, অম্বরপতি 'মান' সিংহ নহে! যাহাহউক মহারাজ জয়-সিংহের অসাধারণ জ্যোতিষ জ্ঞান সম্বন্ধে পরে ডাঃ হন্টার, মহাত্মা টড ও অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত অসংখ্য প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশামধ্যেই তাঁহার সেই প্রতিভা সুদূর প্রতীচ্চ প্রদেশেও প্রচারিত হইয়াছিল! পর্ত্তুগাল রাজ্যে সে সময় জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাহার সভায় 'সেভিয়ার-ডি-সিলভা' নামক একজন পণ্ডিত প্রেরণ করেন, তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ 'ডি-লা হায়ারের' জ্যোতিরঙ্ক মহারাণাকে অর্পণ করেন। তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া ডি-লা হায়ারের বহু ভ্রম প্রদর্শন করেন। এই সময় তিনি তুর্কি জ্যোতির্ব্বিদ্ 'উলুকবেগের' উদ্ভাবিত যন্ত্রেরও ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ নিজ প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র সাহায্যে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে রাশিচক্রের অক্ষচ্যুতি সম্বন্ধে যাহা গণনা করিয়াছিলেন, মহাজ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত 'খোদিন' তাহার পর-বৎসরে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ আর্য্য-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যে "জয়প্রকাশ" "রাম-যন্ত্র" ও "সম্রাট-যন্ত্র" নামে তিনটী সুবৃহৎ যন্ত্রের উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত মানমন্দিরগুলির মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষোক্ত এই দ্বাদশ হস্ত পরিমাণ ব্যাস বিশিষ্ট যন্ত্রটী এতই

মানমন্দির—যন্ত্রশালা। (২০৮ পৃষ্ঠা)

উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, 'হিপার্কাস,' 'টলেমি' প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতও এই যন্ত্রবলেই ভ্রমজনক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমলব্ধ বড় আদরের মানমন্দিরগুলিও শ্রীভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে মদীয় সুহৃদ্ স্বনামধন্য অধ্যাপক বাবু মাতাপ্রসাদ এম, এ, কাশীর এই মানমন্দিরের সংস্কার কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, আমরাও তখন তাঁহার সেই উদ্যম ও যত্নে সাধ্যমত সহায়তা করিয়াছিলাম, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় বন্ধুপ্রবর তাঁহার সকল সাধ সকল সদেচ্ছা তাঁহার অনিত্য দেহখানিসহ পরিত্যাগ করিয়া অকালে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার উপদেষ্টা ও প্রধান সহায়ক জ্যোতিষশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ও ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলেন। সে সময় দুই লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিলে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার হইতে পারিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল, সাধারণের নিকট সে বিষয়ে সহায়তা প্রার্থনা করিলে সহজে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেও পারিত, কিন্তু জয়পুরাধিপতি তাহাতে নাকি বলিয়াছিলেন, উহা আমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি, আমি স্বয়ংই উহার সংস্কার করিয়া দিব। পরে দেখা গিয়াছে মানমন্দিরের সাধারণভাবেই কিছু কিছু সংস্কার হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানমন্দিরস্থিত যন্ত্রাদির সে শ্রী, সে সৌন্দর্য্য আর নাই, তবে যাহা বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে, এক্ষণে তাহাই সযত্নে রক্ষিত হইতেছে মাত্র। এখানে কোন বিশেষজ্ঞ

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বা বিশিষ্ট অধ্যাপক নাই, সুতরাং জ্যোতিষ-শিক্ষার্থী সেরূপ মেধাবী কোন ছাত্রও নাই, যাহারা যন্ত্রাদির নিত্য ব্যবহার দ্বারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ঐকান্তিক ভাবে আলোচনা করিবে। তবে জয়পুর রাজ্যের অন্নপুষ্ট কতিপয় ব্যক্তি যেন হস্তপদাদি-বিহীন জগন্নাথসদৃশ সেই সকল যন্ত্রের নিত্যদর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। আর মধ্যে মধ্যে সম্ভ্রান্ত দর্শক আসিলে তাহাদিগকে যা' তা' বলিয়া কোনরূপে যন্ত্রগুলির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রধান যন্ত্র ব্যতীত ভিত্তিযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্রের জীর্ণাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। সে গুলিও মহারাজ জয়সিংহের আবিষ্কৃত। এই সকল যন্ত্র অধিকাংশই ছাদের উপর অবস্থিত। অট্টালিকার ছাদ যথেষ্ট উচ্চ হইলেও পূর্ব্বদিকের আকাশ ব্যতীত অন্যান্য দিকের আকাশাংশ দিগ্বলয় পর্যন্ত সুন্দররূপে দেখিবার এখন আর উপায় নাই, পার্শ্বস্থিত নব-নির্ম্মিত অন্যান্য গৃহাদির দ্বারা তাহা কতক কতক আবৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন ইহার প্রকৃত সংস্কার করিতে হইলে, কোন কোন যন্ত্র আরও উচ্চ-নির্ম্মিত ছাদের উপর রক্ষা করা আবশ্যক হইবে।

কাশীর এই মানমন্দিরে যে "বেধশালা" আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

১। দক্ষিণোত্তর ভিত্তিযন্ত্র:—ইহাতে গ্রহ নক্ষত্র আদির স্ব স্ব মধ্যাহ্ন বৃত্তের জ্ঞান ও তাহার উন্নত অনুন্নত অবস্থার সময় জ্ঞানও হইয়া থাকে। এই যন্ত্রটী বাটীর একেবারে দক্ষিণ-

পশ্চিমের কোণে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটী পাকা দেওয়ালের উপর 'পলাস্ত্রা' বা জমী করিয়া তাহাতেই বিন্যস্ত।

২। সম্রাটযন্ত্রঃ—ছাতের উপর অন্যান্য সকল যন্ত্রের পশ্চিমদিকে এই বিরাট যন্ত্র গঠিত। ইহার মধ্যস্থলে উত্তর-দক্ষিণে ক্রমোন্নত সোপানযুক্ত প্রাচীর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইদিকে প্রস্তরের অর্দ্ধ-গোলাকার বৃত্তাভাস নির্ম্মিত। সেই বৃত্তের পরিধিগাত্রে সময় দেখিবার ঘণ্টা ও মিনিট আদির চিহ্ন খোদিত আছে। ইহাকে সাধারণতঃ 'সূর্য্য-ঘড়ি' বা 'ধূপ-ঘড়িও' বলে। উক্ত সোপানের ছায়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের পরিধিগাত্রে পড়ে এবং মধ্যাহ্নের পর সূর্য্য পশ্চিমদিকে যত অস্ত যাইতে থাকে ততই তাহার ছায়া পূর্ব্ব পরিধিগাত্রে পতিত হয়। তাহাতেই স্থানীয় সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সোপানের প্রাচীর এমন ভাবে গঠিত যাহাতে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিম্ন কোণ্ হইতে লক্ষ করিলে উপরের একটী ছিদ্রপথে রাত্রিকালে ধ্রুব তারার দর্শন হয়।

৩। দ্বিতীয় দক্ষিণোত্তর ভিত্তিযন্ত্রঃ—উক্ত সম্রাটযন্ত্রের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে এই যন্ত্র রচিত আছে। ইহা প্রথম সংখ্যক ভিত্তিযন্ত্রেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ।

৪। নাড়ীবৃত্ত উত্তর-গোলযন্ত্রঃ—সম্রাটযন্ত্রের পূর্ব্বদিকে এই যন্ত্র স্থাপিত আছে। ইহার মধ্যস্থলে ধ্রুবের সম্মুখে লৌহের শঙ্কু আছে। ইহার দ্বারা উত্তর গোলস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির নতকাল আদি জানা যায়।

৫। নাড়ীবৃত্ত দক্ষিণ-গোলযন্ত্রঃ—পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের দক্ষিণ দিকে, উহার পীঠের উপরই এই যন্ত্র আছে। ইহারও মধ্যস্থলে শঙ্কু তথা পরিধিতে ঘণ্টা আদির চিহ্ন খোদিত আছে। তাহাতে

দক্ষিণ গোলীয় গ্রহ-নক্ষত্রাদির সময় ও নতকাল জানা যায়।

৬। ক্ষুদ্র সম্রাটযন্ত্রঃ—পূর্ব্বকথিত যন্ত্রের পূর্ব্বদিকে এই যন্ত্রটী অবস্থিত। ইহাতে সময় ও ক্রান্তি জানা যায়, অন্যান্য বিষয় পূর্ব্ববৎ।

৭। চক্রযন্ত্রঃ—ক্ষুদ্র সম্রাটযন্ত্রের পার্শ্বেই বা উহার উত্তর দিকে এই ধাতুময় ঘূর্ণায়মান্ যন্ত্রটী রক্ষিত আছে। ইহাতে ৩৬০ অংশ এবং কলা বিভাগের কিছু কিছু চিহ্ন অঙ্কিত আছে, মধ্যে পিতলের ঘূর্ণায়মান 'বেধপট্টি' বা কাঁটা সংযুক্ত আছে। ইহাদ্বারা ক্রান্তি বিষয় স্পষ্ট জানা যায়।

৮। দিগংশযন্ত্রঃ—ক্ষুদ্র-সম্রাটযন্ত্রের পূর্ব্বদিকে এই বৃহৎ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে গ্রহ নক্ষত্রাদির দিগংশ জানা যায়।

কাশীর মানমন্দিরের যন্ত্রগুলির সাধারণ বিবরণমাত্রই বলা হইল, ইহার বৈজ্ঞানিক বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহা জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত, সাধারণ পাঠকের পক্ষ্যে তাহা আর বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে না বলিয়া তাহার বর্ণনা পরিত্যাগ করিলাম।

মানমন্দিরের যন্ত্রাদি ব্যতীত ইহার স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য ও অতীব মনোরম, ইহার গৃহ, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভ ও গবাক্ষাদি সমস্তই দেখিবার জিনিস। বিশেষ গঙ্গার তীর হইতে ইহার দৃশ্য বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। এরূপ না হইবেই বা কেন? যাঁহারা স্বচক্ষে জয়পুর দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই জয়পুর-প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ্ জয়সিংহের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া নিশ্চয়ই যে বিমোহিত হইয়া থাকিবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আরও আনন্দের বিষয় মহারাজের

এই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলাধার আমাদেরই সেই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান 'বিদ্যাধর' নামের এক চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহারই উদ্ভাবনা ও মন্ত্রণাবলে ভারতের মধ্যে জয়পুর রাজ্য এত সুন্দর, এত নয়ন-মন-তৃপ্তিকর হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত পাশ্চাত্য পর্য্যটকও এক-বাক্যে জয়পুরের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক জয়সিংহের কীর্ত্তিকলাপ যাহা কিছু আছে সমস্তই যেন অদ্ভুত!

মানমন্দিরের নিকটস্থ দশাশ্বমেধের প্রধান পথটীর উভয়-পার্শ্বস্থিত গৃহাদিও তাঁহারই পরিকল্পনা-সম্ভূত বিচিত্র সমতা-বিশিষ্ট, অর্থাৎ এই পথের উভয় দিকের গৃহগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত ছিল যে, উভয় দিকেই সেই এক ধরণের খিলান ও একই ধরণের স্তম্ভযুক্ত গৃহগুলি দেখিলে বস্তুতঃই চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু ক্রমেই বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহা আবশ্যক বোধে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

এই রাস্তার উপর স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মন্দিরটী দেখিবার জিনিস। তাঁহার কীর্ত্তিও বেশ রক্ষিত হইতেছে।

দালভ্যেশ্বর ও সোমেশ্বর :—

মানমন্দিরঘাটের নিকট 'দালভ্যেশ্বর' ও 'সোমেশ্বর' লিঙ্গের মন্দির আছে। সাধারণের বিশ্বাস দালভ্যেশ্বরের অনুগ্রহ হইলে ধরায় সুবৃষ্টি হয় এবং সোমেশ্বরের কৃপায় জীবের সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণ নিত্য বহু ব্যক্তিকে স্ব স্ব রোগমুক্তির আশায় সোমেশ্বর-সমীপে উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

ত্রিপুরভৈরবীঘাট ও মীরঘাট :—

মানমন্দিরের পরেই ত্রিপুরভৈরবীর মন্দির অবস্থিত।

মন্দিরমধ্যে প্রস্তর-খোদিত দেবীর প্রকাণ্ড আননমূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন। মন্দিরস্থিতা এই ত্রিপুরদেবীর নামানুসারেই ঘাটটী ত্রিপুরভৈরবীঘাট বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ঘাটের উপর আরও অনেক নূতন ও পুরাতন দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরেই মীরঘাট। এই ঘাটটী তেমন প্রশস্ত না হইলেও ইহার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। ঘাটের সোপান-গুলি যেমন দৃঢ়ভাবে গ্রথিত, তেমনি ঘাটে নামিবার ও উঠিবার পক্ষে উহা বেশ সুবিধাজনক। মীর রুস্তম আলী এই স্থানে পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় এই অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বর্ত্তমান কাশী-রাজের পূর্ব্ব পুরুষ রাজা মনসারাম ইহাঁরই কার্য্যকর্ত্তা বা দেওয়ান ছিলেন। পরে রাজা বলবন্ত সিং সেই দুর্গ ভাঙ্গিয়া তাহারই মাল-মশালা লইয়া রামনগরের দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘাটের উপর বহু সুদৃশ্য দেবালয় ও অট্টালিকা আছে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমনোহর যুগলমূর্ত্তির মন্দির ও নানকপন্থী শিখদিগের আশ্রম-মঠটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত কাশীরাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মুন্সি দয়াশঙ্করের নির্ম্মিত নিজ বাগানবাটী এই ঘাটের উপর দেখিতে অতি সুন্দর। ঘাটের সম্মুখস্থ গঙ্গাংশকে কাশীখণ্ডে "বিশালগঙ্গা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাই মীরঘাটের পূর্ব্বনাম।

বারাহীদেবী ঃ—

এই মীরঘাটের নিকটেই বারাহীদেবীর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি

ও মন্দির আছে। কাশীর অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় এই মন্দির সর্ব্বদা খোলা থাকে না। রাত্রি তিনটার পর দেবীর দ্বার খোলা হয় ও ভোর ছয়টার সময় তাহা বন্ধ হয়। বরাহ-মুখযুক্ত দেবীর বিশাল মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে অবস্থিত। শুনিতে পাওয়া যায়, এক সময় একটী বালিকা একাকী দেবীর মন্দিরে যাইলে দেবী বালিকা-টীকে গ্রাস করিয়াছিলেন। তাহার অঞ্চলমাত্র দেবীর মুখে তখনও ঝুলিতেছিল। সেই অবধি দেবীর দ্বার প্রায় বন্ধ থাকে।

বিশালাক্ষী ও দিবোদাসেশ্বর ঃ—

এই মীরঘাটে যাইবার পথে ধর্ম্মকূপের সম্মুখে কাশীর 'শক্তি-পীঠ' বিশালাক্ষীর মন্দির। অনেকের ধারণা, কাশীতে শক্তিপীঠ—অন্নপূর্ণা, আর বিশ্বনাথ—দেবতা; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা এখানকার নিত্য-দেবতা। প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের বর্ণনামধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বারাণসীতে এই বিশালাক্ষীই পীঠেশ্বরী-দেবী, এখানে সতীর 'চক্ষু' পতিত হইয়া-ছিল, ইহাঁর দেবতা কালভৈরব এবং কাশী-মণিকর্ণিকা তীর্থ।

কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়, দেবী বিশালাক্ষী বারাণসীতে পূর্ব্বোক্ত বিশালগঙ্গা বা গঙ্গার বিশাল-তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা তৃতীয়ায় এখানে মেলা হয়। এই দিবস দেবীর সম্মুখে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণানন্তর পরদিন যথারীতি দশটী কুমারী ভোজন করাইয়া পারণ করিলে কাশীবাসের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বহু কাশীবাসীও বিশালাক্ষী দর্শন করেন নাই। কাশীতে আসিয়া কালভৈরব ও বিশালাক্ষী দর্শন এবং মনিকর্ণিকা-

স্নান অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে এই বিশালাক্ষীর মন্দিরটী একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এক্ষণে কোন ভক্ত মহাজন মন্দিরটীর নূতনভাবে বিশেষ-রূপে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। পূজাপাঠেরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

বিশালাক্ষীর মন্দিরের নিকট কিছু দক্ষিণে মীরঘাটের উপরেই প্রসিদ্ধ 'দিবোদাসেশ্বরের' মন্দির। প্রসিদ্ধ কাশীনরেশ দিবোদাস স্বয়ং এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে সে মন্দির লুপ্ত হইলে পুনরায় তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দির-মধ্যে দিবোদাসেশ্বর শিবলিঙ্গ ব্যতীত বিংশবাহুক নামে আর একটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানেরই "ভূপালশ্রী" তীর্থের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। দিবোদাসের মন্দির প্রদক্ষি-ণার মধ্যে "ধর্ম্মকূপ" নামে একটী অতি প্রাচীন পবিত্র কূপ-তীর্থ আছে। কূপের নামানুসারে এ পল্লী এখন 'ধর্ম্ম-কূপ-মহল্লা' নামে পরিচিত। কাশীখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, এইস্থানে পিণ্ড দিলে পিতৃগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

প্রাচীন বিশাল-গঙ্গা তীর্থ অথবা ভূপালশ্রী তীর্থ অধুনা মীরঘাটে পরিচিত হইলেও, অলর্ক-চতুর্দ্দশীতে এখানে আজিও মেলা হইয়া থাকে। বিশালাক্ষীর নিকটস্থ গঙ্গাই বিশালগঙ্গা বলিয়া চিরকাল প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মেশ্বর ঃ—

পূর্ব্ববর্ণিত 'ধর্ম্মকূপের' নিকটেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মেশ্বরের মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যতনয়

নেপালী-মন্দির। (২১৭ পৃষ্ঠা।)

ধর্ম্মরাজ যম ধর্ম্মপীঠে কঠোর তপস্যা করিয়া ধর্ম্মরাজ হইয়া 'দণ্ড-ধরত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। তখন এখানে তির্য্যগ্‌যোনিরাও পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এক বটবৃক্ষ স্থবর্ণময় হইয়াছিল এবং 'দুর্দ্দম' নামা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত নরপতির ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। এই পরম পবিত্র পীঠে যে শিবলিঙ্গ আছেন, তিনিই 'ধর্ম্মেশ্বর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে সহস্রপাপীও যদি কোনরূপে একবার আসিয়া ধর্ম্মেশ্বরের দর্শন করে, তবে তাহার আর কোনরূপ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ধর্ম্মেশ্বরের যাত্রার দিবসে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি উৎসব সহকারে রাত্রি জাগরণ করিলে আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না।

আধুনিক কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই পীঠটী বৌদ্ধযুগের বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মেশ্বর বুদ্ধ-দেবেরই নামান্তর মাত্র।

ললিতাঘাট ও রাজসিদ্ধেশ্বরীঘাট :—

ইহার পর ললিতা বা লহরিঘাট। এই ঘাটের নিকট লাহোর বা পাঞ্জাব হইতে আগত বহু ক্ষেত্রীর বাস, সেই কারণ এই মহল্লাকে লাহোরী বা লহারটোলা বলে, এবং এই ঘাটটীকেও অনেকে 'লহরিঘাট' বলে। পরন্তু ইহা ললিতা দেবীর নামানু-সারেই ললিতাঘাট বলিয়া বিখ্যাত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথিতে কামনা করিয়া, দেবীর পূজা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

ললিতাঘাটে একটী 'নেপালী-মন্দির' আছে, তাহাও দেখিবার

জিনিস। কাশীতে এ ধরণের মন্দির দ্বিতীয় নাই, ইহা নেপাল দেশীয় মন্দিরের সম্পূর্ণ অনুকরণে নির্ম্মিত। মন্দিরটীর অধিকাংশ স্থল বহু কারুকার্য্য-বিশিষ্ট কাষ্ঠ ও ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, উপরে বিবিধ প্রকার 'খোলা' দ্বারা বিচিত্র ভাবে আচ্ছাদিত। চূড়ায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা আবদ্ধ আছে, বায়ুহিল্লোলে তাহা মধুর শব্দে বাজিতে থাকে। মন্দিরমধ্যে দেবীমূর্ত্তি অবস্থিতা। শুনা যায় নেপালের কোন রাণী ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ললিতাঘাটের সংলগ্ন 'রাজসিদ্ধেশ্বরীঘাট'। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, এক সময় কোন সিদ্ধ-বাবা 'সিদ্ধ গিরি' নামে এক মহাপুরুষ গোস্বামী এই ঘাটের উপরেই তাহার আসন স্থাপনা করেন। সেই সময় তাঁহার নিকটে 'ওমরাও গিরি' নামে অন্য একজন সিদ্ধবাবাও আসন স্থাপনা করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে সামান্য বিরোধ হয় ও পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাৎ করেন যে, 'এই স্থান নষ্ট হইয়া যাইবে'। ফলে তাহাই হইয়াছে, সে অট্টালিকা, মঠ, বাঁধ বা 'পোস্তা' সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের শিষ্যগণমধ্যে এখনও দুই একজন আছেন, শুনিতে পাওয়া যায়। এই ঘাটের উপর একটী বৃহৎ ফটক আছে—তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবার একটী সোজা গলি পথ আছে, তাহা সরস্বতী-ফটক নামে পরিচিত। এই ঘাটের উপর অট্টালিকার মধ্যে রাজরাজেশ্বরী দেবী অবস্থিতা আছেন।

জলশায়ীঘাট ও রাজবল্লভ-মসান :—

জলশায়ী বিষ্ণুমন্দিরের নামেই এই ঘাটের নামকরণ হইয়াছে। ঘাটের পার্শ্বেই এই মন্দিরটী এমন ভাবে গঠিত যে,
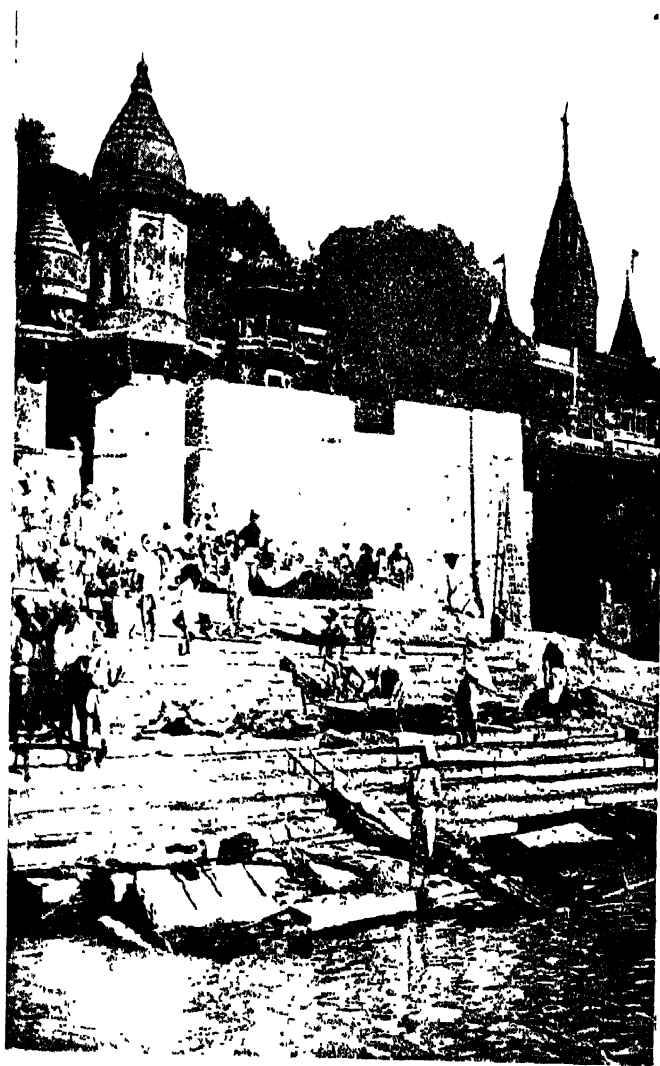
জলশায়ীঘাট ও রাজবল্লভ শ্মশান। (২১৮ পৃষ্ঠা

দেখিলেই মনে হয়—মন্দিরটী গঙ্গাবক্ষে যেন ভাসিতেছে। এই ঘাটের সংলগ্ন পূর্ব্বকথিত ৺মরাওগিরির ঘাট প্রভৃতি আরও কয়েকটী ঘাট আছে, তন্মধ্যে 'রাজবল্লভঘাট' ও 'শ্মশান বা মসান' ঘাটটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত হরিশ্চন্দ্র-শ্মশান-ঘাটের ন্যায় এটীও এক্ষণে বারাণসীর প্রসিদ্ধ শ্মশান। বরং আজকাল এইটীরই প্রাধান্য অধিক। ঘাটটী ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া গিয়াছে। অধুনা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, 'মণিকর্ণিকা-মহাশ্মশান,' আমরাও বাধ্য হইয়া সাধারণের ভাষায় তাহাই বলিয়াছি, কিন্তু 'মণিকর্ণিকা' ঠিক শ্মশানঘাট নহে। মণিকর্ণিকা মহা-মুক্তিপ্রদ প্রসিদ্ধ তীর্থ, তাহার পার্শ্বেই এই রাজবল্লভঘাট ও নূতন শ্মশানঘাটটী অবস্থিত বলিয়া লোকে ক্রমে রাজবল্লভ নাম ছাড়িয়া দিয়া মণিকর্ণিকার সহিত এই শ্মশানটী সংলগ্ন করিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ এটীকে রাজবল্লভ-শ্মশানঘাট বলাই যুক্তিসঙ্গত। 'রাজবল্লভ' একজন অতি ভক্তিমান বাঙ্গালা রাজা ছিলেন। দশাশ্বমেধেও তাঁহার এক শিব-মন্দির আছে। সে মন্দিরটীর গঠন-পারিপাট্য কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে ঘাটটীর সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

এই শ্মশানঘাট সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা কাশীর নূতন শ্মশান। এখন হইতে প্রায় পৌনেদুইশত বৎসর পূর্ব্বে বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এমন এক ঘটনা হয়, যাহাতে এই শ্মশানটীর সৃষ্টি হইয়াছে। অযোধ্যার নবাব 'সফদর জঙ্গ বাহাদুরের' তোষা-খানার রক্ষক লালা 'কাশ্মীরীমল' ক্ষত্রীর জননীর মৃত্যু হইলে, চির প্রথামত কাশীর একমাত্র প্রাচীন শ্মশান হরিশ্চন্দ্রঘাটে

শবদেহ নীত হয়। শ্মশানের চণ্ডাল বা ডোম শ্মশান-কর-রূপ বহু অর্থ প্রার্থনা করে এবং সর্ব্বসাধারণকেও এইভাবে সর্ব্বদা পীড়ন করে জানিয়া তিনি তথা হইতে শব উঠাইয়া আনেন এবং তখনই মণিকর্ণিকার নিকট রাজবল্লভ ঘাটের অধিকারী এক গঙ্গা-পুত্রকে বহু অর্থ দিয়া এই জমী খরিদ করিয়া লইলেন ও এই নূতন শ্মশান প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। তাঁহার মাতার দেহই এখানে সর্ব্বপ্রথমে সৎকার হয়। পরে তিনি স্বজাতিদিগের জন্য একটি পাকা মঢ়া বা চৌতারা প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাহাতে কেবল তাঁহাদের পুরোহিত-জাতি সারস্বত-ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের ক্ষত্রিয়-জাতিরই শব দাহ হয়। এখানে প্রাচীনকালের সতীদের স্মারক-স্তূপ আছে।

মণিকর্ণিকাঘাট ও মণিকর্ণিকেশ্বর :—

তীর্থশ্রেষ্ঠ পূত-মণিকর্ণিকা যে কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, সেই অনাদি বৈদিকযুগ হইতেই ইহার মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব-কথিত শ্মশান-সংলগ্ন এই ঘাট ও কুণ্ডটীই মণিকর্ণিকা মহাতীর্থ বলিয়া জগতে পরিচিত। এমন তীর্থ আর বুঝি দ্বিতীয় নাই—হিন্দুমাত্রেই জীবনে একবার বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন ও একটীবারমাত্র মণিকর্ণিকায় ডুব দিতে পারিলেই যেন পরম কৃতার্থতা লাভ করে। বিশ্ববিশ্রুত এমন পবিত্র ভূমির তুলনা বস্তুতঃই আর আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্মুখে ধীর-প্রবাহিনী পতিত-পাবনী সুশীতল গঙ্গা পার্শ্বে জীবের সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ উদার ও উন্মুক্ত নব মহাশ্মশান তথা হইতে অবিরত প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির ধূমরাশি চারিদিকে

পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন প্রত্যেক যাত্রীকেই অঙ্গুলিসঙ্কেতসহযোগে সংসারের স্থির-অনিত্যতা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। আবার অনতিদূরে ভগবান বিষ্ণুর মহাতপস্যার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিস্তৃত মর্ম্মরপ্রস্তরের উপর খোদিত তাঁহার "চরণ-পাদুকা" ও সুপবিত্র মণিকর্ণিকাকুণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীখণ্ড ও বিবিধ পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়,—এই স্থানে 'বিষ্ণু' 'মহাদেবের' কৃপালাভের জন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। শিব তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে মস্তক আন্দোলিত করিলে, তাঁহার কর্ণ হইতে বিবিধ মণিরত্নখচিত 'মণিকর্ণিকা' নামক কর্ণভূষণ এইস্থানে পতিত হয়, সেই কারণ ইহা মণিকর্ণিকা বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বেই নিজ সুদর্শনচক্র দ্বারা এই কুণ্ড খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহাতে 'মণিকর্ণিকা' পতিত হওয়ায় ইহা 'চক্রতীর্থ' বা 'চক্রপুষ্করিণী' - 'মণিকর্ণিকা' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পুষ্করিণীটী দীর্ঘ প্রস্থ ৬০ ফুট এবং গভীরতায় ২০ ফুট। কুণ্ডের সোপান মধ্যে দুই একটী জলের ঝরণা আছে, তাহাতে সততই জলপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। কার্ত্তিকশুক্ল চতুর্দ্দশীতে যখন এই কুণ্ডটী পরিষ্কার করা হয়, তখন ইহার দৃশ্য অতি মনোরম বোধ হয়। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন এখানে উৎসব হয়।

'শিব-পুরাণের' মতে বিষ্ণুর 'মণিকুণ্ডল' শিবের সম্মুখে পতিত হওয়ায় মণিকর্ণিকা নাম হইয়াছে। আবার কাশীখণ্ডের অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, আশুতোষ বিশ্বনাথ কাশীবাসী ভক্ত সাধুদিগের কর্ণে এই স্থানেই 'তারকব্রহ্ম' নাম উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই কারণ ইহার নাম মণিকর্ণিকা। অথবা এই

পুণ্যভূমি মুক্তিদেবীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং চরণকমলের কর্ণিকাস্বরূপ সেইহেতু সকলে ইহাকে মণিকর্ণিকা বলিয়া অভিহিত করে।

কাশীমাহাত্ম্য পাঠে জানিতে পারা যায়, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকায় সকলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে। সৌরপুরাণকার বলেন—"বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তম মণিকর্ণিকাতীর্থের তুলনা নাই।" তাই নানা দিক দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী মণিকর্ণিকার পবিত্র বারি স্পর্শ করিবার জন্য ছুটিয়া আইসে।

পশ্চাতে বিবিধ বর্ণের অসংখ্য গগনস্পর্শী মন্দির ও অট্টালিকা সুশোভিত, কত দেশের কত নর নারী অপূর্ব্ব বসন ভূষণ পরিহিত হইয়া সেই বিস্তৃত সোপান-পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পতিতোদ্ধারিণী ভাগিরথীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তাহাদের জন্মজন্মার্জ্জিত পাপ কালিমারাশি বিধৌত করিতেছে। তাহাদের সে পুলকপূর্ণ মুখের ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা যেন পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের মানব জন্ম ধারণ করা আজ যেন সার্থক হইয়াছে।

এই ঘাটের উপরে 'বর্দ্ধমান-মহারাজের বাটী,' সেই বাটীর সংলগ্ন ভূমিতলের মধ্যে অতি প্রাচীন মন্দিরে মণিকর্ণিকেশ্বর মহাদেব অবস্থিত। সোপান-পথে নামিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। তবে উপর হইতেও বাবার দর্শন হয়, তাহাতে বোধ হয়, বাবা যেন কূপের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। ঘাটের উপর 'আলয়ার' ও 'আমেঠীর' মহারাজের সুন্দর মন্দির আছে। মণিকর্ণিকেশ্বরের মন্দির হইতে অনতিদূরে ঘাটের নিকট তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মণিকর্ণিকাকুণ্ডে স্নান বা উহার

তারকেশ্বর ও মণিকর্ণিকাঘাট।   (২২৩ পৃষ্ঠা
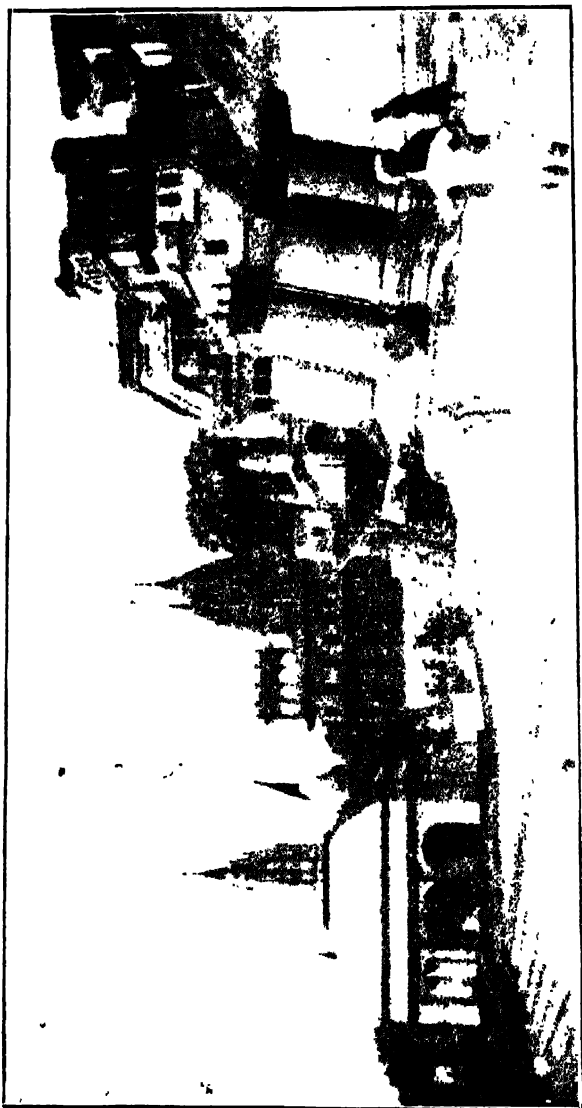
জল স্পর্শ করিলে অর্থলোলুপ পাণ্ডাগণ অর্থের জন্য যাত্রীগণের প্রতি বিষম অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের সে অত্যাচার দেখিয়া অনেক নিরীহ শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রায় সে দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন না। এ বিষয়ে কাশীবাসী জনসাধারণের সামান্য দৃষ্টি থাকিলে যাত্রিগণের বিশেষ উপকার হয়। সরকার-পক্ষ হইতে যাত্রীপীড়ক পাণ্ডা ও যাত্রাওয়ালাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও এখনও সকল অত্যাচার নিবারিত হয় নাই। ইতি-পূর্ব্বে অসিঘাট-বর্ণনকালে বলা হইয়াছে, কাশীর প্রধান পঞ্চতীর্থ মধ্যে মণিকর্ণিকা অন্যতম। এই তীর্থ হইতেই সাধারণতঃ কাশীর সকল যাত্রা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া থাকে। এইস্থানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য হইয়া থাকে। মহারাণী 'অহল্যাবাই' এই ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই ঘাট প্রস্তুতের সময়েই পুণ্যবতী মহারাণীর দেহান্ত হয়। তদবধি এই ঘাট অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখনও কোনও ধর্ম্মাত্মা এই ঘাট সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হন নাই। ইন্দোরাধিপতির এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

দত্তাত্রেয় ও সিন্ধিয়াঘাট ঃ—

মণিকর্ণিকার প্রায় উপরেই ভগবান 'দত্তাত্রেয়ের' একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরমধ্যে ভগবান দত্তাত্রেয়ের পাদুকা রক্ষিত আছে। সেই দত্তাত্রেয়-মন্দিরের নামানুসারে মণিকর্ণিকার পার্শ্বে কিয়দংশ দত্তাত্রেয়ঘাট বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ইহার পরেই 'সিন্ধিয়াঘাটের' অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাটটী বহু অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইতেছিল, কিন্তু কি

জানি কি দৈব কারণে ইহার প্রস্তুত-কার্য্য আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে যে অংশ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ধ্বসিয়া তীর্য্যগ্‌ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে বলেন, গঙ্গার কোনও অন্তরস্রোতা উপনদী এইস্থানে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই কারণ কোন অট্টালিকা বা ঘাটের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে এই স্থানে স্থায়ী হইতে পারে নাই। আবার ইহাও প্রবাদ আছে, এই ঘাটের নির্ম্মাণ-কর্ত্রী গোয়ালিয়রের মহারাণী 'বৈজাবাই' নিজ মাতৃনামে ইহা উৎসর্গ করিতে বাসনা করিয়া, বলিয়াছিলেন, "এতদিনে 'মাতৃঋণ' পরিশোধ করিতে পারিলাম।" ভ্রান্ত মোহান্ধ ব্যক্তি ভাবিতেও পারে নাই যে, মাতৃঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি জীবের নাই, জগতে কেহ কখনই সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একত্র করিয়া মাতার সেই অপার্থিব স্নেহকণার তুলনায় আসিতে পারে না; সুতরাং উক্ত নির্ম্মাণকর্ত্রীর এ ভ্রান্ত গর্ব্বানুষ্ঠান অচীরে শিথিলমূল হইল, ঘাটে বিনির্ম্মিত স্তম্ভ ও উপানদেশগুলি জননী জাহ্নবীর প্রবল প্রবাহে হেলিয়া পড়িল, নির্ম্মাণকর্ত্রী বিফল-মনোরথ হইয়া নিজ ভীষণ দাম্ভিকতার ফল—অনুশোচনাক্ষীণ্য তাহার শেষ জীবন-প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হইলে, ঘাটটী এতদিন তদবস্থাতেই তাঁহার মহাভ্রমের পরিচয় দিতেছিল। সম্প্রতি এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী ভিক্ষালব্ধ প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহার আমূল সংস্কার করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ঘাটটী প্রস্তুত হইলে কাশীর গঙ্গাতটের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধিত হইবে। গোয়ালিয়রের মহা-রাজ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইলে গোয়ালিয়রের একটী বিশেষ কীর্ত্তি সংরক্ষিত হয়।

সঙ্কটাঘাট ও আত্মাবিশ্বেশ্বর ঃ—

সকলসঙ্কট-বিনাশিনী সঙ্কটাদেবীর নামানুসারেই এই ঘাটের নামকরণ হইয়াছে। সঙ্কটামন্দির কাশীর মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ; হিন্দু-রমণীগণ সংসারে কোন কিছু অনিষ্টের আশঙ্কা দেখিলেই অবিলম্বে সঙ্কটার পূজা দিয়া আসেন। 'গহনাবাইয়ের' নির্ম্মিত এই সঙ্কটার মন্দিরটী অতি সুন্দর। নবরাত্রি বা দুর্গাপূজার সময় ও প্রত্যেক শুক্রবারে এখানে দেবীর দর্শন উপলক্ষে খুব ভিড় হয়। নিকটেই একটী মন্দিরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের অনতিদূরে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটাঘাট। ঘাটের উপরেই হনুমানজীর এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। নিম্নে একটী সুন্দর ক্ষুদ্র শিবালয় ঘাটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। বহু বিদ্যার্থী এই মন্দির-সমীপে অবস্থান করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকে। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরের পিছনে 'আত্মাবিশ্বেশ্বরের' প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের মধ্যেই নবদুর্গার অন্যতম 'কাত্যায়ণী দেবী', 'মঙ্গলেশ্বর' ও 'বুদ্ধেশ্বর' [illegible] মন্দিরের সম্মুখে বৃহস্পতিশ্বরের মন্দির অবস্থিত রহিয়াছে।

সিন্ধিয়ামহল বা গোয়ালিয়রঘাট :—

বারাণসীর এই বিস্তৃত গঙ্গাতটস্থিত সৌধশ্রেণীমধ্যে গোয়ালিয়র ঘাটের উপর গোয়ালিয়র-রাজঅট্টালিকাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুন্সিঘাটের দ্বারভাঙ্গা-রাজবাটী ব্যতীত এমন সুন্দর ও সুদৃঢ় বাটী আর কোন ঘাটের উপরেই দৃষ্টিগোচর

হয় না। এই অট্টালিকার সম্মুখেই গোয়ালিয়রঘাট, ইহা আবার 'গঙ্গা-মহল' বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

ভোঁসলাঘাট, গণেশঘাট ও যমঘাট ঃ—

নাগপুরের প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রনায়ক ঘোঁসলা বা ভোঁসল বংশের কোন অধিপতি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘাট নির্ম্মাণ করাইয় দেন। ঘাটটী যেমন প্রশস্ত তেমনি দেখিতে সুন্দর। ঘাটের উপর প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ব্ববর্ণিত গোয়ালিয়র সৌধের পার্শ্বে এটীও সৌন্দর্য্যসম্পদে দাঁড়াইবার উপযুক্ত প্রস্তরবদ্ধ সুদৃঢ় সোপানপথ গঙ্গাগর্ভ হইতে অট্টালিকান্তর্গত লক্ষ্মীনারায়ণের একটী সুন্দর বিচিত্র মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার পরেই "গণপতি বা গণেশঘাট," এখানে লোকের স্নানাহ্নিক করিবার উপস্থিত বিশেষ সুবিধা নাই, নৌকা ভরা বহুসংখ্যক কাষ্ঠ এই স্থানে আমদানি হয় ও সহরের সর্ব্বত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ঘাটটী এখনও 'গণেশঘাট' বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

ইহার নিকটে আরও কতকগুলি লুপ্তঘাটের সন্ধান পাওয় যায়, তন্মধ্যে 'যমঘাট' ও 'অগ্নিঘাট' উল্লেখযোগ্য। যমঘাট বা যমেশঘাটের সার্থকতা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এখন প্রতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। "ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।" এই প্রবচনের বিধানানুসারে সকল ভ্রাতা-ভগিনী উক্তদিবস এই ঘাটে স্নান করিয়া ভগিনিকর-প্রদত্ত তিলক গ্রহণকরতঃ আনন্দ চিত্তে ভগিনীর বাটীতে উপস্থিত হয় ও ভোজনানন্দ উপভো

Benares
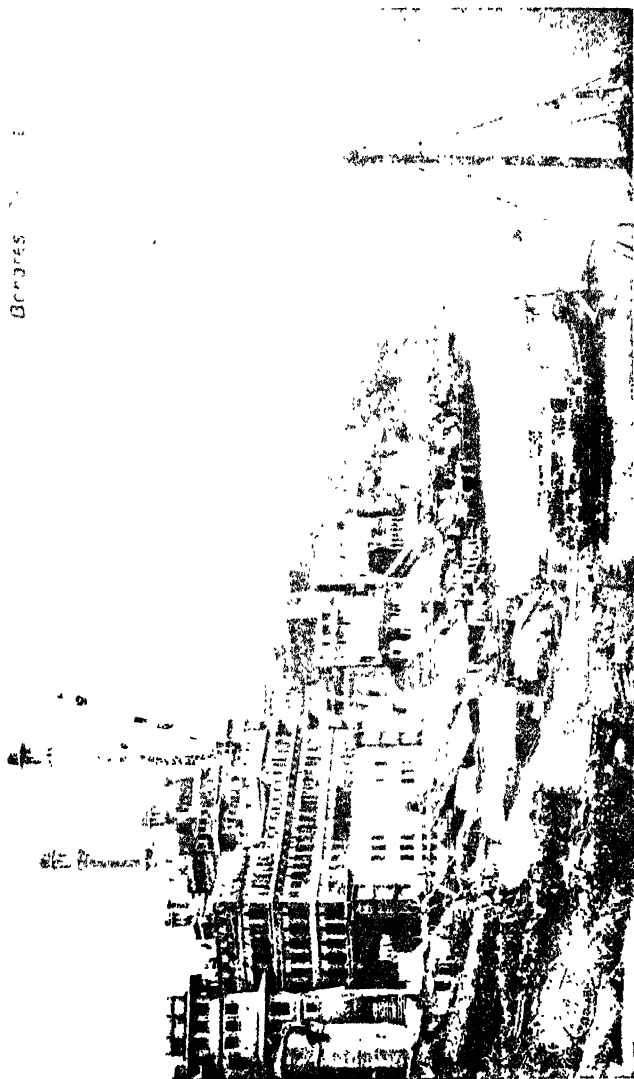
করে, পরে ভগিনীকে সাধ্যমত উপহার দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে।

অগ্নিশ্বরঘাট ঃ—

ইহার পরেই অগ্নিতীর্থ বা অগ্নিশ্বরঘাট। অগ্নিতীর্থ কাশী-খণ্ডের বর্ণনা অনুসারে একটী প্রধান তীর্থ বলিতে হইবে। কিন্তু কালক্রমে তাহার খ্যাতি মন্দীভূত হইয়াছে। এই তীর্থসহ-যোগেই ঘাটের নাম অগ্নিঘাট হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত বহু অনুসন্ধানে ঘাটের অস্তিত্ব বাহির করিতে হয়। পুনার 'বাজীরাও পেশোয়া' এই ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘাটের উপর অগ্নিশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। আরও অনেকগুলি মন্দির এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ঘাটের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত একটী প্রাচীন জৈনমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামঘাট, জড়াওমন্দির ও লক্ষণবালা ঘাট ঃ—

রামঘাট,—এটীও কাশীর একটী প্রসিদ্ধ ঘাট। এই ঘাটের উপর রামেশ্বর দেবতার মন্দির আছে। বোধ হয় সেই কারণেই ইহা রামঘাট বলিয়া খ্যাত। মন্দিরের মধ্যে আরও বহু দেব দেবী, শ্রীরাম-জানকী ও অনুচরবৃন্দের অনেক প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই স্থানে নেপালী ও গুজরাটীদিগের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুইশত বৎসরের উপর হইল জয়পুরের মহারাজা এই ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। চৈত্র মাসের নবমীতে এখানে স্নানের খুব ভিড় হয়।

ইহার পর 'জড়াওমন্দির-ঘাট' ও 'বাজীরাও-লক্ষণবালা-

ঘাট' অবস্থিত। জড়াওমন্দিরের পর মহারাষ্ট্র-ধুরন্ধর 'বাজীরাও পেশোয়া'-নির্ম্মিত এই ঘাট ও অট্টালিকা দেখিবার বিষয়। অধুনা ইহা মহারাজ-সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত। ঘাটের উপরে সিন্ধিয়া-রাজের নির্ম্মিত লক্ষ্মণবালাজীর সুন্দর মন্দির অবস্থিত। নিকটেই গোয়ালিয়রের দেওয়ানজীর মন্দির আছে। মন্দিরের গাত্র জড়াও কার্য্য করা, তাই ইহাকে জড়াওমন্দির বলে। কার্ত্তিক মাসে এখানের দর্শন হয়। দিল্লীসম্রাট ঔরঙ্গজেবের গগনস্পর্শী মিনারেটসমন্বিত প্রসিদ্ধ মস্ক বা মস্‌জিদ্‌টী এই অট্টালিকার সহিতই সংলগ্ন।

এই ঘাটের নিকট চক্রেশ বা চক্রেশ্বর মহাদেবের এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা এক্ষণে পাতালেশ্বর নামেও প্রসিদ্ধ। ইহা বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীমৎ ভাস্কর রায় বা ভাস্করস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি সে কালের একজন সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। ইহাঁর অলৌকিক জীবন-কাহিনী পরে আলোচিত হইয়াছে।

ইহার পরেই চোবাখ্যাঘাট বা চোরঘাট অবস্থিত। ঘাটটীর চোর আখ্যা কেন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। ঘাটের উপর অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় ও অগ্রহায়ণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে এখানে কয়েকটী মেলা হইয়া থাকে।

পঞ্চগঙ্গা, মঙ্গলাগৌরী ও বেণীমাধবঘাট ঃ—

পঞ্চগঙ্গা হইতে পর পর একই ভাবের অনেকগুলি ঘাট

No. 5 — The Puch ganga Ghat, Benares
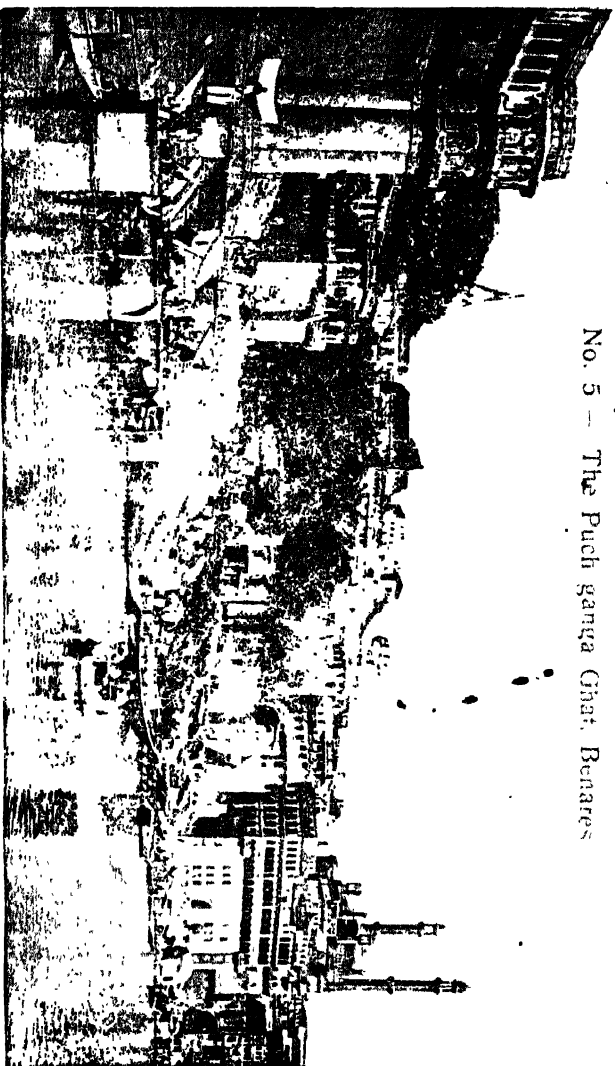
এই স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং সেগুলির স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করা দুরূহ। প্রথমেই পঞ্চগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চস্রোতার সম্মিলন। 'ধূতপাপা,' 'যমুনা' 'কিরণা' 'সরস্বতী' ও 'গঙ্গা' ইহাঁরাই পঞ্চনদী বলিয়া প্রসিদ্ধা। 'ধূতপাপা' হইতে 'সরস্বতী' পর্য্যন্ত চারিটী অন্তঃস্রোতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী গঙ্গায় আসিয়া মিলিয়াছে। প্রবাদ আছে, বহু পূর্ব্বকালে যখন এ স্থানে প্রস্তরবদ্ধ ঘাট নির্ম্মিত ছিল না, তখন গঙ্গার জল কমিয়া যাইলে উক্ত স্রোত বা ধারাসমূহ পরিলক্ষিত হইত, কালক্রমে প্রস্তরবদ্ধ ঘাটের জন্য তাহা আর দেখিবার উপায় না থাকিলেও, প্রাচীনকালের সেই পঞ্চগঙ্গার নামই প্রসিদ্ধ আছে।

এই পঞ্চগঙ্গার এক অংশ 'মঙ্গলাগৌরীঘাট' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে, এক সময় মঙ্গলাগৌরী কঠোর তপশ্চরণ করেন, তাহাতে সূর্য্যকিরণজনিত তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে একটী স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহারই নাম কিরণনদী। সেই কিরণনদীর উপর 'মঙ্গলাগৌরীঘাট' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাহা হউক এই সম্মিলিত পঞ্চগঙ্গাঘাট, পঞ্চনদতীর্থ বা ধর্ম্মনদ-তীর্থ বলিয়াও প্রসিদ্ধ, কাশীর প্রসিদ্ধ পঞ্চতীর্থের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞের 'অবভৃথ-স্নানে' যে ফল হয়, পঞ্চগঙ্গাতীর্থে স্নান করিলে তাহার শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়। অম্বরাধিপতি মানসিংহ ই ঘাটটী বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। সারা কার্ত্তিক মাসের মধ্যে নিত্যই এখানে স্নানের খুব ভিড় হইয়া থাকে।

পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপরেই বিন্দুমাধবের প্রাচীন মন্দির ছিল।

কাশীখণ্ডে উক্ত আছে, ভগবান বিষ্ণু মহেশ্বরের আদেশে কাশীধামে প্রকটভাবে আবির্ভূত হইলে, এই পঞ্চগঙ্গা তীর্থস্থ 'অগ্নিবিন্দু' নামক জনৈক উগ্রতপা সাধক তাঁহার স্তব করেন, তাহাতে মাধব প্রীত হইয়া তাঁহকে এই বর প্রদান করেন যে, যতদিন কাশীর নাম থাকিবে, ততদিন আমি তোমার নামের শেষাংশ আমার নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া "বিন্দুমাধব" নামে এই স্থানেই প্রকট মূর্ত্তিতে অবস্থান করিব। যে ব্যক্তি পবিত্র হৃদয়ে এই তীর্থে স্নান করিয়া আমায় দর্শন করিবে, তাহার আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

শুনিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরটী পূর্ব্বে বারাণসীর প্রায় সকল মন্দিরের অপেক্ষা উচ্চ ছিল, সুতরাং ইহার প্রস্তর-নির্ম্মিত বিচিত্র ধ্বজাস্তম্ভটীও যে অসাধারণ উচ্চ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ঔরঙ্গজেব হিন্দুমন্দিরের এই উচ্চতা দেখিয়া তাহা খর্ব্ব করিবার মানসে সেই ধ্বজাস্তম্ভটী চূর্ণ করিয়া অত্যুচ্চ মিনারেটদ্বয় শোভিত মস্ক বা মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত করেন, কিন্তু সেই মিনারেট এখনও হিন্দুদিগের নিকট "বেণীমাধবের ধ্বজা" বা "মাধোজীকা ধরারা" বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। উহার নিম্নে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত আলোকস্তম্ভ বা 'দিওট' স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সেই ধ্বজস্তম্ভের উপর দীপ দিবার ব্যবস্থা ছিল। যাহা হউক উক্ত ধ্বজা বা মিনারেটটীর উচ্চতা প্রায় ১৪০ ফিট হইবে। উহার মধ্যে গোল সিঁড়ি আছে, তাহার সাহায্যে উপরে উঠিতে পারা যায়। উপরে উঠিয়া সমগ্র সহরের দৃশ্য সুন্দর পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই ইহার উপর উঠিয়া থাকেন

বিন্দুমাধবের সে প্রাচীন মন্দির নাই, নিকটেই এক নবনির্ম্মিত স্বতন্ত্র মন্দির মধ্যে বিন্দুমাধব বা বেণীমাধবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। দ্বারকাধীশেরও মন্দির এখানে বিদ্যমান। ইহার পরই নৃসিংহ-দাঁড়ার ঘাট। বৈশাখী নৃসিংহ-চতুর্দ্দশার দিন এখানে পূর্ব্বে মেলা হইত। 'বড়গণেশের' নিকট নৃসিংহ-মন্দিরে এখনও মেলা হয় ও তখন সন্ধ্যার সময় নরসিংহ-কর্ত্তৃক 'হিরণ্যকশিপু বিদারণ' অভিনয় হয়।

ইহার নিকটেই রামানন্দজীর এক প্রস্তর-পাদুকা রক্ষিত আছে।

কাশীর বিশ্ববিখ্যাত সাধু তৈলঙ্গস্বামীর আসন বা 'সাধনাশ্রম' এই ঘাটের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমমধ্যে স্বামীজীর স্থাপিত দক্ষিণ-কালিকার মূর্ত্তি ও বহু দেবী-যন্ত্র এখনও বিদ্যমান আছে। স্বামীজীর প্রস্তরনির্ম্মিত একটী সুন্দরমূর্ত্তি আশ্রমমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। কাশীতে আসিয়া সকলেরই তৈলঙ্গস্বামীর এই পবিত্র আশ্রম অতি অবশ্য দর্শন করা বিধেয়।

দুর্গাঘাট ও ব্রহ্মাঘাট ঃ—

দুর্গাঘাট ও ব্রহ্মাঘাট পাশাপাশী অবস্থিত। দুর্গাঘাটে 'দিনকর রাওয়ের' সুন্দর মন্দির আছে। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই স্থানেই অধিকাংশ বাস করেন। ব্রহ্মাঘাটটী 'বাজীরাও পেশোয়া' একবার মেরামত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজমন্দির ও গায়ঘাটাদিঘাট ঃ—

রাজমন্দির ঘাটটী, "কোটা-বুন্দির" রাজপরিবার কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। ঘাটের উপর উক্ত মহারাজের রাজবাড়ী অবস্থিত। অধিকাংশ মাড়োয়ারী ও দেশওয়ালারাই এই ঘাটে স্নানাহ্নিক করে। চৈত্র-তৃতীয়ার এখানে 'গৌ-গৌর' মেলা হয়। তাহাতে বহু মাড়োয়ারী নরনারীর ভিড় হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'শিতলাঘাটও' বলিয়া থাকেন।

ইহার পর 'লালঘাট' বা 'পাকাঘাট' নামে একটী ঘাট আছে। এই ঘাটটী অধুনা কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী 'বলদেব দাস বিড়লা' কিছু কিছু মেরামত করিয়া দিয়াছেন। ঘাটের উপর নিজের বসৎবাটী নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছেন। অনন্তর 'গায়ঘাট,' 'নারায়ণঘাট,' 'গোলাঘাট,' প্রভৃতি অনেকগুলি ঘাট বিদ্যমান আছে। গায়ঘাটে কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদির আমদানি ও রপ্তানি হয়।

ত্রিলোচনঘাট ও ত্রিলোচনশিব ঃ—

ত্রিলোচনঘাট বা পিলিপিলাতীর্থ। কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, যমুনা, নর্ম্মদা ও সরস্বতী গঙ্গার সহিত যে স্থানে মিলিতা হইয়া হাস্য করিতেছেন, তাহারই নাম 'পিলিপিলাতীর্থ'। এই তীর্থে স্নান ও পিতৃপিণ্ড প্রদান করিলে গয়া-পিণ্ডদানের আর আবশ্যকতা নাই। এই তীর্থে স্নান করিয়া নিকটস্থ ত্রিপিষ্ট-লিঙ্গ দর্শন করিলে জগতের কোটী তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। ত্রিলোচনঘাটটী বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির ও অট্টালিকায় সুশোভিত। নিকটেই প্রসিদ্ধ ত্রিলোচন মহাদেবের প্রাচীন মন্দির ছিল, তাহা জীর্ণ হইয়া যাইলে, পুণার 'নাথুবালা'

নামক কোন সধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়কর্ত্তৃক পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মন্দিরটী সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত, দেখিলে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হয়। কাশীতে আসিয়া এমন একটী শ্রেষ্ঠ দেবালয় দর্শন না করিলে, বাস্তবিকই কাশী-দর্শন যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কাশীমাহাত্ম্যে ত্রিলোচন-শিবলিঙ্গের এতই প্রশংসা লিখিত আছে যে, সমগ্র বারাণসীপুরী হইতেও বারাণসীস্থিত ত্রিলোচন মহাদেব শ্রেষ্ঠতর।

এই মন্দির ও ঘাটের নিকটেই 'আদিমহাদেবের' একটী স্বতন্ত্র মন্দির আছে। তাহাতে 'শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসের প্রাচীন আসন' প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতেই নাকি ব্যাসদেব উপবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিতেন। ইহার নিকটেই 'পার্ব্বতেশ্বরীর' একটী সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই মূর্ত্তি কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল, 'গোরজী' নামক জনৈক গুজরাটী ব্রাহ্মণ যিনি কাশীখণ্ড পাঠে কাশীর লুপ্ত দেবালয় ও মূর্ত্তিগুলির উদ্ধারমানসে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে এই নবমূর্ত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিলিয়ানালাঘাট :—

এখানে কোন ঘাট নাই, ঘাটের কোন বিশেষত্বও নাই। তবে কথিত আছে, পুরাকালে এই নালা কোন রাজপুরীর বা কাশীপুরীর 'গড়খাই'-রূপে খনিত হইয়াছিল, কালবশে সে পুরীও নাই, সঙ্গে সঙ্গে সে গড়খাইও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, গঙ্গাসঙ্গমে তাহার সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। বর্ষাকালে তাহা এখন সামান্য

জলস্রোতে প্রবাহিত হয়। নিকটে প্রস্তর-নির্ম্মিত হিন্দু ও বৌদ্ধ-অট্টালিকার ভিত্তি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তম্ভ ও নানা কারু-কার্য্য-সমন্বিত প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিলে, বহু পুরাকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী-সময়ে তিলিয়ানালার পার্শ্বেই উক্ত প্রস্তর ও স্তম্ভাদি-সহযোগে মকদুম সাহেব নামক মোসলমানদিগের একটী পীরের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। আরও কয়েকটী পুরাতন মস্‌জিদ্‌ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরেই বাঙ্গালা দেশের 'নূতন পঞ্জিকার' মত নয়াঘাট বা 'নূতনঘাট' নামক একটী ঘাটের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোনও বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলে যেমন তাহাতে সেই সময়ের মুদ্রিত 'নূতন পঞ্জিকাই' দেখিতে পাওয়া যায়, এ ঘাটটীও সেইরূপ; তাহার নির্ম্মাণকালে 'নূতন-ঘাট' বলিয়া পরিচিত হইলেও এক্ষণে ইহাকে সম্পূর্ণ পুরাতনঘাট বলাই সঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত নামের পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এই ঘাটটী 'চৈনপুর ঝঝুয়ার' বাবু 'নরসিংহ দয়াল' প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদঘাট ও রাজঘাট :—

পূর্ব্ববর্ণিত পবিত্র বারাণসীর উত্তর প্রান্তস্থিত এই প্রহ্লাদ-ঘাটটীই প্রস্তরনিবদ্ধ শেষ ঘাট, ইহার পর 'বরণাসঙ্গম' পর্য্যন্ত প্রস্তর-সোপান-শোভিত আর কোন ঘাট নাই। কাশীর উত্তর প্রান্তস্থিত জনপদের সকল নরনারী এই ঘাটেই তাহাদের স্নান আহ্নিক ও তর্পণাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। ঘাটের উপরেই একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ, বৃক্ষমূলে বহু প্রাচীন দেবমূর্ত্তি

ও শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে। নিকটে অনেক সুন্দর সুন্দর শিবালয় অবস্থিত। জগতের শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম-সাধক ভক্ত-চূড়ামণি বালক প্রহ্লাদের স্মরণার্থে এই ঘাটটী প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রাচীন প্রহ্লাদতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে সমগ্র কাশীর সোপানশ্রেণীযুক্ত সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই ঘাট অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রাজঘাটের বিশাল 'রেল-সেতু' ও 'কাশীষ্টেসন' দেখিতে পাওয়া যায়। রাজঘাটে স্নানার্থীদিগের সুবিধাজনক কোন পাথরবাঁধান ঘাট বা তাহার বিশেষ কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। প্রসিদ্ধ 'গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' এই ঘাটের উপর দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। যখন এখানে 'লৌহসেতু' প্রস্তুত হয় নাই, তখন গঙ্গার উভয় তীরস্থিত সেই সুদীর্ঘ পথ বহুসংখ্যক নৌকা দ্বারা এক প্রকার 'নৌ-সেতু' প্রস্তুত করিয়া সংযোগ করিয়া দেওয়া হইত। সেই প্রাচীন নৌ-সেতুর দৃশ্য অপরূপ ছিল। অধুনা একটী 'ভাসমান-সেতু' (পনটুন্-ব্রীজ) লোহার পিঁপার দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষার সময় গঙ্গার জল ও প্রবাহ বাড়িলে তাহা খুলিয়া দেওয়া হয়। অন্য সময় এই সেতুতেই সাধারণ লোকজন ও গাড়ি-পাল্কির যাতায়াত হয়। এই ঘাটের নিকটেই কাশীর রেলওয়ে-ষ্টেসন স্থাপিত হইয়াছে। 'ও, আর, রেলের প্রকাণ্ড 'রেলসেতুও' এই ঘাটের নিকট প্রস্তুত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ১৫টী স্তম্ভের উপর এই বিরাট লৌহ সেতু বিনির্ম্মিত। সেতুর দৈর্ঘ্য ৩৫৮ ফিট। এই সেতু নির্ম্মাণে 'রেলকোম্পানীর' পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। ভারতের তদানিন্তন

গবর্ণরজেনারেল 'লর্ড ডফ্‌রিণ' এই সেতুর দ্বার উন্মুক্ত করেন। সেই কারণ ইহা ডফ্‌রিণ ব্রিজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাজঘাটের উত্তর দিকে কাশী-ষ্টেসনের পূর্ব্বোক্ত রাজা 'বানার' বা 'বরণার', নামধেয় বিখ্যাত কাশীনরেশের প্রকাণ্ড দুর্গ ও রাজভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে 'মহম্মদ গজনভি' বরাবর বারাণসী পর্য্যন্ত আসিয়া রাজা বনারকে পরাস্ত করেন। রাজা যুদ্ধে নিহত হইলে, সেই দুর্গাদি ক্রমে নষ্ট হয়। পরে তাহা মোসলমান-আধিপত্য-সময়ে একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'লালসহ' নামক জনৈক মোসলমান ফৌজদার কিছুকাল এখানে গড়বদ্ধ অট্টালিকামধ্যে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কাশীধামে ইংরাজ-আধিপত্য প্রবল হইলে এই স্থানটী একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়া ছিল ; পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'সিপাহীবিদ্রোহের' সময় এই প্রাচীন গড়ের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি পতিত হয়। সেই সময় বহু ইংরাজ এই স্থানে আসিয়া অবস্থান পূর্ব্বক নগর ও আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস এই স্থানে ইংরাজের 'গোরা-বারিক'ও ছিল; কিন্তু সে সময় কোন কোন সেনানায়কের বিবেচনায় 'স্থানটি সেরূপ স্বাস্থ্যকর নহে', এইরূপ স্থির হওয়ায়, ক্রমে ইংরাজ সেনা-নায়কগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্থানটি দুর্গ-নির্ম্মাণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ও উপযোগী—একসময় উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলে এই দুর্গের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

উক্ত দুর্গ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ব্যতীত হিন্দু ও বৌদ্ধ-পুরাকীর্ত্তিরও বহুল আদর্শ এখানে পরিলক্ষিত হয়। যদিও কোন কোন নির্ম্মম মোসলমানের ভীষণ অত্যাচারে সেই সকল প্রাচীন

কীর্ত্তি প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই ভগ্ন ও চূর্ণাংশের মধ্যেও সেই অতীত যুগের জ্ঞান-গবেষণা ও শিল্পনৈপুণ্যের এতই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া বহু য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌ও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'ভারতের জাতীয়-সভা' বা 'ইণ্ডিয়ান্ কংগ্রেস' ও তৎ-সহযোগে যে বিরাট 'ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর' অনুষ্ঠান হয়, সে সমস্তই রাজ-ঘাটের এই বিস্তৃত স্থানে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ভারতের জীর্ণ ও প্রাচীন-কীর্ত্তিগুলি দেখিলে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহাদের পক্ষে রাজঘাটের এই সকল স্থান যে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

বরণা-সঙ্গম, সঙ্গমেশ্বর ও আদিকেশব :—

'রাজঘাট ষ্টেসন' হইতেই সহরের সকল কোলাহল, সমস্ত বিলাস-বৈভব পশ্চাতে ফেলিয়া, অতীত-গৌরব কাশীর এই প্রাচীন লুপ্ত-রাজধানী, প্রসিদ্ধ আদিকেশব ও সঙ্গমেশ্বরের পবিত্র মন্দিরপাদ স্পর্শ করিয়া ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহ বরণা-সঙ্গমে চলিয়াছে। 'বরণা' বারাণসীর উত্তর-সীমা-নির্দ্দেশক গঙ্গার বিখ্যাত উপনদী। ইন্দ্রাদি দেবগণ 'কাশী-ক্ষেত্র-বিঘ্নকর' দুরাচারদিগের উপদ্রব হইতে মুক্তি ও সহসা কাশীক্ষেত্র মধ্যে তাহাদের প্রবেশ নিবারণের জন্য, বিশ্বেশ্বর মন্দির হইতে তিন যোজন পশ্চিমস্থিত 'পুষ্পপুর' নামক গ্রাম হইতে এই বরণানদীর আবির্ভাব করিয়াছেন। বরণা অধুনা ক্ষীণাঙ্গী হইলেও এক সময়ে ইহা প্রবলা ছিল, তাহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। হায়, বৃদ্ধা বরণা সেই সকল অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শোকে

শীর্ণদেহে কোনরূপে যেন আত্ম-জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সেই জনাকীর্ণ নগর, সেই সৌধরাজি আজ কোথায় বিলুপ্ত,— তাহার চিহ্নস্বরূপ সেই সকলের জীর্ণাবশেষ ইষ্টকপ্রস্তরগুলি স্থানে স্থানে সমাহিত হইয়া আছে, আর অযত্নবর্দ্ধিত তরু-গুল্মসমূহ তাহারই উপর যেন সিংহাসন পাতিয়া বিশাল অরণ্যরাজ্য বিস্তার করিতে বসিয়াছে, বন্য পশু-পক্ষীরাও অবসর বুঝিয়া আনন্দ-কলরবে সেই অরণ্যপ্রান্ত মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া প্রাচীনা বিগতবৈভবা বরণা, যেন নিতান্ত শঙ্কিতা-ভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিলমধ্যে আত্ম-জীবন অর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

'গঙ্গা-বরণার' এই পবিত্র সঙ্গমের অধিপতি সঙ্গমেশ্বর 'মহাদেব' প্রাচীন মন্দিরমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। বরণার পূর্ব্বপ্রান্তে আর একটী প্রাচীন মন্দির' অবস্থিত, তাহা 'আদিকেশবের' মন্দির বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়—পুরাকালে ভগবান 'গুরুড়ধ্বজ,' লক্ষ্মীদেবী ও গরুড়ের সহিত একদা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক নিজেরই এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেই প্রথমে তাহার পূজা করেন। সেই অবধি এই মূর্ত্তি 'আদিকেশব' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ভক্তিভাবে এই আদিকেশবের পূজা ও অর্চ্চনা করিলে মানব অনায়াসে বৈকুণ্ঠ-লাভ করিতে সমর্থ হয়। এখনও মন্দিরটীর সেই শান্ত-গম্ভীর ভাব দেখিলে বস্তুতঃই চিত্ত বিমোহিত হইয়া যায়। এখানে সহরের সে চিত্ত বিক্ষেপক বিলাস-প্রলোভন নাই, দেবদর্শনার্থী-সাধরণ যাত্রীদলের নিত্য সমাগম নাই, স্থানটী বেশ শান্তিময়, মনে হয়, সহসা বুঝি কোন

অপার্থিব দেবভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিলে আপনা হইতে যেন হৃদয়ে শান্তি ও ভক্তিভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। সম্মুখে 'গঙ্গা-বরণা-সঙ্গম' পাদোদক তীর্থ। কাশীর তীর্থ-পঞ্চকের মধ্যে ইহাও অন্যতম। তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা হইতে ক্রমে বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্ত অসিসঙ্গম হইয়া পঞ্চক্রোশী কাশীধামের যাত্রা আরম্ভ পূর্ব্বক কাশী-প্রদক্ষিণান্তে বারাণসীর উত্তর সীমায় বরণাসঙ্গমে আসিয়া এই 'পাদোদক তীর্থে' স্নান করিতে হয়। এখানে ভাদ্রমাসে শুক্লাদ্বাদশীতে বামনোৎসবের মেলা হইয়া থাকে। 'মহাবারুণী' আদি পর্ব্ব উপলক্ষে বরণাসঙ্গমে খুব ভিড় হয়।

মোসলমানাধিপত্যের শেষসময়ে কাশীর ঘাটদৃশ্যঃ—

অসি-বরণা-বিস্তৃত বারাণসীর ঘাটগুলির একপ্রকার পরিচয় প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নানাকারণে কাশীর দৃশ্য অনেক-বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই স্মরণাতীত সত্য বা বৈদিক যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত কতবার কাশীর কতরূপ বিপর্য্যয় হইয়াছে, আবার সুবিধামত তাহার কত নূতন সংস্কার হইয়াছে, পাঠকগণের তাহা নিতান্ত অবিদিত নাই। বলা বাহুল্য দুর্ভাগ্যবশতঃ মোসলমান-আধিপত্য সময়েই ইহার বিকৃতির মাত্রা যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক মোসলমান রাজত্বের সে প্রখরভাব কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসিলে, যখন বাহ্যতঃ সাম্যনীতির প্রচারক, আদর্শ-নীতিনিপুণ ও বাণিজ্য-তান্ত্রিক সুচতুর ইংরাজজাতি ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণোদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, যখন ভারতবাসী সকলেই কি

যেন একটা মহা-অশান্তি, গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভারত-সম্রাট দিল্লীশ্বর 'সা-আলমের' সিংহাসনতল টলমল করিতেছিল, ভিতরে ভিতরে ফরাসী ও ইংরাজের প্রবল প্রতিযোগিতায় ইংরাজই যেন তাহাতে কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, এমন সময় সন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি ইংরাজসেনানায়ক 'সার রবার্ট ফ্লেচার' (Sir Robert Fletcher) দিল্লী-সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অযোধ্যার নবাব-উজীর 'সুজাউদ্দৌলার' বিপক্ষে কাশীর অন্য পারে মোগলবাহিনীর সমাবেশ করেন। সেই সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে জনৈক 'ইংরাজ-চিত্রশিল্পীও' ছিলেন, তিনি তখন পরপার, হইতে কাশীর যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, নিজ চিত্ত-বিনোদনজন্য তাহা অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। কত দিন সে চিত্রের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই বা বিশেষ আগ্রহ-সহকারে তাহার রক্ষাকল্পে কেহ কেমন যত্নও করে নাই, সুতরাং চিত্রখানি সহজেই স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি 'প্রাচ্য-ইতিহাস-সংগ্রহ-কারক' বিলাতের কোন সভা দৈবক্রমে তাহার সংবাদ পাইয়া তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করেন। 'ইণ্ডিয়ান-হিষ্টোরিক্যাল-সোসাইটী' বা ভারত-ঐতিহাসিক-সভার সাহায্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল হলের' জন্য বহুমূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। আমরা চিত্রখানি দেখিয়াছি এবং পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহার একটি প্রতিলিপি প্রদান করিতেছি। এইচিত্র ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। পাঠক দেখিবেন, বর্ত্তমান কাশী-সহরের

সহিত ইহার কতই পার্থক্য বিদ্যমান। চিত্রখানির সাহায্যে আমরা দেড়শত বৎসরেরও পূর্ব্বে কাশীর ঘাটগুলির কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। চিত্রখানিতে শিল্পীর নাম লিখিত ছিল, কিন্তু তাহা উদ্ধার করিতে পারি নাই, তবে তাহার নিম্নের লিখিত যে অংশটুকু পাঠ করিয়াছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা এই স্থলে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

"The famous and ancient city of Benares with a view of the great Mogal camp on the opposite side of the Ganges, the 15th January 1765 when Sir Robert Fletcher left his majesty and marched to attack Sujah-U d-daulah to con * *"

এই চিত্রটী যথার্থই যে, একখানি অভ্রান্ত ইতিহাসের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, বর্ত্তমান কাশীচিত্রের সহিত ইহা মিলাইয়া দেখিলে, অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাশীর অন্যান্য বিশেষ দর্শনীয় স্থান :—

এই বার কাশীর বিশেষ বিশেষ দর্শন-যোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থানসমূহের উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে মন্দির ও ঘাট বর্ণনার মধ্যে এক এক দিক ধরিয়া যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছি এক্ষণে ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা সম্ভব হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন স্থান গুলি পাঠকগণকে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া দর্শন করিতে হইবে।

নবদুর্গা বা নওদুর্গা ঃ—

দুর্গাপূজার নবরাত্রি উৎসব সময়ে কাশীতে প্রসিদ্ধ নবদুর্গা দেবমূর্ত্তি দেখিবার বিধি আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবী-কবচের মধ্যে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে।

"প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়িনী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টকম্॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ দিবসে শৈল পুত্রীর দর্শন করিতে হয়। আলাইপুরা ষ্টেসনের উত্তর দিকে মঢ়িয়া ঘাটে "দেবী শৈলপুত্রীর" মন্দির। দ্বিতীয় দিন দুর্গাঘাটে "দেবী ব্রহ্মচারিণী," তৃতীয় দিনে চৌকের নিকট লক্ষ্মীচৌতারায় চন্থু নাউএর গলিতে 'চণ্ডঘণ্টা' বা "চিত্রঘণ্টা দেবী", চতুর্থ দিনে প্রসিদ্ধ দুর্গাকুণ্ডের উপর দুর্গাজী বা "কুষ্মাণ্ডদেবী", পঞ্চম দিনে জৈতপুরায় "বাগেশ্বরী দেবী" ইনিই 'স্কন্দমাতা,' ষষ্ঠ দিনে সঙ্কটাঘাটের নিকট আত্মাবিশ্বেশ্বরের মন্দিরে "কাত্যায়নী দেবী", সপ্তম দিবসে কালকা গলিতে 'কালরাত্রি' "কালিকা দেবী" বা "কালীজী", অষ্টম দিবসে "দেবী অন্নপূর্ণা", ও "সঙ্কটা দেবীকে"ও কেহ কেহ "মহাগৌরী" বলিয়া উল্লেখ করেন, নবম দিবসে বুলানালার নিকট সিদ্ধমাতার গলিতে সিদ্ধিদাত্রী "সিদ্ধমাতা" দেবীর দর্শন করিতে হয়।

নদেশ্বর কোঠী ঃ—

নন্দীশ্বর বা নদেশ্বর মহাল্লায় ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকট মহারাজ

বেনারসের প্রসিদ্ধ 'নাদেশ্বর কোঠী' বা সহরস্থিত তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদ। এক সময় 'উজীর আলি-সাহেব' এখানে অবস্থান করিতেন। অধুনা মহারাজ-বাহাদুর উহার বিশেষ সংস্কার ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। এক্ষনে এই সুসজ্জিত অট্টালিকা মহারাজের বিশিষ্ট অতিথি-ভবনে পরিণত হইয়াছে। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্,' 'গবর্নর জেনারল' ও 'গবর্নর' আদি রাজপুরুষগণ আসিলে তথায় অবস্থান করেন।

ট্যাকশাল বা মিণ্ট-হাউস :—

ইং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে এই টঁ্যাকশাল বা মিণ্টহাউস নির্ম্মিত হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা মহারাজ-বেনারসের অধিকারে আসে। পূর্ব্বে এখানে সরকারি মুদ্রা প্রস্তুত হইত, পরে মহারাজের 'গেষ্টহাউস' রূপে ব্যবহৃত হয়, এক্ষণে "মহারাজকুমারের-সহর আবাস" রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই প্রাচীন অট্টালিকার বহু অংশ এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও নূতন ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিজয়ানগরম কী কোঠী :—

ভেলুপুরা হাঁসপাতালের নিকট বিজয়ানগরম্ বা বিজনা-গ্রামের অধিপতি মহারাজ বিজয়রাম গজপতি কে, সি, এস, আই, বাহাদুরের দ্বারা এই প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাটীর সাজ সজ্জা বাগান আদি সমস্তই দেখিবার যোগ্য। পূর্ব্বে ইহা "প্যারেড কোঠী" বলিয়াও পরিচিত ছিল। মহারাজ বেনারসের সহিত বিজনাগ্রাম মহারাজের সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা ছিল। যাহাতে বিষয়-সম্পদ ও সর্ব্ববিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠতর হন সে বিষয়ে তাঁহার একান্ত লক্ষ্য ছিল। কিন্তু

সুচতুর মহারাজ বেনারস গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিতে দেন নাই। এক্ষণে এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা বর্ত্তমান মহারাজের কনিষ্ঠভাই কুমার বিজয়ানন্দ গজপতিরাজের অধিকারে আছে।

জলেরকল বা ওয়াটার-ওয়ার্কস :—

পূর্ব্ববর্ণিত অসিঘাটের নিকট হইতে যে গঙ্গাজল নলপথে উত্থিত হয়, তাহা ভেলুপুরায় এই কলবাড়ীতে সুপরিস্কৃত হইয়া সহরময় পরিচালিত হইয়া থাকে।

বিলাসভবন :—

মামুরগঞ্জ মহাল্লায় "বিলাসপুরের" অধিপতি রাজা সার বিজয় চাঁদ সাহেব কে, সি, আই, ই; সি, আই, ই, বাহাদুরের এই বিলাস-ভবন অবস্থিত। রাজাবাহাদুর সময় সময় এই স্থানে আসিয়া কাশীবাস করিয়া থাকেন।

ভুলনপুরকোঠী :—

বালাপুর বা ভুলনপুর গ্রামে রাজা মাধোলালের সুন্দর রাজভবন অবস্থিত। রাজাসাহেব সর্ব্ব প্রথম সহর হইতে তাঁহার এই প্রাসাদ পর্য্যন্ত টেলিফোঁ আনিয়াছিলেন। রাজা মাধোলাল পূর্ব্বে 'মুন্সি মাধোলাল' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে সরকারী কর্ম্মচারী রূপে সবজজ ছিলেন। কাশীর সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। রাজা সাহেব পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে 'সরস্বতীভবন' লাইব্রেরী, চল্লিশ হাজার টাকা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বৃত্তির জন্য দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নানা সৎকীর্ত্তির কথা শুনা যায়।

অজমতগড়-প্রাসাদ বা প্যালেস ঃ—

রাজা মতিচাঁদ সাহেব সি, আই, ই, বাহাদুর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'মোড়য়াডি' ষ্টেসনের নিকট এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাসাদের বাহিরে 'মতিঝিলও' দেখিবার বস্তু। বর্ষাকালে এ স্থান বেশ মনোরম প্রতীত হয়। ঝিলের পার্শ্বেই 'হনুমানজীর' প্রতিমা, তাহা ভক্ত জনের বড়ই আনন্দপ্রদ। কাশী সহরের বাহিরে সৌখীন লোকদিগের ইহা একটী প্রমোদ-স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।

ভিঙ্গারাজ-ভবন ঃ—

স্বর্গীয় রাজা উদয় প্রতাপসিংহ ভিঙ্গাধিপতি দুর্গাজীর নিকট নাগোয়া যাইবার পথেরপার্শ্বে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভিঙ্গার রাণীসাহিবা এখানে কাশীবাস করিয়া থাকেন।

ভিঙ্গা-অনাথালয় ঃ—

হিন্দু-কলেজের নিকট কামাচ্ছা-মহাল্লায় পূর্ব্ব কথিত রাজা উদয় প্রতাপ সিংহ বাহাদুর এই অনাথালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। এখানে দীন অনাথ ব্যক্তিগণ থাকিতে পারে, তাহাদের আহারাদিরও বন্দোবস্ত আছে।

হাতুয়া-রাজবাড়ী ঃ—

চেৎগঞ্জের পিশাচমোচন তলাওএর পূর্ব্বদিকে 'সারণ' জেলার হাতুয়া মহারাজের এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাও দেখিবার যোগ্য।

রাজা শিবপ্রসাদের বারদ্বারী :—

কোম্পানীবাগের উত্তর দিকে রাজা শিব প্রসাদের প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বা বারদ্বারী অট্টালিকায় এক্ষণে রাজা বাহাদুরের পৌত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ প্রসাদ সিংহ এখানে বাস করেন।

কাশ্মীরীমল্লের হাবেলী :—

সিদ্ধেশ্বরী-মহাল্লায় সন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সরকারের তোষাখানার রক্ষক লালা কাশ্মীরীমল্লের বিনির্ম্মিত এই হাবেলী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা এক্ষণে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এক অংশে তাঁহারই বংশধরগণ এখনও বাস করেন, অন্য অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, ইহাতে প্রাচীন ধরণের 'দেওয়ানখানা,' 'তাই-খানা' আদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবকীনন্দনের হাবেলী :—

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে রামাপুরার অন্যূন দশবিঘা জমীর উপর এই প্রসিদ্ধ হাবেলী বা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এত বড় পুরাতন অথচ মজবুৎ বাড়ী কাশীর মধ্যে আর দেখা যায় না, আগাগোড়া পাথরের আবরণে গ্রথিত। মোসলমানযুগের স্থাপত্য-শিল্পের একটী সুন্দর আদর্শ। বাড়ীর সম্মুখে চবুতারা ও মন্দিরও আছে। প্রয়াগ ও কানপুরের জমিদার বাবু দেবকীনন্দন সিংহ এই বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কাঠকে হাবেলী :—

'চৌখাম্বা' মহাল্লায় গোয়লিয়ার মহারাজের বিনির্ম্মিত 'পঞ্চ-মহলী' কাষ্ঠ নির্ম্মিত এই হাবেলী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আগাগোড়া কেবল কাষ্ঠ দ্বারাই নির্ম্মিত। আজ কাল এই

হাবেলিতে দেশী কালাবত্তুর কারবার হইয়া থাকে।

বিশ্বম্ভরদাসের হাবেলী :—

'বুলানালায়' সিঁড়ির উপরে উঠিলে এই ত্রিতল পাথরের কয়েকটী প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। আজ কাল এই হাবেলী নেপালী রাজগুরুর অধিকারে আছে।

কাশীর এই 'সাড়ে তিন হাবেলীর' বিষয় এখনও প্রসিদ্ধ

টাউনহল :—

টাউনহলের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহা 'কালভৈরব' মহাল্লার নিকটে 'বিশেশ্বর-গঞ্জের' পশ্চিম দিকে এবং 'চকের' উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ভূতপূর্ব্ব বিজনাগ্রাম বা বিজয় নগরমের মহারাজ বিজয়রাম গজপতি কে, সি, এস, আই, বাহাদুর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিজব্যয়ে এই হলগৃহ প্রস্তুত করিয়া সাধারনকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' (পরে ৭ম এডোয়ার্ড) এই টাউনহলের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এই হলের দৈর্ঘ্য ৭৩ফুট এবং প্রস্থ ৩২ ফুট। হলের মধ্যে বিজয়-নগরমের মহারাজার ও মিউনিসিপ্যালিটীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রধান দ্বারদিগের চিত্র এবং রাজা দেবনারায়ণ সিংহ, কে, সি, এস, আই, ও কাশীর ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার মিঃ র‍্যাণ্ডিচির আবক্ষ (বাষ্ট) প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। এখানে সাধারণ সভা ও ব্যাখ্যান্ আদি হইয়া থাকে। এই হলের সংলগ্নগৃহে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট-হইয়া থাকে। টাউনহলের বাহিরে যে বিস্তৃত ময়দান আছে, তাহাতে বড় বড় সাধারণ মিটিং আদি হইয়া থাকে। সময় সময় শিল্পকলা প্রদর্শনীও হইয়া থাকে।

গোশালা :—

কাশীর সাধারণ 'গোশালা' উক্ত টাউনহলের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। রাজা মতিচাঁদ প্রভৃতি সদাশয় হিন্দুগণ এই গোশালার পরিচালক। বহু হিন্দু ও জৈন মহাজন ইহাতে সহায়তা করিয়া থাকেন।

কোতোয়ালী :—

টাউন হলের পার্শ্বেই কাশীর কোতোয়ালী বা 'পুলিস-আফিস' অবস্থিত। এখানে 'ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস' ও ইনিস্‌পেকটার আদি অবস্থান করেন। কোতোয়ালীর সম্মুখে সুন্দর ফোয়ারা ও একটী ধুপ্‌ঘড়ি বা 'সান-ডাইল' প্রতিষ্ঠিত

তারঘর :—

কোতোয়ালীর পূর্ব্বদিকে 'টেলিগ্রাফ-আফিস' বা তারঘর। পূর্ব্বে এইস্থানেই সহরের প্রধান তারঘর ছিল, এক্ষণে তাহা ক্যাণ্টনমেণ্টে উঠিয়া গিয়াছে। এই বাড়ী এখন বিশ্বেশ্বর-গঞ্জের পোষ্ট-আফিস ও টেলিগ্রাফ-আফিস রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নাগরীপ্রচারিণী সভা :—

সন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সভা সামান্য ভাবে স্থাপিত হয়। অনন্তর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে টাউনহলের নিকট উক্ত তারঘরের সম্মুখে ও 'ময়দাগিনের' কোম্পানিবাগের পূর্ব্বদিকে এই নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। মহারাজ বেনারস ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সংযুক্ত প্রদেশের-ছোটলাট সর জেমস্ লাটুশ সাহেব ইহার দ্বার উন্মুক্ত করেন। এখানে সভা-ভবন, পুস্তকালয়,

ময় হরগৌরীর আদেশে ব্রহ্মা কাশীতে প্রকট-রূপ ধারণ করিয়া দানিন্তন কাশীর অধীশ্বর মহাপুণ্যবান,'দিবোদাসের' সহায়তায় ই স্থানে যথাক্রমে দশটী 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই কারণ ইহা 'দশাশ্বমেধতীর্থ' বলিয়াও খ্যাত। ঘাটের উপর "দশাশ্বমেধ-কুণ্ড" নামে একটী ক্ষুদ্র কূপের অস্তিত্ব আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে এই স্থানটী "রুদ্রসরোবর" লিয়া বিখ্যাত ছিল, পরে ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় হইতে দশাশ্বমেধ বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই স্থানে স্নান করিলে জীব সর্ব্ব-পাপ ও সর্ব্ব-রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং স্নানান্তে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। এই তীর্থে তিনটী মাত্রও আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। "ব্রহ্মেশ্বর" নামে এখানে আর একটী শিবলিঙ্গ আছেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এত শিবলিঙ্গ ও মন্দির আছে যে, সহজে তাহার সংখ্যা করা এক প্রকার অসম্ভব।

দশাশ্বমেধঘাটটী স্থিরবিশ্বাসী-ধর্ম্মাত্মার যেমন আদরের পুণ্যময় তীর্থ, তেমনি সর্ব্ব সাধারণ গৃহস্থেরও নিত্য সংসার-পরিচালনার সহায়ক প্রধান স্থান। অর্থাৎ এই ঘাটের উপরেই কাশীর সর্ব্বপ্রধান বাজার ও বিপনিশ্রেণী। কাশীবাসী সকলকেই প্রতিদিন এই স্থান হইতে সমস্ত আহার্য্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। কাশীর মধ্যে দশাশ্বমেধের মত সকল জিনিস পাইবার উপযোগী এমন 'বাজার' আর নাই। ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ, চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে এই স্থানটী

যেমন সুবিধাজনক, কাশীবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে তেমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দশাশ্বমেধের নিকট হইতেই বাঙ্গালীটোলা আরম্ভ হইয়াছে। সহসা এই স্থান দেখিলে মনে হয়, বুঝি বা বাঙ্গলা দেশেরই কোন প্রধান সহরে আমরা বিচরণ করিতেছি। কাশীর যত পাল-পার্ব্বণ সবই দশাশ্বমেধঘাটে বসিলে দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়া-দশমী ও অন্যান্য পূজা উপলক্ষে বাঙ্গালীদের প্রতিমা-নিরঞ্জনাদি এই ঘাটেই হইয়া থাকে। ঘাটটী পূর্ব্বে যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিতান্ত অল্প স্থানের মধ্যে সম্ভবপর নহে। সেই অতীত যুগে যখন এই যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই এ স্থান এরূপ দুর্ম্মূল্য ছিল না, এবং পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত ঘাটগুলির কল্পনাও তখন হয় নাই, সুতরাং এখন এ স্থল যেমন বহু মন্দির ও অট্টালিকাদিতে ঘনাবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সে কালে এরূপ ছিল না, চতুর্দ্দিকেই যজ্ঞানুকূল বিস্তৃত ক্ষেত্র পতিত ছিল। ইংরাজ-আধিপত্যের অব্যবহিত পূর্ব্বেও কাশীর ঘাটসমূহের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কোন প্রাচীন চিত্র হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। যাহাহউক এক্ষণে প্রয়াগঘাট ও দশাশ্বমেধঘাট বলিয়া "বেনারস সিটী-মিউনিসিপালিটী" কর্ত্তৃক দুইটী স্বতন্ত্র ঘাটের পরিচয়-ফলক (Sign-board) দেখিয়া অনেকেই নানা কল্পনা ও তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে এরূপ সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। 'প্রয়াগঘাট' বলিয়া যাহা এক্ষণে পরিচিত হইতেছে তাহাও যেমন দশাশ্বমেধের একাঙ্গ, আধুনিক দশাশ্বমেধ

পাঠাগার, প্রাচীন পুঁথী ও হিন্দীর প্রসিদ্ধ লেখক ও কবিগণের চিত্র দেখিবার যোগ্য। অধ্যাপক শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরদাস ক্ষত্রী বি, এ, মহাশয় ইহার উন্নতিকল্পে সারা-জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কারমাইক্যাল লাইব্রেরী :—

'জ্ঞানবাপীর' সিঁড়ির নিকট 'চকের' দক্ষিণ দিকে এই 'লাইব্রেরী' সন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর মুন্সি সঙ্কটাপ্রসাদ ক্ষত্রী মহাশয় বেনারসের তদানিন্তন কমিশনার মিঃ সি, পি, কারমাইক্যালের স্মৃতি রক্ষা-কল্পে স্থাপনা করিয়াছেন। এখানে হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক এবং ভিন্ন ভিন্ন বহু ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি পড়িবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। কাশীর মধ্যে এই পাঠাগারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মালতী-শারদাসদন :—

এই লাইব্রেরী 'ঠাঠেরি-বাজারের' সম্মুখে রাস্তার উপর স্থাপিত। রায় কৃষ্ণচন্দ্রজী রাণী মালতীকুঁয়রের স্মৃতি রক্ষা-কল্পে ইহা স্থাপন করিয়াছেন। সন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ কাশী-নরেশ এই লাইব্রেরীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এখানেও সর্ব্ব-সাধারণে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

আর্য্যভাষা-পুস্তকালয় :—

পূর্ব্ব কথিত "নাগরীপ্রচারিণী সভা" ভবনেই এই লাইব্রেরী এক্ষণে সম্মিলিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বাবু গদাধর সিংহ মহাশয় সন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজের "আর্য্যভাষা পুস্তকালয়"

'নাগরীপ্রচারিণী-সভাকে' দান করিয়া গিয়াছেন। সভার পরিচালকগণ ক্রমেই ইহার উন্নতি বিধান করিতেছেন।

বঙ্গ-সাহিত্যসমাজ :—

কাশী-বাঙ্গালীটোলায় "বঙ্গ-সাহিত্যসমাজ" ও "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা—বারাণসী" বাঙ্গালার বাহিরে প্রবাসী-বাঙ্গালী দিগের উদ্যোগে কাশীর এই সভা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে অতীব গৌরবের বস্তু।

ক্লক-টাওয়ার ও সিটী-পোষ্ট-আফিস :—

'নীচীবাগের' নিকটেই বেনারস-সিটী পোষ্ট-অফিস। ইহার সম্মুখে এই ক্লক-টাওয়ার বা ঘণ্টাঘর স্বর্গীয় বেনারস মহারাজ ঈশ্বরী-প্রসাদ-নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাশীর প্রসিদ্ধ স্থাপিক মাণিকচাঁদের পিতা স্বহস্তে এই ঘড়িটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল।

মিউনিসিপ্যাল আফিস :—

চেৎগঞ্জের রাস্তার উপর মিউনিসিপ্যালিটীর নূতন আফিস বা 'দফ্তরখানা' কয়েক বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপ্যাল 'চিফ অফিসার, বা প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক মহাশয়ের আফিস আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর মিটিং এই স্থানেই হইয়া থাকে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারী ঃ—

কাশী সহরের বাহিরে বরণা নদীর পুল পার হইয়া উত্তর দিকে সরকারী আদালত-গৃহ। 'দেওয়ানী-কাছারী' দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত। এখানে জজ, সবজজ বা 'সদর-আলা,' মুন্সেফ ও রেজিষ্ট্রেসন আদালত আছে। ইহার পিছনে কালেক্টরী, ফৌজদারী, ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের আদালত ও দফতর আছে।

সেণ্ট্রাল-জেল ঃ—

পাঁড়েপুর যাইবার রাস্তায় এই জেলখানা অবস্থিত। এখানে ২৫৬ জন কয়েদী থাকিতে পারে, এতদ্ব্যতীত ১৭৭ জন স্ত্রী-কয়েদী থাকিবারও বন্দোবস্ত আছে। কারাগৃহের চারিদিকে উচ্চ দেওয়াল দিয়া ঘেরা, সম্মুখে প্রকাণ্ড লোহার ফটক আছে। সর্ব্বদা সান্ত্রী বা সশস্ত্র প্রহরীগণ পাহারা দিতেছে।

ডিষ্ট্রিক্ট-জেল ঃ—

এই জেলবাড়ী সন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে ১১৭ জন কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। এখানে স্ত্রী-কয়েদী থাকিবার স্থান নাই।

এই উভয় কারাগৃহের কয়েদীরা গালিচা, সতরঞ্চী, কম্বল, নেয়ার, মুঞ্জের দড়ি, চাটু ও পাপোস আদি প্রস্তুত করে। সেণ্ট্রাল-জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব এই দুইটী জেলেরই পর্য্যবেক্ষণ করেন। মেজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা লইয়া যে কোন লোক জেল-পরিদর্শন করিতে পারেন। জেলের তৈয়ারী জিনিষ

পত্র জেল-সংলগ্ন আফিসঘরে সাধারণ লোক যাইয়া খরিদ করিয়া আনিতে পারে।

কিং এডোয়ার্ড হাঁসপাতাল :—

ইংরাজী সন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেনারসের রাজা, জমিদার ও রেইজগণ প্রিন্স-অফ-ওয়েলসের আগমনের স্মারকরূপে এই হাঁসপাতালটী "প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্" হাঁসপাতাল নামে কবিরচৌরায় স্থাপনা করেন। এক্ষণে ইহাই "কিং এডোয়ার্ড হাঁসপাতাল" নামে পরিবর্ত্তিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে সিবিলসার্জ্জন সাহেব নিত্য একবার আসেন, রোগীদের দেখেন এবং এসিসটেণ্ট সার্জ্জন আদি ডাক্তাররা সর্ব্বদাই থাকিয়া দেখা শুনা ও রোগীদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অসহায় রোগীদের থাকিবার ও পথ্যাদিরও ব্যবস্থা আছে। এখানে চক্ষু-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে, কাশীর প্রসিদ্ধ চক্ষু-পরীক্ষক ও চিকিৎসক কে, কৃষ্ণ, ব্রাদার্সের শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাবু প্রতি সোম ও শুক্রবার এই হাঁসপাতালে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরী-মেমোরিয়ল জেনানা হাঁসপাতাল :—

ইহাও কবিরচৌরায় উক্ত হাঁসপাতালেরই পশ্চিম দিকে স্থাপিত। স্বর্গীয় বেনারস-মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহের স্মরণার্থ সন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে কেবল স্ত্রী-রোগিণী ও শিশুদিগের চিকিৎসা হইয়া থাকে।

পশু-চিকিৎসালয় :—

উক্ত হাঁসপাতালের আরও কিছু পশ্চিম দিকে এই পশু

চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। এখানে গো, অশ্ব, কুকুর আদি সকল পশুদেরই চিকিৎসা হইয়া থাকে।

ভেলুপুরা হাঁসপাতাল ঃ—

বিজয়নগরম্ বা বিজনাগ্রাম রাজবাড়ীর সম্মুখেই এই হাঁসপাতাল। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের খরচায় ইহা পরিচালিত হয়। সন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারী ডাক্তার এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন প্রভৃতি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের থাকিবার ও পথ্যাদিরও বন্দোবস্ত আছে। ইহার অন্তর্গত জেনানা বা স্ত্রী-রোগীদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে।

শ্রীরাম-লক্ষ্মীনারায়ণ হাঁসপাতাল ঃ—

এতদ্সম্বন্ধে পূর্ব্বে গোদোলিয়া অংশে বলা হইয়াছে। এখানেও ভাল ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। সন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইউ. পির ছোট-লাট সাহেব 'সর জেমস্ মেষ্টন্' মহোদয় ইহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। কাশীর শ্রীরাম-লক্ষ্মীনারায়ণ কনোড়িয়া প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ঃ—

এতদ্সম্বন্ধে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে রোগীদিগকে অতি যত্ন সহকারে সেবা করা হয়।

মহমূরগঞ্জ হাঁসপাতাল ঃ—

রাজা মতিচাঁদ সাহেবের অজমৎগড়-প্রাসাদেই এই হাঁসপাতাল স্থাপিত আছে। এখানে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা হয়।

চৌকাঘাট ঘোষাল হাঁসপাতাল ঃ—

হুকুলগঞ্জে এই হাঁসপাতাল রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের সহায়তায় সন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে চক্ষু চিকিৎসাও হয়।

এতদ্ব্যতীত সিগবায় খৃষ্টান-জেনানা-হাঁসপাতাল আদি অন্যান্য অনেক চিকিৎসালয় আছে।

কোম্পানীবাগ বা মিউনীসিপ্যাল গার্ডেন ঃ—

পূর্ব্বোক্ত মন্দাকিনী তীর্থ উপলক্ষে এই বাগানের কথা বলা হইয়াছে। ইহা টাউনহলের সম্মুখে ও নাগরী-প্রচারিণী-সভার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বেনারস-মিউনিসিপ্যালিটীর তত্ত্বাবধানে এই বাগান রক্ষিত। সাধারণের বেড়াইবার ও বসিবার উত্তম বন্দোবস্ত আছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়নাগাম বা বিজয়নগরম্ এই বাগানের অন্তর্গত পুষ্করিণীর (যাহা মন্দাকিনী বা ময়দাগীন তীর্থ বলিয়া পরিচিত) তিন দিকের পাকা ঘাট বাঁধাইয়া দিয়া ছিলেন।

ভিক্টোরিয়া পার্ক ঃ—

চেৎগঞ্জের রাস্তার উপর 'পিয়রী' মহল্লার নিকট এই পার্ক স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত। ইহা 'বেনীয়া-পার্ক' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। বাগানের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আবক্ষ (বাষ্ট) প্রতিমূর্ত্তি আছে। এক পার্শ্বে একটী ছোট ঝিল আছে। এখানেও ভদ্রলোকদিগের বেড়াইবার বেশ সুবিধা আছে। দশাশ্বমেধ ঘাট রোড বা বাঙ্গালীটোলার নিকটে বলিয়া ইহা বাঙ্গালীদের বায়ু-সেবনের সুন্দর স্থান।

গোকুলচন্দ মেমোরিয়াল পার্ক :—

বিশ্বেশ্বর-গঞ্জের পূর্ব্বদিকে কিছু দূর যাইলেই এই পার্ক দেখা যায়। পূর্ব্বকথিত "মৎসোদরী তির্থের" এই পরিণাম। রায়বাহাদুর বটুকপ্রসাদ ক্ষত্রী নিজ পিতার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে সন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বেনারসের কমিসনার মিঃ হপকিন্সের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন। রায়বাহাদুরের পিতার এক প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তিও ইহার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চক্রোশী কাশী :—

কাশী যে বহু বিস্তৃত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে 'আসি-ক্রোশী কাশীর' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 'পঞ্চ-ক্রোশী' কাশীরই মাহাত্ম্য অধিক। কাশীতে নিত্যযাত্রা, অন্তর্গৃহ-যাত্রা, পঞ্চ-ক্রোশী যাত্রা আদি বহু যাত্রা বিধি আছে। এ সকল বিষয় আমার কাশী মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি। অগ্রহায়ণ মাসে পঞ্চ-ক্রোশী যাত্রায় খুব ভিড় হয়। দলে দলে লোক তখন এই পঞ্চক্রোশীর পথে কেহ এক দিনে কেহ তিন দিনে কেহ বা পাঁচ দিনে এই পঞ্চক্রোশী পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া পথের উভয় পার্শ্বস্থ দেবালয় ও তীর্থাদি দর্শন করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র কৃত পাপক্ষয় ও আজীবন কাশীবাস ফলসম পুণ্য প্রাপ্তিকামনায় উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সময়ে বৎসরে দুই বার এই যাত্রা করিতে হয়। 'প্রথম দিবসে' মণিকর্ণিকা' হইতে কর্দ্দমেশ্বর প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, 'দ্বিতীয় দিবসে' কর্দ্দমেশ্বর হইতে ভীমচণ্ডী প্রায় চারি ক্রোশ পথ, 'তৃতীয় দিবস' ভীমচণ্ডী

হইতে রামেশ্বর প্রায় পাঁচক্রোশ পথ, 'চতুর্থ দিবসে' রামেশ্বর হইতে কপিলধারা প্রায় সাড়ে সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া 'পঞ্চম দিবসে' কপিলধারা হইতে পুনরায় মণিকর্ণিকাতে উপস্থিত হন। পদব্রজে অসমর্থ হইলে কেহ কেহ যানারোহণেও এই যাত্রা করিয়া থাকেন। এই পথ ও পথের ধারের মন্দিরাদি প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবাণী কর্ত্তৃক বহুব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছিল। এখনও তাঁহার সেই কীর্ত্তি-কথা দেদীপ্যমান রহিয়াছে

পঞ্চক্রোশী-মন্দির ঃ

কাশীর 'গোলাগলিতে' পঞ্চক্রোশীর মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে পঞ্চক্রোশী পথের প্রধান প্রধান দেবতা ও তলাও আদির স্থান নির্ম্মিত আছে। পঞ্চক্রোশী যাত্রায় যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা এই মন্দিরস্থ দেবতাদির দর্শন করিলেই সম্পূর্ণ যাত্রার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাও কাশী-দর্শনাভিলাষী ভক্তগণের দর্শন যোগ্য স্থান।

কাশী শিক্ষাপীঠ ঃ—

কাশীধাম জগতের যেমন আদি নগরী তেমনই ইহার শিক্ষাপীঠও অতি প্রাচীন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ ধরিয়াই কাশীর শিক্ষাপীঠ নিজ শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্পাদি বেদানুগত সকল বিদ্যারই মূল ভিত্তি সেই আদিযুগে কাশীতেই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যে বিরাট বিদ্যামন্দির যুগযুগান্তব্যাপিয়া ধীরে ধীরে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার বিমল অঙ্গ এখনও ম্লান

হয় নাই, তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব এখনও মন্দীভূত হয় নাই, এখনও বেদাদি সনাতন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উপলক্ষে ভারতের চারি প্রান্ত হইতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক আসিয়া এই কাশী বিদ্যাপীঠ সুশোভিত ও অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যাদি ব্যতীত কাল-ধর্ম্মানুগত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাতেও কাশী পশ্চাৎপদ নহে। কাশীর প্রসিদ্ধ 'কুইন্স-কলেজ', 'জয়নারায়ণ-কলেজ,' 'হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালয়,' 'হিন্দু-কলেজ' ও 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' আদি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রাদির মধ্যে যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কাশীর আদি বিদ্যাপীঠের পরিচয় পাওয়া যায়, বৌদ্ধযুগের চীন পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণ হইতে যেমন কাশীর মধ্য সময়ের বিদ্যাবৈভবের কথা জানিতে পারা যায়, শত বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বের অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বিবরণ হইতে কাশীর বিদ্যাচর্চ্চার সুন্দর বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে। তখন "কাশীর দুর্গাঘাটে উনবিংশজন অধ্যাপকের নিকট প্রায় পাঁচশত বিদ্যার্থী, নারদঘাটে চারি জন অধ্যাপকের নিকট প্রায় পঁচাত্তর জন, হনুমানঘাটে নয় জন অধ্যাপকের নিকট প্রায় দেড়-শত জন এবং দশাশ্বমেধে ষোল জন অধ্যাপকের নিকট প্রায় আড়াই শত বেদ বিদ্যার্থী অর্থাৎ তখন মোট প্রায় এক সহস্র বিদ্যার্থী কেবল বেদ শিক্ষা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত দশাশ্বমেধ, মঙ্গলা-গৌরী ও দুর্গাঘাটে তিন জন অধ্যাপকের নিকট প্রায় ছাপ্পান্ন জন অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য কাশীর নানা স্থানে প্রায় আড়াই শত বিদ্যার্থী ছিল। ব্রহ্মাঘাটে কেবল কাব্যা-ধ্যায়ী দশ জন ছিল। দশাশ্বমেধ ও হনুমানঘাটে দুই জন

বেদান্তশাস্ত্রীর নিকট চল্লিশ জন বেদান্ত পড়িত। দশাশ্বমেধে দশ জন বিদ্যার্থী ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। নায়ক মহল্লায় ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র পনের জন, ব্রহ্মাঘাটে ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্র পনের জন, বাঙ্গালীটোলায় প্রায় পঞ্চাশ জন ন্যায় শাস্ত্র এবং দারানগর ও রামঘাটে প্রায় পঁইত্রিশ জন জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিত। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ আদিরও অধ্যাপন ও অধ্যাপনা ছিল।”

এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে শত বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় দেড় হাজার বিদ্যার্থী কাশীতে বেদাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। দানবীর উদার ও ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীমন্তগণ সেই সকল বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে তখন বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালা ও অন্নক্ষেত্রের সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কাশীর নানা বিষয়ে বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও অল্পদিনের মধ্যে লোক জনের বসবাস অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সেই অনুপাতে বিদ্যার্থীর সংখ্যারও বৃদ্ধির সীমা নাই। অধুনা তাহাদের পঠন পাঠনের অসুবিধা না থাকিলেও দরিদ্র ও প্রবাসী ছাত্রদিগের থাকিবার ও অন্নক্ষেত্র বা ছত্রের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাহা আছে তাহা কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থপরতার ফলে আদৌ সুব্যবস্থা নাই। যাহা হউক কাশীতে যে কোন প্রকারেই হউক বিদ্যা চর্চ্চার অভাব নাই, বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে।

অধুনা কাশীতে যতগুলি বিদ্যালয় বা পাঠশালা আছে তন্মধ্যে কুইন্সকলেজই প্রধান ও পুরাতন বলিতে হইবে
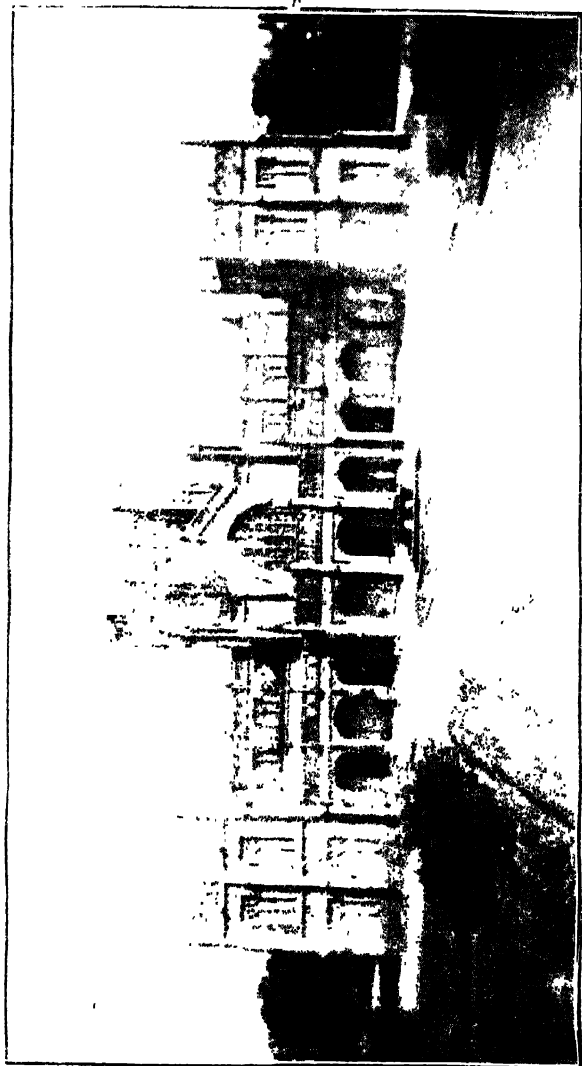
সুতরাং প্রথমে এতদ্‌সম্বন্ধেই বক্তব্য বিষয় বলিয়া পরে অন্যান্য পাঠশালার বিষয় উল্লেখ করিব।

কুইন্স কলেজঃ—

কাশীর এই কুইন্স কলেজ জগৎগঞ্জের রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তাহার বহু দিন পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মেজর কিটো মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১২৭০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই বিদ্যাগৃহ নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলেজের যে যে অংশ ব্যক্তি বিশেষের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে দাতাদিগের নাম প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের ইহা একটী চরম আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কার্য্য চুনারের পাথরেই নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে কলেজ ও লাইব্রেরী এবং পশ্চিম-দিকে মেজর কিটোর সংগৃহীত সারনাথের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তরাদি ও বহুবিধ স্থাপত্য এবং ভাস্কর শিল্পের প্রাচীন আদর্শের 'মিউ-জিয়ম' আছে। প্রাঙ্গনে সুন্দর জলের ফোয়ারা, জলের চৌবাচ্চা ও ধূপঘড়ী আছে। এতদ্ব্যতীত একটী সমুচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ প্রোথিত আছে। কেহ ইহাকে অশোক-স্তম্ভ কেহবা ৪র্থ শতাব্দীর গুপ্ত-রাজাদিগের নির্ম্মিত স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার উচ্চতা প্রায় ৩২ ফিট হইবে। মেজর কিটো গাজীপুর হইতে ইহা আনিয়াছিলেন। স্তম্ভের গাত্রে প্রাচীন অক্ষরে কত কি লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের তাহা আদরের বস্তু।

কুইন্সকলেজকে কেবল কাশীরই শিক্ষাপীঠ না বলিয়া সমগ্র

ভারতের শিক্ষাপীঠ বলিতে অত্যুক্তি হয় না। কারণ সরকারী শিক্ষাবিভাগের সহায়তায় ইহাই বোধ হয় প্রথম হইবে। প্রথম হইতে এখানে সংস্কৃত শিক্ষারই সূত্রপাত হয়। ইহা একাধারে সংস্কৃত কলেজ ও ইংরাজী আর্ট ও সায়ান্স কলেজ। এখানেব সংস্কৃত বিভাগে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা উপলক্ষে বাঙ্গলার পণ্ডিত মহাশয়দিগের যথেষ্ট কৃতীত্ব ও একছত্র-আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজী ও বিজ্ঞান বিভাগেও বঙ্গীয় বহু অধ্যাপক বিশেষ সম্মানের সহিত এখানে কার্য্য করিয়া কলেজের উন্নতি বিধান করিয়াছেন।

এক্ষণে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অন্যান্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরে বলিব।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—

কাশীতে এই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ভাবতের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বেনারসের মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ ইহার জন্য নাগোয়ার নিকট দৈর্ঘ্যে দুই মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল পরিমাণ বিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছেন, যথেষ্ট অর্থও সহায়তা করিয়াছেন। ইহার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারই একান্ত যত্নে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের গবর্ণর-জেনারল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি স্থাপনা হয়। গঙ্গার জল বর্ষাকালে এই ভিত্তি পর্য্যন্ত আসায় গঙ্গাতট হইতে সামান্য দূরবর্ত্তী স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও জমী খরিদ করা হইয়াছে, এক্ষণে ইহার বিস্তার আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।
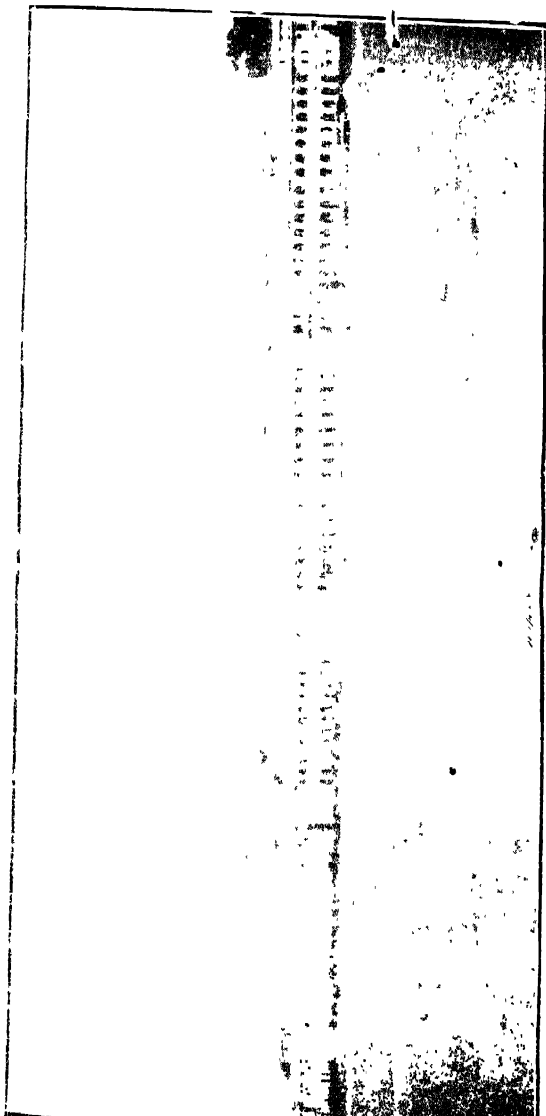
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। (২৮৩ পৃষ্ঠা)
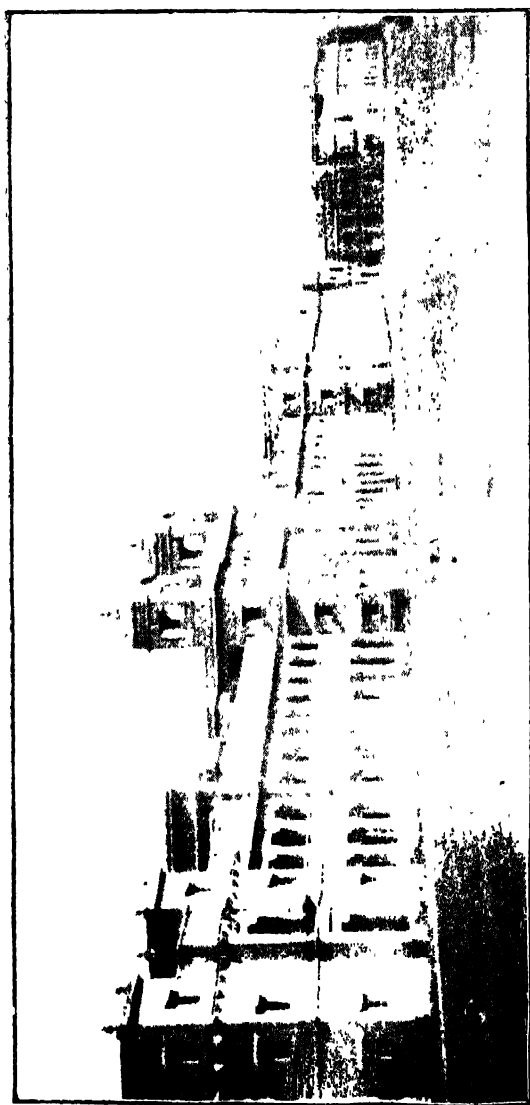
াতে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ, জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ধনীব্যক্তি থষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ক্রোড়াতিরিক্ত টাকায় এই বিশ্ব-ালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার জন্য কেবল পঞ্চাশ লক্ষ কা স্থায়ী কোষরূপে জমা আছে। কলেজ গৃহ, হোষ্টেল, পথ, ল কজা যন্ত্রাদি আসবাবপত্র আদিতেও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ক্ষণে কাশীর দক্ষিণ প্রান্তে যাইলে যেন এক স্বতন্ত্র নূতন সহরের াভা পরিলক্ষিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মহারাজ-হাদুর কাশ্মীর, মহিশূর ও বিকানির প্রত্যেকে দ্বাদশ সহস্র দ্রা, যোধপুর ও পাতিয়ালা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র মুদ্রা এবং বৃটিশ-ভর্ণমেণ্ট এক লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত আরও বহু দান প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্ষণে তলক্ষেরও অধিক বার্ষিক আয় হইয়াছে। এই আয়ের অনুপাতে য়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে নানা য়ে বহু সুবিজ্ঞ অধ্যাপক আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমত ধ্যাপনা করিতেছেন।

ইহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্টস কলেজ, সায়ান্স কলেজ লবরেটরী বা রসায়ন গৃহ, ছাত্রাবাস, ব্যায়ামশালা, পুস্তকালয়, ষধালয়, ডাক ও তার ঘর, এবং অধ্যাপক-নিবাস আদি প্রস্তুত ইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি বিদ্যার্থিণীদিগের বাসের জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

সেই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উচ্চ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে প্রতি একাদশীতে কথা ও হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। নিত্য বহু দেশ বিদেশ হইতে নানা লোক বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করিতে আসেন। কাশীর হিন্দু কলেজ এখন হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিত্য নূতন বিভাগে বহু ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে। কাশীর এই বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থই এক অপূর্ব্ব বস্তু, প্রত্যেক হিন্দু ও দেশবাসীর যে, পরম আদরের ধন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কাশীর অন্যান্য বিদ্যালয়ঃ—

'জয়নারায়ণ-কলেজ' অধুনা ইংরাজী স্কুল-বিভাগমাত্রই আছে, তবে ইহার সহিত একটী সংস্কৃত-কলেজ এখনও সন্নিবিষ্ট আছে। এই বিদ্যালয় রেওড়ীতলাও-মহল্লায়, তাহা যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে।

'সেণ্ট্রাল-হিন্দুস্কুল,' কামাচ্ছা-মহল্লায় তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেণ্টনমেণ্টের নিকট "লণ্ডন-মিশন-হাইস্কুল," পাঁড়েরহাবেলীতে "বাঙ্গালীটোলা-হাইস্কুল" ও "এঙ্গলোবেঙ্গলী স্কুল" এই স্কুল দুইটী সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরিচালিত, এখানে বাঙ্গলা ভাষাও শিক্ষা হয়। ধ্রুবেশ্বরের নিকট "সনাতনধর্ম্ম-স্কুল," ঔসানগঞ্জে "দয়ানন্দ-হাইস্কুল," নীচিবাগে "সারস্বত-ক্ষত্রী বিদ্যালয়," লক্সায় "থিয়োসফিক্যাল-ন্যাসনল স্কুল" ও "থিয়োসফিক্যাল-ন্যাসানল গার্লস্কুল," ভোজুবীরে "উদয়প্রতাপ-কলেজ," সিগরায় "বিদ্যাপীঠ" কাশী, গোদৌলীয়ায়
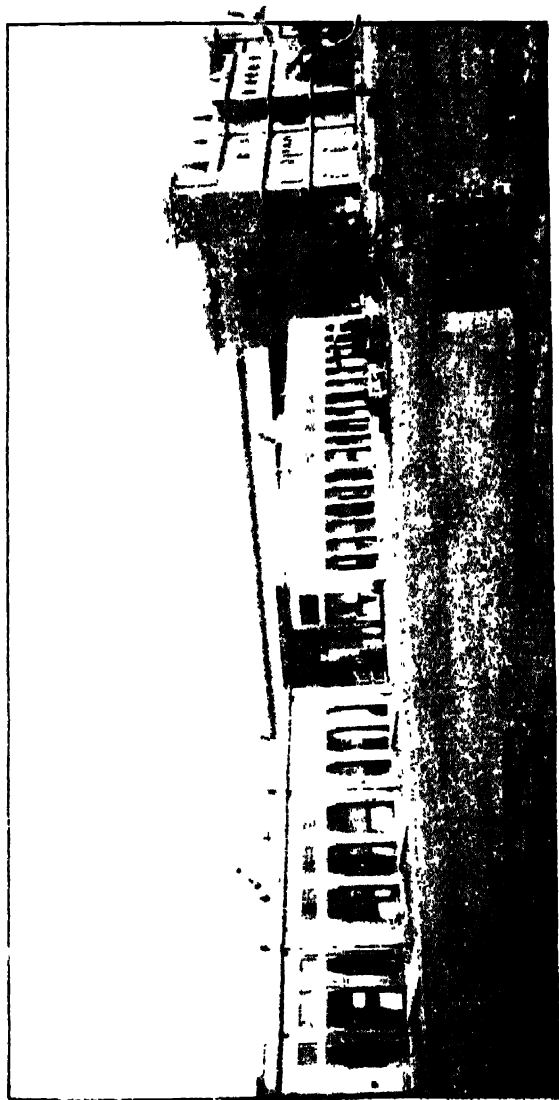
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস। (২৬২ পৃষ্ঠা)
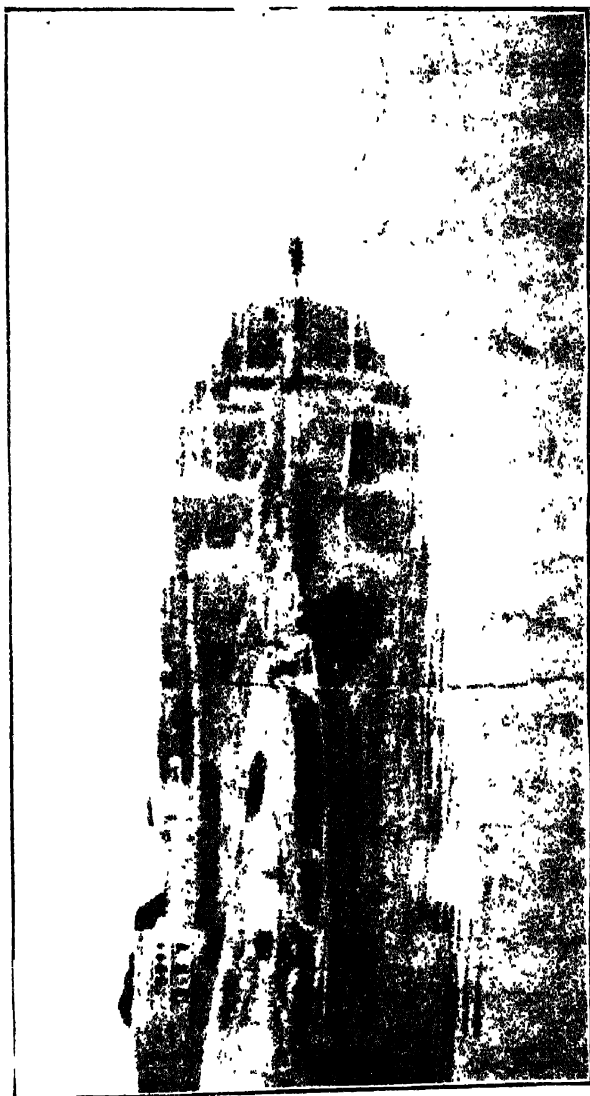
সেণ্ট্রাল-কাশী-ইনিষ্টিটিউসন," চৌকাঘাটে "টেষ্ট্রল-উইভিং-ইনিষ্টিটিউট্," সারণে "নারী-[illegible]-আশ্রম," সাতোচৌকে "অগ্রবালসমাজ-পাঠশালা" গুর্জ্জর-পাঠশালা, দশাশ্বমেধে "রণবীর-সংস্কৃত-পাঠশালা," মকরকন্দ গলিতে "ঠীকমণি-সংস্কৃত-কলেজ," "নগোয়ায় সংস্কৃত-পাঠশালা" ও "সাঙ্গবেদ-বিদ্যালয়," অমরনাথের গলিতে "সন্ন্যাসী-সংস্কৃত-পাঠশালা," এতদ্ব্যতীত অনেক গুলি "মিউনিসিপ্যাল-বোর্ড-স্কুল" নামক প্রাথমিক বিদ্যালয় কাশীর নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গড়বাসীটোলা, লাহোরীটোলা, রাজাদরবাজা, সুড়িয়া ও গায়ঘাটে "কন্যা-পাঠশালা" আছে। লক্ষ্মুলেশ্বর ও সিগরায় "মিসন-গার্ল্স্ স্কুল" আছে। এই সমুদায় প্রসিদ্ধ শিক্ষালয় ব্যতীত আরও অনেক ছোট ছোট পাঠশালা বারাণসীর নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামনগর ও ব্যাসকাশী :—

কাশীর পরপারে বা গঙ্গার পূর্ব্বতটে বেনারস-মহারাজের ফোর্ট বা দুর্গ এবং তদন্তর্গত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, ইহাও কাশী-দর্শনার্থীর অবশ্য দর্শনীয়। গঙ্গার উপরেই সেই বিরাট-দৃশ্য সৌধ যখন অস্তগত সূর্য্যের কনক-নিন্দিত রক্তিম-কিরণরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন মনে হয়, বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণ-মন্দিরের ন্যায় এ রাজ-অট্টালিকাও বুঝি আমূল অকলঙ্ক স্বর্ণ স্তবকে মণ্ডিত। পশ্চাতে দিগন্তব্যাপী উন্মুক্ত আকাশের কোলে বিশাল বিন্ধ্যাচল যেন এক খণ্ড অচঞ্চল নীলাভ জলদ অস্পষ্ট রেখার আকারে সততই সেই চিত্রোপম প্রাসাদের তল-ক্ষেত্র প্রতীয়মান হইতে থাকে। আবার যখন সেই সুমনোহর দৃশ্য গঙ্গার স্বচ্ছ

সলিলগর্ভে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়, তখন তাহার সৌন্দর্য্য আরও কতগুণে যে বৰ্দ্ধিত হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। নৌকা হইতে সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইয়া যায়, ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে সে সৌধশোভা আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠে। গঙ্গা-সলিলধৌত সেই সোপান-পাদ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলে, প্রথমেই দুর্গদ্বারের পার্শ্বে মর্ম্মর-খোদিত মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীর একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আরও কত দেবমূর্ত্তি সেই প্রস্তর প্রাচীরমধ্যে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেই প্রথমে ব্যাসেশ্বরের প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবালয় নয়নগোচর হয়। শিবালয়মধ্যে শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেবের এক খানি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র বিলম্বিত আছে। প্রাসাদমধ্যে রাজসভা বা দরবার-গৃহ সুন্দররূপে সজ্জিত, প্রাচীন মহারাজগণের ও বৃটীশ-রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর চিত্র তাহাতে রক্ষিত আছে। হস্তিদন্ত ও মণিরত্ন-খচিত বিবিধ শোভনীয় সামগ্রী প্রাসাদের নানাস্থানে বিচিত্রভাবে সজ্জিত।

মহারাজের এই প্রাসাদ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ভূমিহর, ভুঁইয়ার বা ভুঁইয়া ব্রাহ্মণ বংশজ রাজা বলবন্ত সিংহ (শর্ম্মা) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাশীনরেশদিগের প্রাচীন রাজধানী ও দুর্গ বরণার নিকট ছিল। রাজা বলবন্ত হইতেই এই স্থানে নূতন বেনারস-মহারাজদিগের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মিরঘাটের উপর মীর রুস্তমআলির নির্ম্মিত কেল্লা ভগ্ন করিয়া কাশীর পূর্ব্বদিকে গঙ্গার উপর সেই সমুদায় ইষ্টক প্রস্তর দ্বারা রামনগরের 'কেল্লা' নির্ম্মান করান। রাজা বলবন্ত

৮-ম   জর প্রাসাদ   পৃষ্ঠ
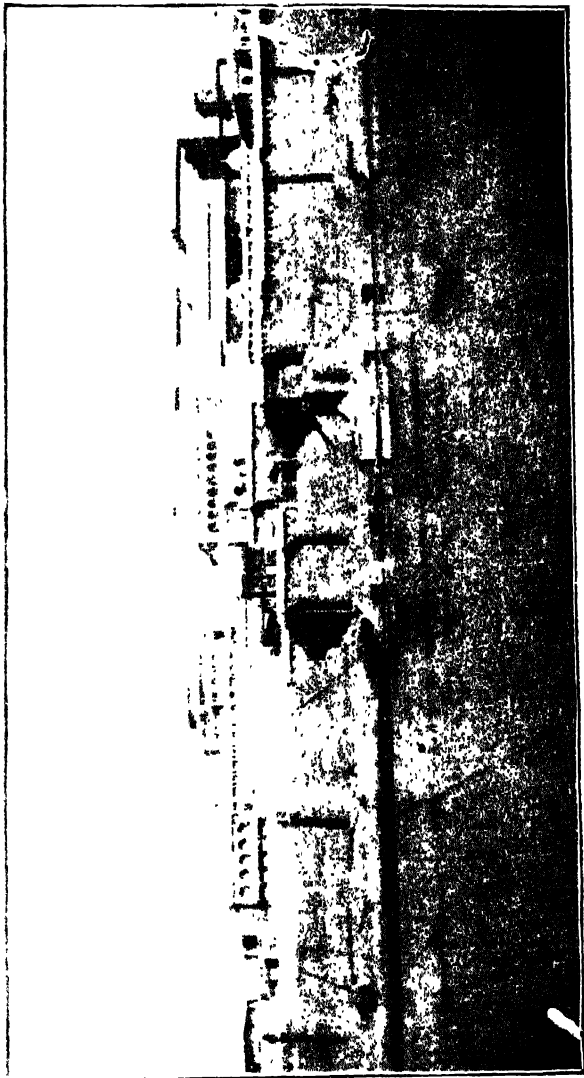
যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি এই সময় চুনার, জোনপুর আদি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গাজীপুরেরও অনেক অংশ তাঁহার অধিকারে আসে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, বাবু ঔসান সিংহের যত্নে 'চেৎসিংহ' রামনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চেৎসিংহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইলে, রাজা মহিপনারায়ণ সিংহকে গবর্ণরজেনারল ওয়ারেন হেষ্টিং রামনগরের অধিকার দেন। তিনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হইলে, তাঁহার পুত্র উদিৎ-নারায়ণ সিংহকে ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানী রামনগরের তথা বেনারসের রাজা করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর দেহান্ত হয়। অনন্তর ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ইহাঁর পোষ্যপুত্ররূপে বেনারসের রাজা হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ রাজ্যের অধিকারী হন। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ প্রভুনারায়ণ সিংহ একজন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সুপণ্ডিত, গুণগ্রাহী ও ভাগ্যবান পুরুষ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-স্বাধীনতা বা সামন্ত-রাজ-সম্মানে ইনি সম্মানিত হইয়াছেন। রামনগরের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব সৈন্যসামন্ত, বিচারালয়, কোতোয়ালি, হস্তিশালা ও অশ্বশালা প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যসুলভ সমস্তই এখন বিদ্যমান আছে। তথাকার যে কোন বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীর অনুমতি লইলে এ সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাসাদের অনতিদূরে মহারাজের সুন্দর কানন-সমন্বিত সরোবরতীরে 'সুমেরু' মন্দির। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরখোদিত নানা দেব দেবীর ও বিবিধ জীব জন্তুর বিচিত্র মূর্ত্তি শোভিত

রহিয়াছে। মন্দিরটী দেখিবার জিনিস। প্রতি বৎসর পূজার সময় এখানে মহাসমারোহে রামলীলা হইয়া থাকে। বহু দূর হইতে হাজার হাজার লোক তাহা দেখিতে আইসে। মহারাজের 'সরস্বতী ভাণ্ডার' নামে একটী লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার আছে, তাহাতে বহুমূল্যবান বিবিধ গ্রন্থনিচয় রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের এক খানি তুলসীদাসের রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজের যত্নে ও অর্থব্যয়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বেনারস মহারাজ দিগের বংশ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি গৌতম-গোত্রীয় পিপরার মিশ্র-বংশোদ্ভব সরযূপারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজা বনারের সময় কাশীবাসের জন্য সরযূপার হইতে এখানে আসেন, এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি তখন কাশীর প্রসিদ্ধ মিশিরপুখরায় অবস্থান করিতেন, তাঁহারই নামানুসারে সেই পুষ্করিণীটী 'মিশ্রপুখরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। পরে উক্ত পল্লীটীও মিশিরপুখরা নামে পরিচিত হইয়াছে। তিনি অপ্রতিগ্রাহী নির্লোভ ও সংসার ত্যাগী তপস্বী ছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত বেদান্ত-বিষয়ক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-নাটক "প্রবোধচন্দ্রোদয়" বিদ্বজ্জনগণের অতি আদরের বস্তু। রাজা বনার তাঁহার তপঃপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। একবার তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া খুব সেবা সৎকার করেন এবং মনে মনে চিন্তা করেন, "যদি এই ত্যাগী মহাপুরুষকে কিছু দান করিতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক হয়।" কিন্তু তিনি যে কাহারও

দান লন না, তাহা রাজা জানিতেন। সুতরাং রাজা গোপনে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে কয়েকটী গ্রামের এক দানপত্র বাঁধিয়া দেন। অনন্তর তিনি আশ্রমে আসিলে, রাজার চাতুরি বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন ও এই দৈবী ঘটনার ফল জানিতে পারিলেন যে, বনারের বংশ নাশ হইবে এবং আমারই বংশধরদিগের হস্তে কাশীরাজ্য আসিবে। তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয় নাই। উক্ত রাজ-বংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে, সেই মহাত্মার বংশেরই পণ্ডিত 'মনসা-রাম মিশ্র' যিনি পরে রাজা মনসারাম সিংহ-শর্ম্মা নামে পরিচিত হইয়া কাশীর রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে এ সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে কাশীরাজ্য ক্ষত্রীয় রাজাদিগের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণ রাজাদিগের হস্তে আসিয়াছে।

সাধারণে রামনগরকে ব্যাসকাশী বলিয়া উল্লেখ করেন। কথিত আছে, মহর্ষি ব্যাস তদানীন্তন মুনি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া কাশীর পরপারে এই স্থানে আসিয়া নিজ আসন স্থাপন করিয়া নূতন কাশীর প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। সেই কারণ লোকে এখনও ইহাকে ব্যাসকাশী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এখনও এখানে বিদ্যমান আছে। অনেকে তাহা দর্শন করিতে যান। রামনগর হইতে অথবা রাজঘাটের লৌহসেতু অতিক্রম পূর্ব্বক এক্কা করিয়া তথায় যাওয়াই সুবিধাজনক। অনেকে দশাশ্বমেধঘাট হইতে নৌকা করিয়া পার হইয়া, বালির চড়ার উপর দিয়া সোজা পূর্ব্ব-দিকে 'ব্যাসকাশীর' আদি স্থান দেখিয়া আইসেন। মাঘ মাসে ব্যাসকাশীর মেলা হইয়া থাকে। কাশীবাসী জন-সাধারণ সকলেই তখন পরপারে মেলা দেখিতে যান। এই স্থানে কতকগুলি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম আছে, তাহাতে কতিপয় শান্তিপ্রিয় দণ্ডীসাধু অবস্থান করিয়া স্ব স্ব সাধন ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেখিলে সহজেই বেশ ভক্তি-ভাবের উদয় হয়।

ব্যাসকাশীতে মরিলে লোক 'গাধা' হয়, এইরূপ একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক ইহা কোনও শাস্ত্রের কথা নহে, তবে এই প্রবাদের সহিত একটী ঐতিহাসিক-বিষয় যে জড়িত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে গাধিসুত, গাধিনন্দন বা গাধেয় অর্থাৎ মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইদিকে প্রায় অবস্থান করিতেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বও তখন গঙ্গার পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় দিকেই ছিল। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের রাজধানী ও দুর্গ যাহা রোহিতাশ্বগড় বা অধুনা যাহা রোটাসগড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা কাশী হইতে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যেই পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মোগলসরাই হইতে 'গ্রাণ্ডকর্ড-লাইনের' 'পামারগঞ্জ' ষ্টেসন হইতে ৩।৪ মাইলের মধ্যেই। গাধিপুত্র, গাধেয় বা শ্রীমন্মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশ্চন্দ্রের দক্ষিণারূপে এই সকল রাজ্যই পাইয়াছিলেন। এ প্রদেশে তাঁহার তখন আশ্রমও ছিল। তাহা 'গাধিপুত্রের আশ্রম' বা গাধেয়-আশ্রম বলিয়া কাশীর ঠিক পর পারেই অবস্থিত ছিল। লোক-পরম্পরায় এই প্রবাদ-বাক্য বিকৃত হইয়াই পূর্ব্বকথিতভাবে পরিণত হইয়াছে। নতুবা কাশীর পঞ্চ-ক্রোশী পরিমাণের বাহিরে অশিতিক্রোশী কাশীর মধ্যে গঙ্গার উভয় তটই গণ্য অতএব মুক্তিক্ষেত্র। যাহাহউক কাশীর পূর্ব্বদিকে গঙ্গার পরপার মহর্ষি গাধেয়র স্থান ছিল বলিয়াই লোকের এই অমূলক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে।

কাশীর পর্ব্বমেলা ও উৎসব ঃ—

কাশীতে প্রতি মাসেই বহু উৎসব ও মেলা হয়। কথায় বলে "বার মাসে তের পার্ব্বণ," কিন্তু এখানে বার মাসে তের পার্ব্বণের পরিবর্ত্তে নিত্যই বোধ হয় একটা না একটা মেলা কোথাও না কোথাও লাগিয়াই আছে। তন্মধ্যে এখানে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা বড় মেলা হয়। নানা দেশ বিদেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পুলিস ও সেবা-সমিতি সে উপলক্ষে নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

এখানের "বুঢ়য়ামঙ্গল" মেলা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহা দেখিবার জন্য দূর প্রদেশ হইতেও লোকের সমাগম হইয়া থাকে। গঙ্গায় বহু নৌকা ও বজরা সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে নাচ গান হইয়া থাকে। ঘাটের ধারে তখন লোকারণ্য হইয়া যায়। সকলেই সেই উৎসবে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া থাকেন। মহারাজ বেনারসও তাঁহার 'ময়ুরপঙ্খী,' 'ঘোঁড়দৌড়ের' নৌকা সাজাইয়া বাহির হন। যখন ঘাটের ধারে ধারে সেই সব নৌকা যাইতে থাকে, তখন নৌকায় নাচ, রং-তামাসা সকল লোকে দেখিতে থাকে। পূর্ব্বে চৈত্র মাসের প্রথম মঙ্গলবার কাশীর লোক দলে দলে নৌকা করিয়া চুনারের দুর্গাজী দর্শন করিতে যাইতেন, সেই নৌযাত্রা ক্রমে এই মেলায় পরিণত হইয়াছে। মহারাজা চেৎসিংহ এই উৎসবের নাম "বুঢ়য়ামঙ্গল" রাখিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং ইহাতে সম্মিলিত হইতেন। তখন মঙ্গলবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত এই মেলা থাকিত। মণিকর্ণিকা হইতে মঙ্গলবারে নৌযাত্রা আরম্ভ হইয়া শুক্রবারে রামনগরে পৌছিত এবং শনিবারে পুনর্যাত্রা করিয়া ফিরিয়া মেলা

সমাপ্ত হইত। পূর্ব্বে ইহার খুবই বাহার ছিল। এদিকে কয়েক বৎসর এই মেলা প্রায় বন্ধই আছে।

এই বার মাসে মাসের মেলার কিছু উল্লেখ করিব।

বৈশাখ মাসে :—'বড়গণেশের' নিকটে শুক্ল-চতুর্দ্দশী বা নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর উৎসবে, দিবসে নৃসিংহঅবতারের দর্শন ও রাত্রিতে প্রহ্লাদঘাটে নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুবধ লীলা অভিনয় হয়। এই উপলক্ষে উভয় স্থানে খুব মেলা হয়। এই বৈশাখ মাসের সপ্তমী বা গঙ্গাসপ্তমীর দিন কাশীর ঘাটে ঘাটে গঙ্গার পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে :—শুক্লদশমীতে দশহরা উপলক্ষে রাম-নগরে ও দশাশ্বমেধ আদি স্থানে গঙ্গা পূজা ও গঙ্গাস্নানের মেলা হয়। পর দিবস নির্জ্জলা একাদশী উপলক্ষে বহু লোক গঙ্গায় সন্তরণ করে এবং গঙ্গার ওপারে চড়ার উপর কপাটী-খেলার খুব প্রতিযোগিতা হয় এবং পঞ্চগঙ্গাঘাটে কুস্তী খেলা হয়।

আষাঢ় মাসে :—আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া হইতে তিন দিন লকসার নিকট রথযাত্রার খুব মেলা হয়। রথের উপর জগন্নাথ সুভদ্রাদি বিরাজ করেন। অসির নিকট হইতে জগন্নাথ মূর্ত্তি তথায় আনিত হন। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এখানে গুরু-পূজার বেশ উৎসব হয়। শিষ্য ও ছাত্রগণ স্ব স্ব গুরুদেবের পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

শ্রাবণ মাসে :—শ্রাবণের রবিবারে বৃদ্ধকালের কুণ্ডে স্নান, এবং অমৃতকুণ্ডেও বহু লোকজন স্নান করিয়া থাকে। শ্রাবণ

শুক্ল-পঞ্চমীতে নাগকূপে মেলা হয়, বিদ্যার্থীরা তাহাতে পরস্পর শাস্ত্রার্থ করিতে থাকে। শ্রাবণ মাসের মঙ্গল ও শুক্রবার দুর্গা-জীতে খুব মেলা হয়। শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সোমবার সার-নাথে ও মার্কণ্ডেশ্বরেও খুব মেলা হয়। শ্রাবণ শুক্ল-একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মন্দিরে মন্দিরে ঝুলনোৎসব হইয়া থাকে।

ভাদ্র মাসে ঃ—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-তৃতীয়ায় 'তীজ'-উৎসবে শঙ্খুধারা ও ঈশ্বর গাঙ্গীতে 'কজ্বরী' গাণের উৎসব হয়। ভাদ্র শুক্ল-ষষ্ঠীতে অসিসঙ্গমে "লোলার্ককুণ্ডের" মেলা হয়। এখানেও খুব কজরী-গান হয়। ভাদ্র কৃষ্ণ-নবমীতে সাক্ষী-বিনায়কে গোস্বামী রামচন্দ্র পুরীর বাটীতে গুপ্তবৃন্দাবন "কৃষ্ণদর্শনের" অপূর্ব্ব মেলা হয়।

আশ্বিন মাসে ঃ—কাশীর প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে রামলীলা হইয়া থাকে। কিন্তু রামনগরে অনন্তচতুর্দ্দশীর দিন হইতে লীলা আরম্ভ হইয়া নিত্য নূতন নূতন লীলার অভিনয় হইয়া থাকে। হাজার হাজার দর্শক তাহা দেখিতে যায়। রাজা স্বয়ং তাহাতে উৎসাহ ও যোগদান করিয়া থাকেন। বিজয়া-দশমীর দিন সন্ধ্যার সময় দশাশ্বমেধের ঘাটে দুর্গামূর্ত্তি-বিসর্জ্জন বা ঠাকুর ভাসানের খুব ঘটা হইয়া থাকে। ইহা বাঙ্গালীদিগেরই খাঁটী উৎসব ও আনন্দ মেলা। বহুদূর হইতে লোকে তাহা দেখিতে আসে। তাহার ঠিক পরদিন একাদশীতে নাটী-ইমলীতে "ভরতমিলাপ" বা ভরতমিলনের ভারি উৎসব হইয়া থাকে। 'বড়গনেশের মন্দিরের' পার্শ্বস্থিত প্রাচীন রামলীলার বাগান

হইতে বৈকালে মেলা বাহির হইয়া সন্ধ্যার সময় পুনরায় সেই বাগানে প্রত্যাগমন করে। মহারাজ-বেনারসও এই মেলায় যোগদান করিতে আসেন। হাতী-ঘোড়ার খুব সমাবেশ হইয়া থাকে! এই দিবস কাশীর প্রায় সব কাজ-কর্ম্মই বন্ধ থাকে। কাশীর মধ্যে যত রামলীলা হয়, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লীলা। ইহার পর দ্বাদশীর দিন 'রামনগরে' "ভরতমিলাপের" বিরাট উৎসব হয়। অনন্তর ত্রয়োদশীর দিন 'খোদাইচৌকিতে' গোস্বামী রামদাসজীর স্থাপিত রামলীলার "ভরতমিলাপ" উৎসবও বেশ সুন্দর হইয়া থাকে। স্বর্গীয় 'বিজয়-নগরম্ বা বিজনাগ্রামের' এই লীলায় যেন আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনান্তে এক্ষণে চাঁদা করিয়া 'লকসায়' লীলা হইয়া থাকে।

ভাদ্র মাসের অষ্টমী হইতে আশ্বিনের অষ্টমী পর্য্যন্ত লক্ষ্মী-কুণ্ডের মেলা হয়।

কার্ত্তিক মাসে ঃ—'পঞ্চগঙ্গাঘাটে' স্নান ও দর্শন উপলক্ষে খুব মেলা হয়। "ধনতেরস" অর্থাৎ কার্ত্তিক কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর দিন 'ঠাঠেরীবাজারে' পিতলাদি বাসনের খুব সাজসজ্জা হয়। এই দিবস তাঁমা ও কাঁশার বাসন প্রচুর বিক্রয় হয়। লোকের ধারণা, এই দিন বাসন কিছু না কিছু কেনা চাইই, তাহাতে লক্ষ্মী-দেবীর কৃপা-লাভ হয়। কার্ত্তিক কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে হনুমানজীর জন্মোৎসব। এই দিবস মীরঘাট, বিশ্বেশ্বরের গলি, ভদৈনী, সঙ্কটমোচন ও বড়গণেশ আদি স্থানে বেশ মেলা হয়। ইহার পর-দিন অমাবস্যা দীপালী বা দেয়ালী উৎসব। চক, ডালকীমণ্ডী,

ঠাঠেরীবাজার ইত্যাদি স্থানে আলোক-উৎসব হইয়া থাকে। কার্ত্তিক শুক্লষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন গঙ্গাতটে সূর্য্যপূজা হইয়া থাকে। ইহাকে এদেশে "ডালাছট্" বলে। কার্ত্তিক শুক্ল-গোপাষ্টমীতে টাউনহলের নিকট গোশালায় গোপূজার উৎসব হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে ঃ—কৃষ্ণাষ্টমীর দিবস "ভৈরবনাথের" দর্শন ও পূজার বেশ মেলা হয়। অগ্রহায়ণ শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে 'পিশাচমোচনে' লোটাভাণ্টার মেলা হয়।

মাঘ মাসে ঃ—রামনগরের কেল্লার বাহিরে বেদব্যাস-দেবের দর্শন মেলা হয়; রামনগর হইতে তিন মাইল দূরে লোকে বড়-বেদব্যাসের দর্শন করিতেও যায়। মাঘ কৃষ্ণ-চতুর্থীতে বড়গণেশজীর মন্দিরে খুব মেলা হয়। মকর-সংক্রান্তির দিন দশাশ্বমেধে স্নানের খুব ভিড় হয়। মাঘ মাসে প্রয়াগঘাটেও খুব স্নানের ভিড় হয়।

ফাল্গুন মাসে ঃ—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে কাশীর প্রায় প্রত্যেক শিবমন্দিরেই বাবার শৃঙ্গার পূজার উৎসব হইয়া থাকে। বিশ্বনাথের ত কথাই নাই। এই মাসের 'রংগভরী' একদশীতেও বিশ্বনাথের ও অন্যান্য শিবেরও দর্শনযোগ্য শৃঙ্গারাদি হইয়া থাকে। এই দিবস সন্ধ্যার সময় কাশীনরেশও দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন।

চৈত্র মাসে ঃ—"গণ গৌরের মেলা" রাজমন্দির ঘাটে হইয়া থাকে। চৈত্র শুক্ল নবমীতে রামঘাটে স্নান ও রামজীর দর্শনেও খুব মেলা হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কাশীর উপাসক সম্প্রদায়ঃ—

কাশী জগতের মধ্যে যেমন অতি প্রাচীন জনপদ, ইহার অধিবাসীবৃন্দও তেমনই ইহার প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনাদি বেদানুগত সনাতন শাস্ত্রেরই সেবকরূপে থাকিয়াই অধুনা যেন ক্রমে অসংখ্য সম্প্রদায় ও অনন্তভাবে পুষ্ট হইয়াছে। সেই সুদূর সত্যযুগসুলভ সাম-গাননিরত ও আদিযজ্ঞাগ্নির চিররক্ষক দেবপ্রতিম সনাতন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইতে একাল পর্য্যন্ত কাশীতে জৈন, বৌদ্ধাদি যত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বা পুষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিরই কোন না কোন বিভাগ এখানে এখনও বিদ্যমান আছে। সংক্ষেপে ক্রমে তাহার বর্ণন করিব।

বৈদিক ও সনাতন মতঃ—

কাশীতে যাঁহারা যথার্থ তীর্থদর্শকরূপে আগমন করেন, তাঁহাদের কেবল মণিকর্ণিকায় স্নান ও কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবালয় দর্শন হইলেই কাশীতীর্থ দর্শন সম্পূর্ণ হইল বলিতে পারা যায় না। তীর্থাবগাহন ও দেবদর্শন কাশীদর্শনের যেমন একদিক, তেমনি পবিত্র বেদগান ও বেদমন্ত্র শ্রবণ, সেই পূত যজ্ঞাগ্নি ও তাহার আহুতিবিধানাদির দর্শন হইতে নব নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসমূহ বা উপাসকসম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার নিরপেক্ষভাবে পরিদর্শন করাও বোধ হয় তাহার অন্যদিক। কারণ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বারাণসী-ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের এমন বিচিত্র ও বিপুল

সমাবেশ বোধ হয় জগতের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে না। বুদ্ধিমান তীর্থযাত্রীর এ অপূর্ব্ব সুযোগ পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে।

কাশী আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন তীর্থ হইলেও আর্য্যের সেই অতি পবিত্র বেদাঙ্গ হইতেই জাত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সকল উপাসকেরই ইহা সমান আদরের ও আকাঙ্ক্ষার স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সে সকল বিষয় অনেক স্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক জনমণ্ডলীতে অধুনা বারাণসী পূর্ণ হইলেও এখনও বোধ হয় শত করা নব্বই জন সনাতনবিধানুরক্ত হিন্দুই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক এই কাশীর সেই বিরাট উপাসকসম্প্রদায় আবার কত যে উপ-বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহারও হিসাব করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

হিন্দুর বিরাট দেহ হইতে জাত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও যে এই ঘোর কলির প্রাবল্যে কিছুমাত্র বিচলিত বা পরিবর্ত্তিত হন নাই, তাহা নহে, বরং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই বর্ত্তমানকালোচিতভাবে তাঁহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তবে এরূপ সংঘটন অবশ্য নিতান্ত অস্বাভাবিক বিষয় নহে, কারণ কালের সেই অপ্রতিহত গতির বিরুদ্ধাচরণ করা মানবের সমগ্র শক্তি বা সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অতীত! যিনি যতই স্থিতিশীল ভাবের পোষকতা করুন না, কাল কিন্তু তাহাকে সকলের অলক্ষ্যে অবলীলাক্রমে নিজ স্রোতের সহিত ভাসাইয়া লইবেই! ইহাই সেই অনাদি ও অনন্ত কাল-ধর্ম্ম।

সামধ্যায়ী বিপ্রবর্গ, সেই উদাত্ত্য-অনুদাত্ত্য-সরিৎ স্বরে—ভিন্ন ভিন্ন বেদীয় আচার্য্যগণ, সর্ব্বজন-বরেণ্য সেই সকল পুত-বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই চির প্রাচীন পবিত্রতম অগ্নিকুণ্ডমধ্যে হবি প্রদান করিতেছেন—দেখিলে এখন মনে হয় -তৈলবিহীন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপাগ্রভাগে ক্ষীণ দীপশিখাটীর মত অতি কায়-ক্লেশে কেবল বাহ্য বায়ুতাড়ণা হইতে তাহা যেন কোনরূপে রক্ষা করিতেছেন মাত্র—কিন্তু হায়—সে উৎসাহশীল যজ্ঞামোদী যজ্ঞকর্ত্তা বা যজমান কই, সে নিষ্ঠাবান দানশীল তপোবনরক্ষক ক্ষত্র-নরপতির সে অপ্রতিহত স্বাধীনতা কই, সেই পবিত্র যজ্ঞভূমি, সেই প্রশান্ত তপোবন, সেই মনোহর-দৃশ্য হোমগোবিসমূহ আজ কোথায়? সে অগ্নিরক্ষার উপযোগী অনায়াসলব্ধ কাষ্ঠখণ্ডেরও যে আজ সম্পূর্ণ অভাব! হায়, বেদবিধিরক্ষক আদর্শত্যাগী বিপ্র যে, আজ তাহার দগ্ধ উদরের জন্যই উন্মাদ প্রায়, সেই শান্তি, ক্ষমা, জ্ঞান, বিদ্যার কোন চিহ্নই যে আর নাই, তবে কতিপয় আনু-ষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এখনও যে পরিত্যক্ত হয় নাই, এখনও বীজ-রূপে যে, তাহা রক্ষিত হইতেছে, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এখনও সেই বৈদিক বহ্নি-শিখার শেষ চিহ্নমাত্রও দেখিবার যে স্থান আছে, এই কলি-তাড়িত একাকারের দিনেও যে সেই বৈদিক স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করিবার প্রয়াস আছে, তাহা অবশ্যই সকলের সমাদরে দেখিবার বিষয়।

"যুগধর্ম্ম" বলিয়া দেবভাষায় যে ঋষিবাক্য জগতে চিরকাল প্রচারিত আছে তাহা যে আর্য্য মনীষিগণেরই গভীর গবেষণা, দূরদৃষ্টি বা ত্রিকাল জ্ঞানের পরিচায়ক, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যখন তাঁহারা সেই প্রাচীন যুগে এই আনন্দকানন কাশীর সুরম্য তপোবনমধ্যে নিজ নিজ আসন স্থাপন করিয়া প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নি-মধ্যে আহুতি প্রদান করিতেন, তখনই তাঁহারা দূর ভবিষ্যতের এই ভীষণ ব্যভিচারের সুস্পষ্ট চিত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিয়াছিলেন, একদিন এই নিষ্কাম পবিত্র ভাবের প্রায় লোপ হইবে, ব্রাহ্মণ কর্ম্মরহিত, লোভপরবশ ও সংস্থানপর হইয়া বৈশ্য ও শূদ্রোচিত আচারসমূহে অনুপ্রাণিত হইবে, সুতরাং বৈদিক-ক্রিয়াকর্ম্ম ক্রমে বিলুপ্ত হইবে, তাই তাঁহারা বিভিন্ন যুগধর্ম্মের বিবিধ বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল বিধিই অধুনা রূপান্তরিত হইয়া নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উপাসকমণ্ডলী তাহাই এখন স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের মধ্যে কতকগুলি বাহ্য মতভেদ ব্যতীত মূলতঃ সকলেরই উদ্দেশ্য প্রায় একরূপ, কেবল প্রকৃতি ও অধিকার ভেদে এই বিসদৃশ মতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া এখন পরস্পর ঘোর বিরোধ করিয়া বসি। যাহা হউক সেই আর্য্য ঋষি-নির্দ্দিষ্ট সনাতন ভাব কিয়ৎপরিমাণে শিথিলমূল হইলে পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ ও তান্ত্রিক-উপাসনা-বিধি কিঞ্চিৎ প্রকটভাবে প্রচারিত হয়, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ সগুণ ও নির্গুণ উপাসক অবস্থা ও আবশ্যক বোধে সাধারণতঃ পঞ্চদেবতা, পরে নানা দেবদেবীর পূজকরূপে তাহাই আজিও মান্য করিয়া আসিতেছে। কাশীর সর্ব্বত্র তাহাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

জৈনসম্প্রদায় ঃ—

উক্ত বৈদিক ভাবের নানা ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইলে, হিন্দুর দশাবতারের ন্যায় জিনধর্ম্ম-প্রচারক চতুর্ব্বিংশ সংখ্যক তীর্থঙ্কর গুরুমণ্ডলীর ধীরে ধীরে আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের উপদেশ ও উপাসনা-বিধি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ঔপপাত্তিক তত্ত্ব আর্য্যের বেদানুমোদিত প্রাচীন সপ্তদর্শনের ন্যায় দেবভাষাতেই আর একটী নবকায় ষড়্দর্শনরূপে প্রচারিত হইল। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 'জিনধর্ম্ম' প্রবলতর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ নিতান্ত বিফল হইল না। প্রসিদ্ধ কাশীনরেশ 'প্রতিষ্ঠরাজের' কুমার 'সুপার্শ্বদেব' সপ্তম তীর্থঙ্কররূপে বারাণসীধামেই নির্ব্বাণ-লাভ করেন। তিনিই কাশীতে এই জিন-মতের প্রথম সূত্রপাত করিয়া যান, তাহার পর আরও কত শত বৎসর অতীত হইলে কাশীপতি অশ্বসেনের পুত্র 'পার্শ্বনাথ' পিতৃরাজ্য ও সমস্ত সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-মার্গ অবলম্বন করেন। অচির-কালমধ্যে তিনিও যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া "চতুর্য্যাম্" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। ইনি প্রায় ৭০৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কররূপে প্রসিদ্ধ পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের একটী "টোঁক" বা চূড়ার উপর যোগাবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইনিই বারাণসী তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জিনমতের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার সময় তদীয় বহু সহায়ক ও অনুচরমণ্ডলী কর্ত্তৃকই জৈনপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং অন্যদিকে হিন্দুর প্রাধান্য ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। এই ভাবে জৈন-ধর্ম্ম বারাণসীতে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য লাভ করিলে, পরবর্ত্তী

সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত সনাতন-ধর্ম্মের ভীষণ পীড়নে ক্রমে তাহা আবার শীর্ণকায় হইতে থাকে।

যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে বারাণসীর মধ্যে এই সম্প্রদায় যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত অগ্নিশ্বর ঘাটের দক্ষিণে এখনও একটী প্রাচীন জৈন-মন্দির আছে, এখন সারনাথ স্তুপের নিকটেও আর একটী প্রধান মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত 'ভেলুপুরা' ও টাউন হলের নিকটস্থ পল্লীতে 'মৈদাগিণ' ও অন্যান্য অনেকস্থলে জৈন-মন্দিরে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ বাস করেন। ইহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান উপ-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, একটী শেতাম্বরী, অন্যটী দিগম্বরী। পরস্পরের মধ্যে সামান্য মতবিভেদ আছে। জৈন-সন্ন্যাসীগণ 'মুনি' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্র "আগম" বলিয়া উক্ত। কঠোর আত্ম-সংযম ও তপশ্চর্য্যা ইহাঁদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। জীবহিংসা, মিথ্যা-কথন, চৌর্য্য ও ব্যাভিচার ত্যাগ, মৃত মহাত্মগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই ধর্ম্মের বিশেষ আচার বলিয়া কথিত। জীবক্লেশ ও হিংসা নিবারণই ইহাঁদের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া সন্ন্যাসীগণ একটী ঝাড়নের ন্যায় বস্তু সর্ব্বদা সঙ্গে রাখেন। উপবেশনকালে তাহা দ্বারা বসিবার স্থানটী ঝাড়িয়া লয়েন, উদ্দেশ্য কোন কীটাদি থাকিলে সরিয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার উপবেশনজনিত নিহত হইবে না। কোন স্থানে যাইতে হইলে, তাঁহারা কখন কোন যানারোহণে গমন করেন না, ইহারও উদ্দেশ্য জীব-পীড়া নিবারণ। কলিকাতা হইতে কাশী বা ভারতের কোন স্থান হইতে অন্য যে কোন সুদূর প্রদেশে যাইতে হইলেও ইহাঁরা পদব্রজেই

গমন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার বেশ প্রচলন আছে। সন্ন্যাসীগণ অনেকেই বিদ্যানুরাগী, পণ্ডিত ও দ্বিজবংশ-সম্ভূত, বেশ নিষ্ঠাবান, শান্ত ও সরল-প্রকৃতিসম্পন্ন। বিদ্বেষবুদ্ধি বশতঃ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলেও, জৈন-গৃহীদিগের সহিত হিন্দুপরিবারের সহানুভূতি ও অল্পাধিক বৈবাহিক সম্বন্ধ এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলবাদ ইহাঁরা বিশ্বাস করেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ্য বিধি-ব্যবস্থা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' প্রমুখ বহু সুপণ্ডিত ও সাধক জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপুল উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। কাশীতে এখনও শাস্ত্রবিশারদ জৈনাচার্য্যগণ অবস্থান করেন। সম্প্রতি মুনিশ্বর বিজয়চন্দ্র স্বুরি জৈনাচার্য্য মহাশয় ছিলেন। "জশোবিজয় জৈন পাঠশালায়" থাকিয়া তিনি জৈন শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার প্রণীত বহু ধর্ম্ম গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। তিনি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। সনাতন সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদিগের সহিত বেশ আন্তরিক ভাবেই আলাপাদি করিতেন। "অহিংসা দিগদর্শন" তাঁহার খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা।

বৌদ্ধসম্প্রদায় ঃ—

ইহার পর বৌদ্ধসম্প্রদায় কাশীতেই সৃষ্ট এবং কাশীতেই আশাতীত পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কালবশে কাশীর মধ্যে তাহা যেন একবারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ভারতীয় পরিবার বা সাধু-সন্ন্যাসীর এখানে

চিরস্থায়ী আবাস নাই। তবে চীন, জাপান, ব্রহ্ম ও সিংহলবাসী যতি ও শ্রমণগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই তীর্থের দর্শন করিয়া থাকেন। অধুনা সারনাথ-স্তুপের নিকট জনৈক সিংহলবাসী বৌদ্ধ অবস্থান করিতেছেন। কয়েক জন বৌদ্ধ-শ্রমণও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য বাস করিতেছেন। এখানে অধুনা সারনাথে একটী সুন্দর বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। শীঘ্রই এখানে একটী নূতন 'বিহার' স্থাপিত হইবে শুনা গিয়াছে। বুদ্ধদেব ভারতে কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তিনি প্রাচীন হিন্দুমতই নূতনভাবে কেবল কোন জাতীর বিচার না করিয়া সকলের নিকট সরল মাতৃভাষায় বা সেই সময়ের প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মফল-বাদ ও জন্মান্তর-বাদ মানিতেন। বুদ্ধদেব হিন্দুর জন্মান্তর-বাদ ও মুক্তি এই দুইটীকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-বিধি ও নীতি তিনি এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া দিয়াছেন মাত্র। তাঁহার মতে 'অষ্ট-পন্থার' অনুসরণই সংসার-বন্ধনরূপ দুঃখময় আসক্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়। তন্নির্দ্দিষ্ট অষ্টপন্থা যথা—১। প্রকৃত বিশ্বাস, ২। সৎ-সংকল্প, ৩। সত্যবাক্য, ৪। সৎ-কার্য্য, ৫। সদাচরণ, ৬। সৎ-উদ্যম, ৭। সৎ-চিন্তা, ও ৮। প্রকৃত ধ্যান (সমাধি)।

আবার 'গৌতম বুদ্ধ' বলিয়াও তিনি পরিচিত। কপিলবাস্তুর শাক্যরাজের তিনি একমাত্র কুমার। খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়সেই মহা জ্ঞানী হইয়া উঠেন। তাঁহার যখন একটী পুত্র হয়, তখনই তিনি গৃহত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি মগধের রাজধানীস্থ রাজগৃহে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগের নিকট

হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তপোবিধান শিক্ষা করেন। অনন্তর তাঁহার অনুগত পাঁচটী শিষ্যকে লইয়া গয়ার নিকট বন মধ্যে ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। পরে একাকী গয়ার পবিত্র বোধিদ্রুমমূলে ঘোর ধ্যানমগ্ন হইলেন। সহসা একদিন তাঁহার আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিল, মুক্তি দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি তখন প্রকৃতই বুদ্ধত্ব লাভকরিলেন। পরে কাশীতে যাইয়া নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময় ভারতের রোমে রোমে সঞ্চারিত হইয়াছিল, যে উপাসনা-বিধি মূল বৈদিক-উপাসনা পদ্ধতিকেও যেন আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, তন্ত্রেব নানা সাধনাঙ্গের সহিত যাহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহসা কাশী ছাড়িয়া বা ক্রমে ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কত লোকে কত কথাই বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রথমতঃ এই ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল মন্ত্র ও গ্রন্থসমূহ চিরপূজ্য দেবভাষার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক 'পালিভাষা' বা পাটলিপুত্রের ভাষায় প্রকাশিত হইবার কারণ, পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রান্তীয় জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক সেরূপ সমাদরে গৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার উপাসনা-পদ্ধতি যতদিন জৈনসম্প্রদায়ের ন্যায় বৈদিক-উপাসনাপ্রণালীর কতকটা অনুরূপ ও অনুগত ছিল; ততদিন সনাতনীদিগের অন্তরের মধ্যেও যাইয়া তাহা ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাহার শেষ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এদেশীয় প্রকৃতির প্রতিকূলতাপূর্ণ অনাচার-ভাবগুলি অধিকতররূপে অবলম্বন করিল, অর্থাৎ বিভিন্ন বৈদেশিক বা অনার্য্য আচার-ব্যবহারসমূহ প্রচলিত আর্য্য-উপাদানগুলির সহিত বৌদ্ধ-আচার্য্যগণ সদর্পে মিলাইতে

বসিলেন, ধর্ম্মের আবরণে হিংসা-দ্বেষাদি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ক্রমে কুণ্ঠাবিরহিত হইলেন, এক পরিবারের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ কেহ বৌদ্ধ, এইরূপ সম্মিলন-ভাবের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাবপুষ্ট বিরোধী দলের যখন সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তখনই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকণাসদৃশ সেই সনাতনধর্ম্মভাব দাবাগ্নির ন্যায় সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া কণ্টকারণ্যে পরিণত ভগবান বুদ্ধের সেই "নির্ব্বাণ" পবিত্র আনন্দকানন বা সাধন-সাম্রাজ্য ভস্মীভূত করিয়া দিল। ভারতের অঙ্ক হইতে সেই সুপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমত কতদিনের তরে একেবারে বিলুপ্ত হইল।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যদেব ঠিক সেই সময়েই ধর্ম্ম-দিগ্বিজয়ে ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। বৌদ্ধ-প্রভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি ভারতের আচণ্ডাল সকলেরই মধ্যে সনাতন বৈদিক-প্রভাব বিস্তার করিলেন। সকলেই তখন পুনরায় সনাতনী হইয়া যাইলেন। সেই অবধি বারাণসীতে সকল বৌদ্ধ বিহার, চৈত্য ও স্তূপ উপাসক-বিহনে যেন ক্রমে শ্মশানের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরে মোসলমান আধিপত্য সময়ে তাহা শক্তিশালী রক্ষকাভাবে লুণ্ঠিত ও ক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বুদ্ধদেবের মতে—আত্মনিষ্ঠ, পবিত্র-জীবনযাপন, ক্ষমা, দয়া ও প্রেমের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

শঙ্করাচার্য্য বা দশনামীসম্প্রদায় :—

যে সনাতন বা মূল ধর্ম্মবহ্নি বহুদিন নানা কারণে ধর্ম্মান্তররূপ ভস্মস্তূপে সমাবৃত থাকিয়া যেন ক্রমেই নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল, অথবা ভিতরে ভিতরে বুঝি প্রধুমিত হইতেছিল, সহসা তাহারই এক প্রত্যক্ষ স্ফুলিঙ্গ-স্বরূপ সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যদেব যেন

ধ্বগ্ ধ্বগ্ করিয়া জ্বলিয়া উত্তরাখণ্ডের চিরতুষারাবৃত হিমগিরি হইতে দক্ষিণে কন্যা-কুমারিকা রামেশ্বর অবধি, আবার পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি সনাতন ধর্ম্ম-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। *

বেদানুমোদিত অদ্বৈত-মতের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্যদেব সশিষ্য ভারতে ধর্ম্মবিজয় লাভ করিয়া, তদীয় বিজয় চিহ্নস্বরূপ তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয়কর্ত্তৃক ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী অক্ষয় (ব্যক্ত) মঠ স্থাপন করিলেন। 'জ্ঞান-প্রদীপে'—'বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব ও মঠাম্নায়রহস্য' মধ্যে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

প্রথমে পশ্চিম প্রান্তে বা পশ্চিমাম্নায় দ্বারকাক্ষেত্রে 'শারদা-মঠ'। এই মঠে তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'হস্তামলক' আচার্য্যরূপে অবস্থান করিলেন। ইহাঁর আবার দুই শিষ্য—'তীর্থ' ও 'আশ্রম' পদবীতে অভিহিত হইলেন। ইহাঁরা সামবেদ-রক্ষাকর্ত্তা 'কীটবার সম্প্রদায়' বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইহাঁদেরই শিষ্য ও প্রশিষ্য-পরম্পরায় এ যাবৎ উক্ত 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'-উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

* শঙ্করের সময়ঃ—যুধিষ্ঠিরাব্দের ২৬৬৩ কার্ত্তিকী শুক্লপূর্ণিমায় রাজা সুধন্মা সার্ব্বভৌমের তাম্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলির ৬০০ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠি-রাব্দ আরব্ধ হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ=কলির ৫০২৫ গতাব্দ। ইহা হইতে অর্থাৎ কল্যাব্দ ৫০২৫ হইতে ৬০০ বৎসর বাদ দিলে ৪৪২৫ যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়। আবার ইহা হইতে ২৬৬৩ বৎসর বাদ দিলে ১৭৬২ বৎসর হয়। সুতরাং ১৯২৪ – ১৭৬২ = ১৬২ খৃষ্টাব্দে রাজা সুধন্মা সার্ব্বভৌমের তাম্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সার্ব্বভৌম রাজা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্যদেব এখন হইতে প্রায় ১৭৬২ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ব্বাম্নায় বা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠে শঙ্করশিষ্য 'পদ্মপাদ' আচার্য্যরূপে বরিত হইলেন, তাঁহারও দুইটী শিষ্য, 'বন' ও 'অরণ্য' পদবীতে অভিহিত হইলেন। ইহাঁরা ঋগ্বেদ-রক্ষাকর্ত্তা 'ভোগবার সম্প্রদায়' বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। ইহাদেরই শিষ্য-পরম্পরা এ যাবৎ উক্ত 'বন' ও 'অরণ্য' উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

উত্তরাম্নায় বদরিকাশ্রমক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্মঠে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের তৃতীয় শিষ্য 'তোটকাচার্য্য' অবস্থান করিলেন। তাঁহার তিনটী শিষ্য, যথাক্রমে 'গিরি,' 'পর্ব্বত' ও 'সাগর' পদবীতে অভিহিত হইয়া অথর্ব্ববেদ-রক্ষাকর্ত্তা 'আনন্দবার সম্প্রদায়' বলিয়া উক্ত হইলেন। একাল পর্য্যন্ত উক্ত গিরি, 'পর্ব্বত' ও 'সাগর' উপাধিতে তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

অনন্তর দক্ষিনাম্নায় রামেশ্বরক্ষেত্রে 'শৃঙ্গেরি মঠে' শঙ্কর-শিষ্য 'সুরেশ্বর' দেব আচার্য্যরূপে অবস্থান করিলেন। তাঁহারও তিনটী শিষ্য, যথাক্রমে 'সরস্বতী' 'ভারতী' ও 'পুরী' উপাধিতে অভিহিত হইয়া যজুর্ব্বেদ-রক্ষাকর্ত্তা 'ভূরিবার সম্প্রদায়' বলিয়া উক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী-পরম্পরায় উক্ত 'গিরি', 'পুরী' ও 'সরস্বতী' উপাধিতে চিরদিন ভূষিত হইয়া আসিতেছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভুর শিষ্যচতুষ্টয়ের শিষ্যগণ বা তদীয় উক্ত দশসংখ্যক উপাধিযুক্ত প্রশিষ্যের নামানুসারেই আধুনিক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর ও সরস্বতী এই দশনামী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম,

সরস্বতী ও ভারতীদিগের এক শাখা এখনও প্রাচীন বিধি-নিয়ম যথাসাধ্য মানিয়া চলেন, তাঁহারা এখনও শুদ্ধঘর বলিয়া নিজেদের পূর্ণ অভিমান রাখেন এবং গিরি, পুরী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর ও ভারতীদিগের আর এক শাখা আচার-শিথিল হওয়ায় কিছু সম্মানহীন হইয়াছেন। এই শেষোক্ত সাড়ে ছয় ঘর আর প্রায় দণ্ডী সন্ন্যাসী হন না, পূর্ব্বোক্ত সাড়ে তিন ঘরই কেবল দণ্ডীরূপে দণ্ড ধারণ করেন ও তাহা যথাবিধি বিসর্জ্জন করিয়া পরমহংস বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু গিরি, পুরীদিগের মধ্যে পরমহংস বৃত্তিক ধারণের এখন আর কোন বিধি ব্যবস্থা দেখা যায় না। আদর্শ সন্ন্যাসীর প্রকৃত উপদেশ ও দৃঢ় শাসনের অভাবেই যে এই রূপ হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বারাণসী ভগবান শঙ্করের অতি প্রিয় সাধনভূমি, ভারতের ধর্ম্ম-কেন্দ্র। এ স্থলে তাঁহার কোন শিষ্য বা শিষ্যপরিচালিত স্বতন্ত্র মঠ ছিল না। সমগ্র বারাণসী তাঁহারই আবাল্য লীলাভূমি ও তাঁহারই অব্যক্ত 'আনন্দমঠ'। শঙ্কর যাঁহার অবতার সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ংই যে এই আনন্দ-কাননের অধিনায়ক, সুতরাং শঙ্কর নিজে তাঁহারই প্রকটরূপে এই স্থানে অবস্থান করিয়া সমগ্র ভারতের ধর্ম্মচক্র পরিচালনা করিতেন। সেই কারণ চতুরাম্নার সকল শিষ্যই এপর্য্যন্ত মোক্ষভূমি কাশীবাসের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এখানেও শঙ্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দশনামীসম্প্রদায়ভুক্ত দণ্ডী, পরমহংস আদি বহু সন্ন্যাসী সতত এই স্থানে অবস্থান করিয়া আজিও তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছেন।

দশনামীসম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ও সন্ন্যাসীগণ প্রথমে লৌকিক-ভাবে শৈব, পরে পরমশিব বা নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসক হন।

তাঁহারা প্রথমে প্রায় সকলেই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারীরূপে সাধন করিতে থাকেন, অনন্তর যথাসময়ে কৃতশ্রাদ্ধপিণ্ড হইয়া বিরজা হোমযজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও দণ্ড বা কেবল কমণ্ডলু ধারণ-ক্রমে পরমহংসাধিকার গ্রহণ করেন, ইহাঁদের মধ্যে আজিও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে বেশ সুপণ্ডিত ও অদ্বৈত-সাধনরত, কেহ কেহ মঠে অবস্থানকালে উপনিষৎ ও দর্শনাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করিয়া থাকেন, কিন্তু অধুনা অধিকাংশই সাধারণতঃ নিরক্ষর হইলেও কেহ কেহ বেশ ত্যাগী ও ঈশ্বর-পরায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এমন ও অনেকে আছেন, যাঁহারা সেই পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্ম ও পূতগৈরিক বস্ত্রে কেবলেই কলঙ্ক লেপন করিতেছেন মাত্র। সন্ন্যাসীরা সকলেই কৌপিনধারী ও বহির্বাসযুক্ত, কেহ কেহ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। গলায় সকলেরই প্রায় রুদ্রাক্ষ মালা ও ললাটে বিভূতি-ত্রিপুণ্ড্রক দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট উহাঁরা অনেকে স্বামীজী ও বাবাজী মহারাজ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। উহাঁদের বহু শিষ্যসেবকও আছেন। কাশীর মধ্যে বহু পুরাতন ও নূতন মঠের উহাঁরাই অধিকারী ও পরিচালক। অনেক মঠে দেবত্তর সম্পত্তি যথেষ্ট আছে, সে সকলেরও অধিপতি উক্ত মঠধারীগণ। উহাঁদের মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত নাই, চিরকৌমার্য্য বা স্ত্রী-বর্জ্জিত থাকাই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাঙ্গ, সুতরাং শিষ্য-পরম্পরায় সেই সকল মঠ ও দেবত্তর সম্পত্তি অধিকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অধুনা অধিকাংশ বাবাজীই দীন-সন্তান, নিরক্ষর, ও সাধনা হীন, তাঁহারা সহসা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া

ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের ভাবিবারও অবসর থাকে না যে, কেন তাঁহারা এ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, লোকে কেনই তাঁহাদিগকে এত ধন রত্ন আনন্দ-সহকারে দান করিয়াছে। সেই সনাতন ধর্ম্মালোচনা, তাহার উন্নতি ও উৎসাহকল্পে প্রকৃত সাধু-সজ্জনের সেবার উদ্দেশ্যে আজকাল তাহা ব্যয়িত না হইয়া নিতান্ত বিষয়ী বিলাসীর ন্যায় নানা অসৎ ও অকথ্য কর্ম্মানুষ্ঠানেই নষ্ট হইয়া থাকে। কেবল এই কাশীস্থিত অধিকাংশ মঠধারী সন্ন্যাসী বলিয়া নহে, অন্যান্য প্রদেশেরও বহু গিরি, পুরী প্রভৃতি উপাধিধারী দশনামী-সম্প্রদায়ভুক্ত মহান্তগণ যেন মহান্ধের মতই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। তবে যথার্থ সাধু-সজ্জন যে ইহাঁদের মধ্যে আদৌ নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না, কোন কোন মহাত্মা অনেক স্থলে এখনও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সেই পবিত্র ও গভীর অদ্বৈত জ্ঞানের যেন প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহা হউক সন্ন্যাসী-সমাজে এখনও দশনামীসম্প্রদায়ের সম্মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মৃত্যু হইলে তাঁহাদের দেহ সমাধিস্থ বা নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কাশীতে 'জুনামঠ', 'নির্ব্বানীমঠ' ও 'নিরঞ্জনী মঠই' প্রধান। দণ্ডীঘাটের নিকটেই নাগা সাধুদিগের প্রকাণ্ড মঠ-অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

দণ্ডীসম্প্রদায় ঃ—

দশনামী সাধু-নামধারী পরমহংসাচারী নির্দ্দণ্ডী-সন্ন্যাসী ব্যতীত দণ্ডী-সন্ন্যাসী বা ত্যক্তদণ্ডী সন্ন্যাসী কাশীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, মূলতঃ ইহারাই শঙ্করাচার্য্য মতের সম্পূর্ণ অনুগামী। ব্রাহ্মণকুমার ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের দণ্ডী-সন্ন্যাসী

বা ত্যক্তদণ্ডী সন্ন্যাসী হইবার অধিকার প্রায় নাই। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রথমে ব্রহ্মচারী দীক্ষার পর, দণ্ডী বা ত্যক্তদণ্ডী অথবা পরমহংস গুরু, শিষ্যকে দীক্ষা বা মন্ত্র প্রদানকালে বেদ কিম্বা তন্ত্র মতে মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক করণান্তর বা অন্য কোন বিশেষ বিধানে শিষ্যশরীরে দৈবী-প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার পর, শিষ্যকে কৃত-শ্রাদ্ধপিণ্ড ও শিখাসূত্র পূর্ণাহুতি করাইয়া বা বিসর্জ্জন করাইয়া দশাক্ষরমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অনন্তর দণ্ড-কমণ্ডলু ও গৌরিকবস্ত্র-কৌপীনের অধিকার প্রদান করেন। এখন হইতে যজ্ঞাগ্নি ও ধাতুমুদ্রাদি স্পর্শ নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা ও ধূমপান ইত্যাদি উহাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং কোন ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন অযাচিতভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে উহাঁদিগকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। আহারের ন্যায় শয়নাদি বিধানেও উহাঁদের কঠোরতা নিতান্ত কম নহে। কুশাসন ও কম্বলাদি সাধারণ বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন উৎকৃষ্ট শয্যায় উহাঁদের শয়ন করিতে নাই। দ্বাদশ বৎসর, দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ দিন অন্ততঃ দ্বাদশ দণ্ডও এইভাবে দণ্ড বহন করিয়া পরে তাহা বিসর্জ্জন করিলে গুরুদেব কর্ত্তৃক পরমহংস-অবধূত অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই উহাঁদের প্রধান ধর্ম্ম, তবে আজকাল অন্য সকল সম্প্রদায়ের ন্যায় উহাঁরাও অনেকটা বিকৃত হইয়া যাইতেছেন, সুতরাং সে উচ্চভাব আর এখন প্রত্যেক দণ্ডীতেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, মূল বা সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি অনেকের ভাগ্যেই সম্পন্ন হইয়া উঠে না। যেমন গুরু তেমনি তাঁর শিষ্য! হয়ত কোন

মঠের মহান্ত বা পরমহংস গুরুদেব শিষ্যানুশিষ্য অধিকার সূত্রে মঠাধীশ হইয়াছেন, কিন্তু সাধন ক্রিয়ায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিপক্ক অনভিজ্ঞ বা কিছুই করেন নাই, পূর্ব্বাশ্রমেও তাঁহার কোন সাধন-ভজন অভ্যস্থ ছিল না, মঠধারী গুরুর কৃপায় একেবারেই দণ্ডীসন্ন্যাসী হইয়া বসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা অজ্ঞানতাবশতঃ দণ্ডী হইয়াও উদরের ও বিলাসিতার তাড়নায় কেবল সঞ্চয় ও ভিক্ষার জন্যই ঘুরিয়া বেড়ান। যাহাহউক উহাঁদের মধ্যে এখনও অনেক উচ্চ শিক্ষিত ও অদ্বৈত-সাধনপুষ্ট ব্যক্তি যে নাই তাহা নহে। তাঁহাদের দেখিলে এখনও শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভুর সেই উচ্চ ও উদারভাব প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর ইহাঁদেরও সমাধি হইয়া থাকে অথবা শবদেহ নদীজলে নিক্ষিপ্ত হয়। দণ্ডীঘাটে, দশাশ্বমেধে ও কাশীর অন্যান্য স্থানে দণ্ডীমঠ আছে। দশাশ্বমেধের কালীতলার সম্মুখে কামরূপমঠ ও বাঙ্গালীটোলার মধ্যে রাজগুরুমঠটী খাঁটী বাঙ্গালী দণ্ডীদের। রাজগুরুমঠটী শাখা সারদামঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাজ বলবন্তের দৌহিত্র মহিপনারায়ণ সিংহ কাশীর রাজা হন। তিনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এই মঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; বর্ত্তমান কাশীনরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহও এই মঠেরই শিষ্য। এযাবৎ রাজ-সরকার হইতে যথেষ্ট বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে মঠের আর সেরূপ প্রতিপত্তি নাই বলিলেই হয়। মঠে তেমন জ্ঞানী ও ক্রিয়াবান সন্ন্যাসীর অভাবেই মঠের দুরবস্থা ক্রমেই বাড়িতেছে। মঠে ভবানী-ভদ্রকালীদেবীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, এই মূর্ত্তি আদি শঙ্করাচার্য্য দেবেরই প্রতিষ্ঠিত।

রামানুজ বা শ্রীসম্প্রদায়ঃ—

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের পর কয়েক শতাব্দী অতীত হইলে ১০৫০ শকাব্দার কিছু পূর্ব্বে রামানুজস্বামীর আবির্ভাব হয়। মান্দ্রাজের পেরুম্বুর নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য ও মাতার নাম ভূমি দেবী। কাঞ্চীপুরে শিক্ষালাভ করিয়া, আত্মমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীরঙ্গনাথে নিজের সাধন-উপাসনাকালে অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে দিগ্বিজয় করিয়া শৈব ও বৈষ্ণব মতের বিরোধ উৎপন্ন করেন। পরম শিবভক্ত চোলরাজের তাড়নায় ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কর্ণাটদেশীয় এক জৈন রাজার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে উপদেশ করিয়া তথায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অনন্তর সেই চোলরাজ দেহত্যাগ করিলে কাবেরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গধামে আসিয়া অবশিষ্ট জীবন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হন। দাক্ষিনাত্য প্রদেশে বহু রামানুজী মঠ বা আখড়া আছে। তথায় এই শ্রীবৈষ্ণবেরা প্রায় সন্ন্যাসী ও দণ্ডী। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আচার্য্য ও দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার অন্য বর্ণের নাই। রামানুজদেব শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মের পোষকরূপে অদ্বৈতবাদ মতের সামান্য খণ্ডন করিয়া ভক্তি-সাধনার রহস্য বিশিষ্ট বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বেদান্তশাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্ব-বিশ্বাসী বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসীগণ তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্য। দাক্ষিণাত্য বা দ্রাবিড় দেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রায়ই রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। ইঁহাদের আর এক নাম 'শ্রীসম্প্রদায়'। কাশীতে রামানুজী বৈষ্ণবদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা পরান্ন ভোজন করেন না, স্বপাক

করেন। ইহাঁদের মধ্যে ভোজ্য ও ভোজন ক্রিয়া গোপনে সম্পাদন করিবার বিধি আছে। তবে আবরনী ও অনাবরনী ভেদে ইহাদের দুইটী শ্রেণী আছে। যাঁহারা ভোজনাদির কঠোর নিয়ম পালন করেন তাঁহারা আবরনী এবং যাঁহারা উক্ত নিয়ম পালন করেন না, তাঁহারা অনাবরনী বলিয়া পরিচিত। অন্যান্য কর্ম্ম সনাতন মতেরই অনুরূপ। শ্রীবৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত দুটী উর্দ্ধ রেখা চিহ্নিত করিয়া ঐ দুইরেখার নাসামূল স্পৃষ্ট উভয় প্রান্ত অপর একটী ভ্রূমধ্যগত রেখাদ্বারা সংযুক্ত করিয়াছেন এবং ঐ দুই উর্দ্ধ পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে পীত অথবা রক্তবর্ণ রোলীদ্বারা আর একটী উর্দ্ধ রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন। অসি-সঙ্গমের নিকট দ্বারকাধীশের যে মন্দির আছে, তাহা ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণাচার্য্যের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় ঃ—

রামানুজ স্বামীর স্বর্গারোহণ হইলে তাঁহার শিষ্যপরম্পরা যথাক্রমে দেবাচার্য্য বা দেবানন্দ, হরিহরাচার্য্য বা হরিহরানন্দ ও রাঘবানন্দ রামানুজী মতের অনুসরণ করেন। রাঘবানন্দের অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় রামানন্দস্বামীও তাঁহার নিকট যথারীতি রামানুজী মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বহু তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে তাঁহার সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট নিজ ভোজ্য-ভোজনের সংগোপন বিধি সম্পূর্ণ পালন করিতে পারেন নাই, সেই কারণ তদীয় গুরুদেব রাঘবানন্দ স্বামী তাঁহাকে নিজ পংক্তি হইতে স্বতন্ত্র ভোজন করিতে বলেন। স্বামী রামানন্দ তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত বিবেচনা করিয়া সে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলেন ও নিজ-নামে অপেক্ষাকৃত উদার মত-পুষ্ট রামানন্দী সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি বারাণসীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে অবস্থিতি করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই স্থলে তাঁহার এক মঠ ছিল, পরে মোসলমানগণ তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। এক্ষণে উহার নিকটে এক প্রস্তরময় বেদি আছে। উহাতে রামানন্দদেবের পদচিহ্ন আছে। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পরে এই রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করেন। কাশীতে রামসীতার উপাসক রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের বেশ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে গৃহী ও বৈরাগী বা উদাসীন এই দুইটী বিভাগ আছে। কাশীতে ইহাঁদের কয়েকটী মঠও আছে। রামাৎগণ ভক্তিভরে পঞ্চগঙ্গার সেই পাদুকা-চিহ্ন পূজা করিয়া থাকেন। রামানন্দ স্বামী জাতিভেদ বিশেষ মানিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপই আচার পালন করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্ববর্ণের মধ্যেই তাঁহারা দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। রামানন্দ স্বামী নিজ শিষ্যগণকে অবধূত উপাধি দিয়া ছিলেন। ইহাঁদের তিলক ধারণ রামানুজী বৈষ্ণব দিগেরই অনুরূপ তবে মধ্য-রেখাটী কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র করিয়া অঙ্কিত করেন। রামানন্দের প্রধান দ্বাদশজন শিষ্য ছিলেন। আশানন্দ, কবীর, রয়দাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ, ও শ্রিয়ানন্দ। ভক্তমাল গ্রন্থে ইহাঁদের বৃত্তান্ত দেখা যায়।

বৈষ্ণব ও আখড়াধারী সম্প্রদায় ঃ—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কাশী সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ক্ষেত্র, সুতরাং সদা উদার ভাবপুষ্ট শিবপুরী বারাণসীর মধ্যে বৈষ্ণব প্রাধান্যও নিতান্ত কম নহে। গৃহস্থ ও বাবাজী বৈরাগীর সংখ্যা এখানে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীয় সকল

দেশীয় বৈষ্ণবগণ এখানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ গোপালমন্দির ও অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব-মঠ বা আখড়ার নিয়মাধীন হইয়া সাধন ভজন করিয়া থাকেন।

বৈরাগী সাধু ও অবধূত সন্ন্যাসীদিগের মূল আখড়া সাতটী। যথা—"নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, ধুনা, আনন্দ ও বড়া আখড়া"। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদিগের সাতটী আখড়ার নাম এইরূপ, যথা—"নির্ব্বাণী, খাকী, সন্তোষী, নির্ম্মোহী, বলভদ্রী, টাটম্বরী ও দিগম্বরী"। এখানে দিগম্বরী বৈষ্ণবদিগের দুইটী শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। এক "রাম-দিগম্বরী" অন্য শ্যাম "দিগম্বরী"-বিশ্বেশ্বরগঞ্জের নিকট উহাদের এক স্থান আছে, তাহা রাধারমণজীর মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'লাহোববীর' নামক এক হনুমানজীর প্রাচীন মূর্ত্তি এখানেই আছে। গোঁড়ীয়া রামকৃষ্ণ নাগাজী এখন এই স্থানে মহান্ত পদে অভিষিক্ত আছেন। বারাণসীবাসী বণিক ও আগরওয়ালা প্রভৃতি জাতিই সাধারণতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালী শিক্ষিত বৈষ্ণবের সংখ্যা এখানে তেমন অধিক নাই, তবে বৈরাগী-বৈষ্ণবগণ সকলেরা শববহন ও শ্মশান-যাত্রাকালে হরিসংকীর্ত্তন করিবার জন্য অনেকে এখানে চিরস্থায়ী বসবাস করিতেছেন।

'নিমানন্দী' নামে বৈষ্ণবদিগের আর এক শাখা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের তুলনায় যৎসামান্য বলিতে হইবে। 'নিম্বাদিত্য' নামক এক বৈষ্ণবসাধু ইহার প্রবর্ত্তক। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ইহাঁদের উপাস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ ইহাঁদের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ।

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রভুর কেশব ভট্ট ও হরিদাস নামে দুই জন

প্রধান শিষ্য হইতে বিরক্ত ও গৃহস্থ নামক দুইটী শাখা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মথুরার সন্নিকট যমুনাতটস্থিত প্রসিদ্ধ 'ধ্রুবক্ষেত্র' নামক পর্ব্বতের উপর নিম্বাদিত্য-আখড়ার গদি প্রতিষ্ঠিত আছে।

কাশীতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত আরও অনেক উপাসক-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা বঙ্গদেশীয় চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব-বৈরাগীগণও এই সকল শ্রেণীর অন্তর্গত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া যেখানে যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান মহাপ্রভুর বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে 'যতনবড়' নামক স্থানে মহাপ্রভুর যে বৈঠক আছে, তথায় সম্প্রতি মহাপ্রভু চৈতন্য দেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অনেক আছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নগর-কীর্ত্তন উপলক্ষে খোল করতাল সহযোগে বঙ্গীয় কীর্ত্তন-সংগীতে কাশীধাম মাতাইয়া তুলেন। অসিতে শীতলদাসজীর প্রতিষ্ঠিত এদেশীয় বৈরাগী সাধুদিগের এক আখড়া বর্ত্তমান, যতনবড়ে উদাসীন সাধুদিগেরও আখড়া আছে।

গোরক্ষপন্থী :—

ভগবান গোরক্ষনাথের শিষ্য-পরম্পরায় এখানে গোরক্ষপন্থী নামে একটী উপাসক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় বারাণসীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গোরক্ষনাথের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। লোকে গোরক্ষনাথকে শিবের আর একটী অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যাহাহউক এক্ষণে কাশীতে গোরক্ষপন্থীদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

'মিউনিসিপ্যালগার্ডেনের' নিকট গোরক্ষপন্থীদিগের প্রকাণ্ড একটী মঠ বা আখড়া আছে। ইহা 'গোরক্ষনাথের টিলা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহু সাধু সন্ন্যাসী এখানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এখান হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে আরও একটী গোরক্ষপন্থী মঠ আছে। মঠান্তর্গত মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উপাসকমণ্ডলী শিব-লিঙ্গেই গোরক্ষনাথের পূজা করিয়া থাকে। ইহাঁরা কাণফটা সাধু বা 'নাথ-সম্প্রদায়'ভুক্ত বলিয়াও পরিচিত। ইহাঁরা নিজেদের কাণে এক প্রকার গণ্ডারের চর্ম্ম, কাষ্ঠ, কাচ বা পাথরের কুণ্ডল আভরণ পরিয়া থাকেন। যোগীবর গোরক্ষনাথদেব মহাযোগী আদিনাথের প্রশিষ্য এবং মচ্ছন্দ্রনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। হিন্দি ভাষায় কথিত আছে, "আদিনাথকে নাতি মচ্ছন্দ্রনাথকে পুত। মঁ্যায় যোগী গোরক্ষ নাথ অবধূত॥"

কবিরপন্থী :—

কবিরপন্থী সম্প্রদায় এখনও কাশীতে বেশ প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন। কবিরচৌরায় 'কবিরসাহেবের মন্দির' উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের অনেক কথা বলা হইয়াছে। মহাত্মা কবির পূর্ব্বোক্ত রামানন্দ স্বামীর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে অন্যতম শিষ্য, ইনি নিজেকে জোলা বলিয়া পরিচয় দিতেন। কথিত আছে, ইনি স্বামীজীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী যথেষ্ট উদারমতাবলম্বী হইলেও জোলা বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করেন নাই। অনন্তর একদা নিশাশেষে কবির, গুরু 'রামানন্দের' কৃপালাভের প্রত্যাশায় মণিকর্ণিকাঘাটে সোপানপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। এ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ আছে, কেহ বা দশাশ্বমেধঘাটে, আবার

কেহ বা 'পঞ্চগঙ্গাঘাটের সোপানপার্শ্বে' বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহা হউক স্বামী রামানন্দ নিত্য যে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন, সেই ঘাটেরই সোপাননিম্নে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। স্বামীজী যথারীতি প্রাতঃস্নান করিবার জন্য যেমন সেই ঘাটের সোপান অতিক্রম করিবেন, অমনি কবিরের দেহে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। তিনি অন্ধকারে এ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে পতিত দেখিয়া "রাম রাম কহ বেটা" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। কবির তখনই আনন্দগদগদ-কণ্ঠে "রাম রাম গুরু মহারাজ" বলিয়া স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সেই অবধি কবির রামানন্দের শিষ্য বলিয়া গৃহীত ও পরিচিত হইলেন। কবির সংসারের সকল কার্য্যের সহিত তাঁহার প্রাণারাম 'রাম' নাম জপ করিতে লাগিলেন। সেই কঠোর সাধনা ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে অচিরকাল মধ্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন।

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অতি হীনবর্ণ-সম্ভূত কবিরের জ্ঞানবহ্নি যখন সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার স্নিগ্ধ সাধন-জ্যোতিঃ যখন চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, তখন কত হিন্দু কত মোসলমান দলে দলে তাঁহার শরণাগত হইয়া পড়িল, সেই সকল কবিরভক্ত-মধ্যে যাঁহারা প্রধান উদেযাগী ও কবিরের সাধনমতে অনুপ্রাণিত, তাঁহারাই এই কবিরপন্থী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। রামানন্দী বা অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ইহাঁদের মতের অনেক পার্থক্য থাকিলেও ইহাঁরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত তিলক মালা অনেকেই ধারণ করেন বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে ইহাঁদের তেমন আস্থা দেখিতে পাওয়া

যায় না। কবির সাহেবেরও সেইরূপ মত ছিল, তিনি দিবারাত্রি একাগ্রমনে ভগবানের ভজন করিতেই ভালবাসিতেন। তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই কারণ হিন্দু-মোসলমান সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে দ্বিধা বোধ করিতেন না। প্রবাদ আছে, সন ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষ-পুরের অন্তর্গত 'মঘার' গ্রামে তিনি দেহত্যাগ করেন। সে সময় হিন্দু-মোসলমান-মধ্যে তাঁহার শবদেহের সৎকার-উপলক্ষে ঘোর মত-বিরোধ উপস্থিত হয়। হিন্দু-পক্ষ হইতে দাহ করিবার জন্য এবং মোসলমান-পক্ষ হইতে সমাধি দিবার জন্যই এই বিরোধ ঘটে, ক্রমে তাহা লইয়া একটু বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়। তখন সহসা কবিরসাহেব তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তোমরা পরস্পর বৃথা দ্বন্দ্ব করিও না, শবাচ্ছাদিত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখ।" অনন্তর তখনই তাঁহার পুনরায় অন্তর্দ্ধান হইল। উভয় পক্ষ সহসা এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎপরে শবাচ্ছাদিত বস্ত্র উন্মোচন করিলে দেখা গেল, তাহার মধ্যে শব নাই, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি সুন্দর পুষ্পস্তবক পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উভয় পক্ষের বিরোধ তিরোহিত হইল, তাঁহারা সেই পুষ্পস্তবক বিভাগ করিয়া লইলেন। হিন্দুগণ সেই অর্দ্ধাংশ পুষ্পস্তবকের যথারীতি দাহ-ক্রিয়া সমাধা-পূর্ব্বক তাহার ভস্মগুলি লইয়া পূর্ব্বোক্ত কবিরচৌরা নামক স্থানে মঠ-মধ্যে নিহিত করিলেন। মোসলমানগণ অপরার্দ্ধ পুষ্পস্তবক গোরক্ষপুরস্থিত 'মঘার' গ্রামেই সমাহিত করিয়া তাহার উপর একটী সমাধি স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

কবির সাহেবের ঔরসজাত কোন সন্তানাদি ছিল না, তবে

'কমাল' ও 'কমালি' নামে তাঁহার পালিত দুইটী পুত্র কন্যা ছিল। এক সময় গঙ্গাগর্ভে একটী শবশিশু ভাসিয়া যাইতেছিল, কোন কারণ বশতঃ তাহাকে নিজ মনের শক্তিবলে ঘাটে আনয়ন করিয়া জীবিত করেন, পরে তিনিই কবির পুত্র সাধকচূড়ামণি 'কমাল' বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। কবিরের ন্যায় তাঁহারও বহু ভজন পদাবলী আছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃতের ন্যায় কবির বিরচিত সিদ্ধ-পদাবলী বা দোঁহা বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠে তাঁহার সাধন-বিভূতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কবির-বালক কমালের একটী ভজন-সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লুম্—একতালা।

কবকি ম্যঁায় ঠাড়ি ঠাড়ি যমুনাকি তিরয়াঁ।
অরজ করত—মোরি পার লাগায়ে দে নাওরিয়া॥
গুণি গুণি সব পার উতার গয়ে॥
ম্যঁায় নিগুর্ণ ভঁই বাবরিয়া॥
রাত আঁধিয়ারি কারি, বিজলি চমকি ঘেরি
অট দুজে বাদরিয়া।
কস্কহ কমাল কবিরকে বালক
আমবস মোরি নাওরিয়া॥

অর্থাৎ আমি কত দিন ধরিয়া ঐ ভব-যমুনার তটে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে নাবিকপ্রবর আমায় পার করিয়া দাও। যাঁহারা গুণী তাঁহারা ত নিজগুণেই সকলে পার হইয়া যাইতেছেন, হায় আমি যে নিগুর্ণ, তোমার কৃপা ব্যতীত আমার যে আর অন্য উপায় নাই! গভীর অন্ধকার রজনী, তাহাতে বিজলি

বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া নয়ন ঝল্‌সাইয়া দিতেছে, ঘনঘটা করিয়া ঐ বাদল আসিতেছে, তাই কবির-বালক কমাল সভয়ে পুনরায় কহিতেছে হে নাওরিয়া, হে ভবপারের কর্ত্তা, আমায় পার করিয়া দাও প্রভো।

বল্লভাচারী বা রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ঃ—

রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য ১৪৭৮খৃষ্টাব্দে চাম্পারণ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণী (গুজরাটী) ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যাবস্থায় ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনা ও পুণ্যফলে অল্পকাল মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম-দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ইনি 'রাধাকৃষ্ণের' উপাসক ছিলেন, সেই কারণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসক-সম্প্রদায় 'রাধাবল্লভী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে কিছু দিন হইল তাঁহার প্রবর্ত্তিত বালগোপালের-সেবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গোকুলস্থ গোস্বামীরা এই ধর্ম্ম-উপদেশ দেন। আচার্য্যদেব প্রথমে মথুরার নিকটস্থ গোকুলে বাস করিতেন। চরণাদ্র বা চুনারেও তাঁহার অবস্থান ছিল। তিনি শেষ অবস্থায় কাশীধামে 'জেঠন্ বড়' বা যতনবড়-মহাল্লায় বাস করিয়া ছিলেন। এখানে তাঁহার মঠ আছে। তিনি অন্তিম সময়ে কাশীর হনুমানঘাটে গঙ্গাসলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবগাহন পূর্ব্বক একেবারেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাঁহার সেই অবগাহন স্থান হইতে এক দীপ্যমান অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং তিনি সর্ব্বসমক্ষে স্বর্গারোহণ করিলেন। তিনি প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে নাকি তিনি পুনরায় গৃহস্থ হইয়াছিলেন। শিষ্যদিগের উপর এই সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের যথেষ্ট প্রভুত্ব

দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর প্রসিদ্ধ 'গোপালমন্দির' এই সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত। কাশীর বহু বণিক ও ধনী-সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী। ইহাঁরা ললাটে দুই উর্দ্ধ পুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন এবং ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটী রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

প্রভুপাদ বল্লভাচার্য্যদেব পূর্ব্বকথিত কাশীর হনুমানঘাটের নিকট একটী বাটীতে অবস্থান করিয়া সকলকে তাঁহার ধর্ম্মমতের উপদেশ প্রদান করিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার বৈকুণ্ঠলাভ হয়।

তুলসীদাস প্রবর্ত্তিত রামাৎ-সম্প্রদায়ঃ—

পূর্ব্বে রামানন্দি বা রামাৎ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তুলসীদাসের অভিমত প্রচারিত হইলে, সেই রামানন্দী রামাৎগণের অনেকেই এই নূতন মত গ্রহণ করিলেন। তুলসীদাস ব্রাহ্মণ-কুমার। কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন অদ্যাবধি তাহার স্থির মীমাংসা হয় নাই। কেহ হস্তিনাপুর, কেহ হাজীপুর, কেহ রাজপুর, এইরূপ নানা লোকে নানা স্থানের উল্লেখ করেন। তিনি অল্পকালের মধ্যে বেশ সুপণ্ডিত হইলেও নিজ স্ত্রীর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। একদা তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়ে যাইলে তুলসীদাস অত্যন্ত বিরহ-কাতর অবস্থায় তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। স্ত্রী স্বামীর এই 'স্ত্রৈণ-ভাব' দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিতা হন, ও বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির ন্যায় স্বামীকে নানা প্রকারে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমা অপেক্ষা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে এইরূপ অনুরক্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার অনেক মঙ্গল হইত।" তুলসীদাস পতিপ্রাণা স্ত্রীর নিকট এইরূপ সহসা

তিরস্কৃত হইয়া সংসার-সুখ-সম্পদ্ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় বসিয়াই অযোধ্যানাথ শ্রীরাম-চরিত-কথা 'রামায়ণ' হিন্দী ভাষায় রচনা করিতে মোনযোগী হইলেন, পরে বারাণসীতে আসিয়া তাহা সম্পূর্ণ করেন। তিনি যেমন ভক্ত, তেমনি সাধক ও কবিও ছিলেন। তাঁহার রামায়ণ হিন্দীভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। তিনি বাল্মীকি ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের একত্র সমাবেশে এই অপূর্ব্ব রামায়ণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ প্রদেশের শিক্ষিত সকলেই তাঁহার এই রামায়ণ বেদাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় অত্যন্ত ভক্তি-সহকারে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত তুলসী-ঘাটেই তিনি অবস্থান ক'রতেন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কাশীধামেই দেহরক্ষা করেন। রামায়ণ ব্যতীত তাঁহার আরও বহু উৎকৃষ্ট রচনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

নানকপন্থী বা শিখ-সম্প্রদায় ঃ—

এই উপাসক সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ১৫০৫ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশে মহাত্মা গুরু নানকসাহেব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। নানা সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম—বিশেষ হিন্দু ও মোসলমানের ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়েই তিনি এই ধর্ম্মের অভিনব মত প্রচার করেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত এশিয়ার অন্যান্য দেশেও তিনি স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার নবাবিষ্কৃত উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে বিরত হন নাই। তিনি বাহ্যতঃ একেশ্বরবাদী ছিলেন, সেই কারণ হিন্দু ও মোসলমান উভয় জাতিই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ছিল। কিন্তু তিনি হিন্দুর গঙ্গাদিতীর্থ ও রামচন্দ্রাদি লীলাবতারদিগের স্তব স্তুতি ও পূজার বিরোধি ছিলেন না বরং পক্ষপাতী ছিলেন।

শিষ্যগণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব স্থাপন দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্মোন্নতি ও সর্ব্বত্র সার্ব্বাঙ্গীন শান্তি স্থাপনই তাঁহার ধর্ম্মের সার উপদেশ ছিল। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে যাঁহারা গুরু-স্থানীয় হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা গুরু নানক-প্রবর্ত্তিত সেই মূল ধর্ম্মমত সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে কতিপয় উপ-বিভাগে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই নানকজীকে আদি গুরু এবং তাঁহার উপদেশবাণী যাহা গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই প্রধান ধর্ম্মপুস্তক এবং গ্রন্থসাহেব মহারাজ বলিয়া প্রতি ধর্ম্মমন্দিরে ভক্তিসহকারে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। 'শিষ্য' শব্দের অপভ্রংশ 'শিখ্য' বা 'শিখ্'। এ অঞ্চলে 'ষ' খএর মত উচ্চারিত হয়। সুতরাং নানক সাহেবের শিষ্য-সম্প্রদায়ই শিখ্-সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

কাশীতে এই শিখ্ বা নানক-সম্প্রদায়ের প্রভাব নিতান্ত মন্দ নহে। এখানে অনেকগুলি নানকপন্থী মঠ বা আখ্ড়া প্রতিষ্ঠিত আছে। অসিঘাট, কুরুক্ষেত্র, লক্সা, মিরঘাট, ও চোউক প্রভৃতি স্থলে ইহাঁদের ধর্ম্মশালা ও মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কাশীর আদি ও শেষ মঠ বিশ্বেশ্বরগঞ্জের নিকট অবস্থিত। ঠাঠেরী বাজারের পিছনের গলিতে শিখ-সম্প্রদায়ের বড়ী সংগৎ আছে। গুরু তেজবাহাদুর ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধুনা কচুরীগলিতেও একটী নূতন ধর্ম্মশালা হইয়াছে। এই সকল স্থানে বহু নানকপন্থী সাধু অবস্থান করিয়া সংস্কৃত-বিদ্যা ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কাশীতে থাকিয়া এইরূপ শাস্ত্রালোচনার জন্যই এখানে এত শিখমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে প্রধান সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় কেশশ্মশ্রুরক্ষা

করেন। তাঁহারা নিজেদের নির্ম্মলী সাধু-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দেন।

অঘোরপন্থী :—

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই আর্য্যঋষি-প্রবর্ত্তিত সেই আদি ধর্ম্ম মতের রূপান্তর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ ও দর্শন-বিজ্ঞান এবং তাহার ক্রিয়া-সিদ্ধাংশ (Practical portion) সাধনাঙ্গ উপাসনা-বিধি বা তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগ-প্রক্রিয়ার কোন কোন অংশমাত্র অবলম্বন করিয়াই বিবিধ ধর্ম্ম-মতের সৃষ্টি হইয়াছে, 'অঘোরপন্থী'ও সেই ঋষি-প্রবর্ত্তিত 'নবধা কুলাচারের' অন্তর্গত একটী আচারমাত্র, কিন্তু শিক্ষার দোষে কালে তাহা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যের উপাসনা বিধির নববিধ আচার যাহা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার, অঘোরাচার, যোগাচার, জ্ঞানাচার বা জীবন্মুক্ত কৌলাচার অথবা অবধূত পরমহংসাচার বলিয়া পরিচিত, অঘোরাচার বা চিনাচার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারই অন্তর্গত। মদ্য-মাংসাদির সেবা, শ্মশানবাস ও শোক, তাপ, লজ্জা ও ঘৃণাদি বর্জ্জিত বাহ্যতঃ নানাবিধ কদাচার বা কুৎসিৎ ক্রিয়াই ইঁহাদের ধর্ম্মাঙ্গ। ন+ঘোর অর্থাৎ যাঁহার ঘোর কাটিয়াছে তিনিই অঘোর। সুতরাং সাধককে সংসারের সকল ঘোর বিনাশ করিবার জন্যই এই অঘোর আচার অবলম্বন করিতে হয়। "পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব পাশমুক্ত ভবেৎ শিব।" এই মহাবাক্যের স্বার্থকতার জন্য অঘোরাচারের অবলম্বন করিতে হইলেও, আক্ষেপের বিষয় কালের গতিকে শিক্ষার অভাবে তাহা এক্ষণে বিকৃত ও জঘন্য হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক কাশীতে

অঘোরাচারী সাধক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। 'অঘোরী-বাবা' এই সম্প্রদায়েরই একটী প্রসিদ্ধ সিদ্ধ-সাধক। ইহঁারা শক্তি ও শিবোপাসক, জটাজুট ও অস্থিমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া শ্মশানেই বাস করিয়া থাকেন। সময় সময় শবমাংসও ভক্ষণ করিতে ইহঁারা কুণ্ঠা বোধ করেন না।

আর্য্যসমাজ :—

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রবর্ত্তিত এই নূতন উপাসক-সম্প্রদায় কাশীর মধ্যে ধীরে ধীরে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহঁারা আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের ধরণে একেশ্বর-বাদী, তবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী এবং বৈদিক যজ্ঞ ও হোমাদি ক্রিয়ার বিশেষ পক্ষপাতী। রাজা রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজ যেমন কালে ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আর্য্যসমাজীদিগের মধ্যেও সেই ভাবের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—হয় ত কালে 'আদি-আর্য্যসমাজ' 'সাধারণ-আর্য্যসমাজ' ও 'নববিধান-আর্য্য-সমাজের'ও সৃষ্টি হইবে। যাহা হউক এই সমাজের কার্য্য এখনও বেশ ধীর ভাবে পরিচালিত হইতেছে। কাশীতে এই আর্য্যসমাজের একটী সভাগৃহ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ পঞ্জাবী, ক্ষেত্রী ও কতিপয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কাশীতে এই সমাজের প্রধান পরিচালক। স্বামী দয়ানন্দজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবার-প্রদেশস্থ 'মর্ভি' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইহাঁর নাম ছিল মূলশঙ্কর। স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকট ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও যোগ-শিক্ষা করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শীতকালে ইনি এই কাশীধামে পণ্ডিত

ও সাধুমণ্ডলীর সহিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিচার করেন কিন্তু তাহাতে পরাস্থ হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহরক্ষা করেন।

রাধাস্বামী-সম্প্রদায় ঃ—

আর্য্য-সমাজের ন্যায় ইহাও অধিকতর নূতন আর একটী উপাসক-সম্প্রদায়। বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে আগ্‌বার শিবদয়াল সিং নামক জনৈক উচ্চ-ইংরাজী শিক্ষিত প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী 'হুজুর সাহেব' কোন লয়যোগ-সিদ্ধ গুরুর উপদেশ-ক্রমে সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কাশীর বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত পণ্ডিত ব্রহ্মাশঙ্কর মিশ্র তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা এই নূতন মতের প্রচার ও উন্নতি করেন। তিনি মাধোদাসের উদ্যান বা 'সামিয়াওয়ালা বাগের' বাটীতে অবস্থান করিয়া রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের জন্য একটী উপাসনা-গৃহ নির্ম্মান করাইতেছিলেন ও সতত পরিশ্রম করিয়া নানা বিষয়ে ইহার উন্নতি করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা অকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় অন্যান্য ব্যক্তির যত্নে ইহার ক্রমেই প্রচার ও যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। এখানে বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জাতি ও শিষ্যত্ব গ্রহণে উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়াছেন। ইহাঁরাও কতকটা একেশ্বর বাদী ও লয়-যোগাত্মক ভক্তিমার্গের উপাসক।

'কিং এডওয়ার্ড হাঁসপাতালের' নিকট উক্ত বাগান-বাড়ীটীই আজকাল সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুন্দর ফটকওয়ালা দিব্য অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে। এই বিরাট অট্টালিকাই 'সৎসঙ্গ' বা রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ বা স্থান হইয়াছে। এক সময় ওয়ারেণ হেষ্টিং (ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনারেল) সাহেব

কাশীনরেশ চেৎসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাস্থ হইয়া এই বাগানের অন্তর্গত একটী কূপের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

দাদূপন্থী :—

পূর্ব্বকথিত কবিরপন্থী সম্প্রদায় হইতেই দাদূপন্থী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। কবিরের শিষ্যপরম্পরায় ষষ্ঠপর্য্যায়ে 'দাদূ-' নামে একজন মহাত্মা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহা হইতে এই দাদূপন্থীর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। 'দাদূ' আহমেদাবাদের একজন ধুনুরীর সন্তান। তিনি দ্বাদশ বৎসব বয়সে আজমীরের নিকট সম্ভর-নগরে আসেন, তথা হইতে কল্যাণপুরে যান, অনন্তর 'নরৈন' নামক স্থানে অবস্থান কালে দৈববাণী হয় "তুমি পরমার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হও।" এই দৈববাক্য শ্রবণ মাত্রেই তিনি তথা হইতে দূরে 'বহরণ' পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর একেবারে অন্তর্হিত হন। শিষ্যপরম্পরায় উক্ত আছে, তিনি পরমাত্মায় লীন হইয়া গিয়াছেন। দাদূপন্থীরা তিলক-ধারণ ও মালা-ধারণ না করিলেও জপমালা সঙ্গে রাখেন। ইহাঁদের উপাস্য 'রাম' হইলেও, বেদান্তসিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় 'তাঁহার' নির্গুণ স্বরূপই বর্ণন করেন। ইহাঁরা প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা অবিধেয় বলিয়া প্রকাশ করেন। ইঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—বিরক্ত, নাগা ও বিস্তরধারী। ১। 'বিরক্তসাধু' বিষয়রাগ শূন্য, পরমার্থ সাধনে নিরত থাকেন। ২। নাগারা অস্ত্রধারী সৈনিক-জীবী, এবং ৩। 'বিস্তরধারী'রা ব্যবসায়দ্বারা জীবীকা নির্ব্বাহ করে। দাদূপন্থীরা শবদাহ প্রথার অধিক পক্ষপাতী নহেন, হিংস্র পশুপক্ষীর আহারের জন্য শবদেহ প্রান্তরে নিক্ষেপ করেন। কাশীতে দাদূপন্থী সাধুদের কোন বিশেষ মঠ নাই, তবে এখানের নানা

স্থানে দাদুপন্থী সাধুরা প্রায় অবস্থান করিয়া থাকেন। হিন্দীতে ইহাঁদের অনেক ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

রোইদাসী ঃ—

রামানন্দ স্বামীর 'রোইদাস' নামক যে শিষ্য ছিলেন। তাহা হইতেই এই 'রোইদাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। রোইদাস পূর্ব্বজন্মেও রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, গুরুর অভিসম্পাতে চামারের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে জাতিস্মরতা গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল, তিনি শৈশবাবস্থায় পুনরায় গুরু-রামানন্দের কৃপা লাভ করেন। পরে পরম ভক্ত ও সিদ্ধ মহাপুরুষ হন। তিনি দেব-কৃপা লাভ করিয়া মন্দির ও শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণেরা তাহাতে বিরক্ত হইয়া তথাকার হিন্দু-নৃপতির সহায়তায় তাঁহার দেবসেবা কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিলে, রোইদাস নৃপতির আহ্বানে শালগ্রামসহ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে শালগ্রাম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, রোই সাগ্রহে নৃপতির সম্মুখে সেই শিলা রাখিয়া সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে সেই শিলা গ্রহণ করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রযত্নেও সেই শিলা তথা হইতে সরাইতে পারিলেন না। তাঁহারা স্তব-স্তুতি বেদ-পাঠ আদি সব করিলেন, কিন্তু সেই পাষাণরূপী ভগবান তিলমাত্রও টলিলেন না। পরিশেষে রাজার আজ্ঞায় সাধু রোইদাস স্তব করিবামাত্র সেই পাষাণ-ঠাকুর তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া আসিলেন। তখন রাজা তাঁহার উচ্চ ভগবদ্-সাধনায় সন্দেহহীন হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন।

চিতোরের এক রাজমহিষী রোইদাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা তাহাতে মহা কোপান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তখন রোইদাস রাণীকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার উপদেশ দেন। ব্রাহ্মণেরা পঙ্‌ক্তি-ভোজনে উপবিষ্ট হইয়া দেখেন যে, তাঁহাদের দুই দুইটী ব্রাহ্মণের মধ্যে এক একটী 'রোইদাস' অবস্থান করিতেছেন। রাস-রস-বিলাসিত কৃষ্ণলীলার অনুরূপ এই অলৌকিক লীলা দেখিয়া তখন ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার আনুগত্য ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অধুনা রোইদাসী-সাধুদিগের মধ্যে অধিকাংশ চামারই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য জাতীয় ব্যক্তি আর বড় দেখা যায় না। কাশীতে ইহাঁদের কোন স্থায়ী মঠের উল্লেখ শুনি নাই। তবে ভিক্ষুক ও পরিব্রাজকরূপে রোইদাসী-সাধু মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা যায়।

সুরদাসী, শিবনারায়ণী ও ভরথরী আদি সাধু :—

এই 'সুরদাসী,' 'শিবনারায়ণী' ও 'ভরথরী'-ভক্ত সাধুদেরও কোন নির্দ্দিষ্ট মঠাদির বিবরণ শুনা যায় না। তবে ভিক্ষুকরূপে ভজন-গাহক এই শ্রেণীর সাধুদের এখানে প্রায় দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত 'সুখরাশাহী,' 'ব্রাহ্মসমাজী' ও 'ফকির'-সাধু আদি বহু উপাসক-সম্প্রদায় এখানে বাস করিয়া আপন আপন অধিকার অনুসারে ভজন সাধন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সকলেই বিরাট হিন্দু-সমাজেরই অন্তর্গত। ভারতেই ইহাঁদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে।

মোসলমান ধর্ম্ম :—

ভারতে মোসলমান আধিপত্যের সূত্রপাত হইতেই কাশীতে মোসলমান-ধর্ম্মও যেন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কাশীবাসী

বহু মোসলমান এখানে প্রায় প্রতি মহল্লাতেই আপনাদের 'মসজিদ' নির্ম্মাণ করিয়া 'নেমাজাদি' কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইতি-পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাশীর মন্দিরাদি আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, গত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কাশীতে প্রায় তিন শত মসজিদ ছিল। তাহার পর এত দিনে আরও অনেক মসজিদ বা নেমাজের স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাঁদের নিজ ধর্ম্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইহাঁদের সঙ্ঘশক্তি বা সঙ্ঘঠন-শক্তি ও স্বধর্ম্মীর মধ্যে পরস্পর প্রেম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে"। এই মহাবাক্য মোসলমান ধর্ম্মেই যেন এখন পূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাঁদেব এক বিশেষত্ব এই যে, উপাসনা-কাল উপস্থিত হইলে পথে ঘাটে মাঠে গাড়ীতে যেঁখানেই হউক না, নিজ উত্তরীয় বা যে কোনও একখানি বস্ত্র বিস্তার করিয়াও তাহার উপর নেমাজ-উপাসনা করিবেন, তাহার অন্যথা প্রায় কখনই হয় না। ইহাঁদের মসজিদ ও নেমাজস্থান প্রতিষ্ঠার বেশ একটু কৌশল আছে। কোন স্থানে যদি ইহাঁরা কিছুদিন নেমাজ করিতে সুবিধা পান এবং সেই স্থানে যদি কোনরূপে সামান্য মৃত্তিকা ও ইষ্টক আদি দ্বারা একটী কবরের মত স্তূপ বা 'ঢিবি'ও করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে সেস্থান হইতে ইহাঁদিগকে আর কাহারও সরাইবার সাধ্য থাকে না, সে স্থান ইঁহাদের যেন চিরস্থায়ী হইয়া যায়। কাশীতে অনেক ভদ্রলোকের ভাড়া-বাড়ীতে বা দোকানের ছাদের উপর ও বাগানে এই ভাবে বহু নেমাজ-স্থান হইয়া গিয়াছে। ইহা যেন, ইঁহাদের দৃঢ়তা, স্বধর্ম্মানুরক্তি ও শঙ্ঘ-শক্তির ফল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী ভক্তেরই এইরূপ স্বধর্ম্মে

প্রগাঢ় প্রীতি থাকা একান্ত আবশ্যক।

খৃষ্টধর্ম্ম :—

ইংরাজ-রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান বা ক্রিশ্চান্‌দিগেরও গির্জ্জা বা চার্চ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গোদাওলিয়া গির্জ্জার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা প্রায় নেটিভ্‌ বা দেশী ক্রিশ্চান্‌দিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। এখানের খাঁটী য়ুরোপীয় ক্রিশ্চান্‌দিগের জন্য সহরের বাহিরে সিগ্‌রা মহল্লায় বড় গির্জ্জা আছে। তথায় ইংরাজ পাদরী-সাহেবও অবস্থান করেন। কবির-চৌরার পশ্চিমে জগৎগঞ্জের নিকট "জেনানা-মিসন" ও মিশনারি স্কুল আছে। তথায় ক্রিশ্চান্‌ মহিলারা অবস্থান করেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মের সহিত কাশীর যে বিশেষ প্রাচীন সম্বন্ধও আছে, তাহা এই পুস্তকের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। ভগবান শ্রীযীশুখৃষ্ট তাঁহার জীবনের অজ্ঞাতবাস কালে যখন তিনি তিব্বতে সাধন-নিরত ছিলেন, সেই সময় একবার কাশীতেও তিনি আসিয়া সারনাথের কোন বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন ও সনাতন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় একখানি "যীশোপনিষৎ" আছে, তাহাতেও যীশুখৃষ্টের বহু সাধন-শক্তির উল্লেখ আছে। ক্রাইষ্ট্‌ ত্যাগের ও শান্তির যেন প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, কিন্তু আধুনিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহার সেই উদার শান্তিময় আদর্শের যেন বিরোধি হইয়া পড়িয়াছেন। ত্যাগের আদর্শ ত ইহাঁদের মধ্যে এখন নাই বলিলেই হয়! যাহা হউক বর্ত্তমান ক্রিশ্চান্‌গণ যে অত্যধিক স্বার্থনিপুণ ও লৌকিকতাপূর্ণ উদার ভাবের ভাবুক হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মাচারী পাদরীদিগের মধ্যেও অন্ততঃ ইহার পুনঃ সংস্কার হওয়া উচিত।

থিয়োজফিষ্ট-সম্প্রদায় ঃ—

'থিয়োজফিক্যালসোসাইটী' বা 'তত্ত্ব-সভার' বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতের উত্তর প্রান্তস্থিত হিমালয়বাসী পরম করুণাধার ব্রহ্মজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ সভ্যজগতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারের উদ্দেশে তাঁহাদের শিষ্যা 'ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাটস্কি' নাম্নী জনৈকা রুষ-মহিলাকে প্রথমে উপদেশ দেন, তিনি আমেরিকাবাসী 'কর্ণেল অলকট্' নামক এক ধর্ম্মাত্মা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহায়তায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতেই নিউইয়র্ক-সহরে কতিপয় বন্ধুকে লইয়া এই সভা স্থাপন করেন। কিছু দিন পরে সেই মহাপুরুষদিগেরই আদেশ ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষে মান্দ্রাজের আদিয়ার-নগরে এই সভার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপনা করেন। অনন্তর ভারতে উক্ত সভার হেডকোয়াটার্স্ বা প্রধান স্থান এই কাশীধামেই 'লক্সা' মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য জগতের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু পাশ্চাত্য নাস্তিকতা ও সংশয়-বাদের প্রসার দেশের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতেই এই সভা ভারতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী পাশ্চাত্য-ভাবে শিক্ষিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট সুফল প্রদান করিয়াছে ও জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে মানব জাতির মধ্যে একটী 'ধর্ম্মকেন্দ্র' স্থাপন করিয়াছে। এই সভা বহু দেশের ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিয়া দুর্জ্জেয় নৈসর্গিক-বিধান ও মানব-হৃদয়ের নিগূঢ়-শক্তি-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ানুকূল সহায়তা করিয়াছে। এক্ষণে এই সভার পরিচালিকা 'মিসেস্ আনিবেসান্ত'। ভারতের বহু ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার বিশেষ অনুরক্ত।

কাশীর উপাসক-সম্প্রদায়-সম্বন্ধে এক প্রকার সমস্তই বলা

হইল। এই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখিয়া মনে হয়, পবিত্র বারাণসী-তীর্থ যথার্থই জগতের সমগ্রধর্ম্মের সমন্বয়-ক্ষেত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কাশীর সমাজ ও ক্ষেত্র বা ছত্র :—

কাশীর উপাসক-সম্প্রদায় লইয়াই কাশীর বিরাট সমাজ। কাশীতে নাই, এমন ধর্ম্ম নাই; নাই, এমন জাতিও নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই বৈদিকাচারি সাগ্নিক-ব্রাহ্মণ হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতে যতবিধ উপাসক-শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্তই যেন কাশীতে জীবন্তভাবে বিদ্যমান। তবে 'কাশীর-সমাজ' বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে লিখিবার আর কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে "কাশীর সমাজ" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত ও অনন্ত। এখানের এক বাঙ্গালী-সমাজ ধরিলেই একখানি স্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ লিখিতে পারা যায়, সুতরাং এরূপ গ্রন্থে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা বস্তুতঃই অসম্ভব। সেই কারণ অতি সংক্ষেপে দুই চারি কথায় তাহার আভাষ দিব মাত্র। পরকুৎসা নিশ্চয়ই মহাপাপ, কিন্তু আত্মকুৎসার কারণ অবগত হইলে, কালে আত্মোন্নতি হওয়া অসম্ভব নহে। এই হেতু কেবল আমাদের বাঙ্গালী-সমাজেরই দুই একটী জঘন্য বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিয়া পরে অন্যান্য কথা বলিব।

সকল সমাজ বা সকল বিষয়েরই সৎ-অসৎ দুই দিক আছে। সুতরাং এ সমাজের পক্ষেও তাহা স্বাভাবিক। এ সমাজ কাশীর মধ্যে যত কিছু সৎকার্য্য করিয়াছে, অসৎকার্য্য তাহার অনুপাতে অত্যুজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে যেন ঘন ঘোর অন্ধকারের ন্যায় অনুভূত হইবে। ১০ম শতাব্দী বা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ের স্বাধীন হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিগণ প্রসিদ্ধ পাল বংশীয় ও সেন বংশীয় দিগের রাজত্ব কালে এবং মোসলমান-আধিপত্য সময়ে বিশেষরূপে কাশীবিধ্বস্থ হইবার পর, বঙ্গের শেষ বীর 'প্রতাপাদিত্য' ও অৰ্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী 'রাণী ভবানী' প্রভৃতি হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের কত মহারাজ, কত রাজা, জমিদার এমন কি অনেক গৃহস্থ পর্য্যন্তও কাশীর পবিত্র ক্ষেত্রে কত শতসহস্র পুণ্য-কীৰ্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার হিসাব করা বস্তুতঃ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইলেও পরে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এক্ষণে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দির, মঠ ও ক্ষেত্র, বা ছত্র সমূহের আধুনিক অবস্থা দেখিলে বিস্মিত ও মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহারা যে সদুদ্দেশ্যে এই মহা পুণ্যময় কীৰ্ত্তিগুলি চিরস্থায়ী করিবার জন্য অদম্য উদ্যম ও বিপুল অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার রক্ষাকর্ত্তারূপে যে সকল কর্ম্মচারি বা অধ্যক্ষ অধুনা এ স্থলে নিযুক্ত আছেন, কেবল তাঁহাদের হীন স্বার্থপরতা ও কর্ম্মে একেবারে কর্ত্তব্য-হীনতার ফলে কাশীতে বাঙ্গালী-সমাজের যে ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় সে বিষয়ে কেহই এখন আর ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না।

এই সকল ক্ষেত্র বা ছত্রের নিয়ম এই যে, কাশীবাসী ধৰ্ম্ম-পরায়ণ সাধন-ভজন-রত ভিক্ষোপজীবী সাধু সন্ন্যাসী, দীন দরিদ্র,

অনাহূত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুক এবং বিদ্যার্থী দ্বিজ-কুমারগণ মধ্যাহ্নে এই স্থানে আহার করিতে পারিবে। কিন্তু ফলে তাহার ভিন্নরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নিত্য এই স্থানে আহার করে, তাহাদের অবস্থা ও ব্যবহার দেখিলে সকলের হৃদয়েই বিষাদ ও ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠে। প্রকৃত নিষ্ঠাবান কাশীবাসেচ্ছু ধার্ম্মিক সাধু ব্রাহ্মণের স্থান এখানে প্রায় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে মানব আকার বিশিষ্ট কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড বা বলীবর্দ্দ-সদৃশ ব্যক্তি, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ গুণ্ডার দল এখানে পুষ্ট হইতেছে মাত্র। আবার তাহাদের ব্যবহারও এত জঘন্য যে, সে সকলের উল্লেখ করিয়া লেখনী কলুষিত করিতেও ঘৃণা হয়।

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন "কেশেল" বলিয়া একটী শব্দ এখানে প্রচলিত আছে, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে, যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা কাশীবাসী বাঙ্গালী বা সমগ্র হিন্দু সমাজের যে ঘোর কলঙ্কের কথা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কাশী যে 'মুক্তিক্ষেত্র', তাহা বোধ হয় এই শ্রেণীর পক্ষেই প্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায়।

কেবল বাঙ্গালী বলিয়া নহে, ভারতের হিন্দু নামধারী যে কোন জাতির স্ত্রী কোনরূপ ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইলে, তাহাদের অনেকেই সেই সেই সমাজকর্ত্তৃক এককালিন্ বিতাড়িতা হইয়া রাজদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দ্বীপান্তরবাসীর ন্যায় চিরদিনের মত কাশীতে নির্ব্বাসিতা হইয়া থাকে। যাহাদের জগতে বা সমাজের কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই, পতিতপাবন কাশী বা বারাণসীই তাহাদের শেষ আশ্রয় স্থল। কেহ বা তাহার ফলে আত্মদোষ বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনায় তাহার অবশিষ্ট জীবন সৎভাবে

ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অধিকাংশই তাহাদের সেই পাপকালিমা সঙ্গের সাথী করিয়া মিথ্যা সতীত্বের আবরণে চির-সধবারূপে কাশীতে পিশাচীবৎ বিচরণ করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণ' ব্যতীত ছত্রে অন্যের আহার পাইবার বিশেষ সুবিধা নাই, সুতরাং কাশীতে আসিয়া দুর্ব্বিপাক-বশতঃ বা বুভুক্ষার তাড়নে বাধ্য হইয়াই অনেকে এমন কি অতি নীচ ও অস্পর্শীয় ব্যক্তিও বাজার হইতে বিলাতি সূতা বা গ্রন্থী দেওয়া পৈতা ক্রয় * করিয়া গলায় ধারণ করে ও ব্রাহ্মণ বলিয়া ছত্রের স্মরণাপন্ন হয়। ইহা অভ্রান্ত সত্য কথা, এরূপ ঘটনা সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত চিরসধবারূপা হিন্দু-স্ত্রী-জাতির ভীষণ কলঙ্ক-প্রতিমা-গুলির সহায়ক বা তাহাদের সর্ব্বনাশ-কর্ত্তারা ধোপা, নাপিত, ছুতার বা যে জাতিই হউক না কেন, সহজে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে এখানে পরিচিত হইতে চেষ্টা করে ; ইহার ফলে ছত্রে তাহাদের তখন স্থান সহজলভ্য হইয়া পড়ে। 'কর্ত্তারা' যখন ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন, 'গিন্নীরা' যথার্থ ব্রাহ্মণী না হইলেও তখন ভিন্ন জাতীয়া বলিয়া আর কেন পরিচয় দিবেন ? বিশেষ ব্রাহ্মণী-পরিচয়ে তাহাদেরও অনেক

* গ্রন্থী দেওয়া পৈতা বাজারে বিক্রয় হয়,' বাঙ্গালা দেশের লোক শুনিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য বোধ করিবে, কিন্তু এখানে সেরূপ পৈতা যথার্থই বিক্রয় হয় এবং তাহা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ নির্ব্বিবাদে ক্রয় করিয়া ধারণ করে। আবার আজকাল জাপান হইতেও গ্রন্থী দেওয়া পৈতা গাঁট গাঁট আসিতেছে এবং বিক্রয়ও হইতেছে। আক্ষেপের কথা, ঘোর স্বার্থপর ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জ্ঞানহীন হিন্দুরাই তাহার আমদানি কারক ও 'শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত' বলিয়া বিক্রয় কর্ত্তা।

লাভ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালায় 'বিধবা-বিবাহের জন্য যে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচার ও প্রচলনোদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এখানে ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, তিনি বৃথা এজাতির বিধবাদিগের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যাহা বিধিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্যভাবে এ দেশে প্রচলন করা দুঃসাধ্য, তাহাই অতি সহজে, অলক্ষে বা নির্ব্বিবাদে এখানে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে বাধা দিবার শক্তি বুঝি কাহারও নাই। পাগলকে "সাঁকো নাড়িও না" বলিলেই মুস্কিল, সে নাড়া দিবেই, নতুবা তুমি অসঙ্কোচে চলিয়া যাও, পাগল তাহার আপন ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিবে সে তোমার প্রতি লক্ষ্যও করিবে না। আমাদের হিন্দুসমাজের ঠিক সেই পাগলের ভাব হইয়াছে! সদসৎ কোন কিছু করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অবিচলিত চিত্তে তাহা তুমি করিয়া যাও, কেহ কোন কথাও বলিবে না, কিন্তু যদি তুমি নিজ উদারতা দেখাইয়া "পাঁচে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" এই প্রবচনের স্বার্থকতা করিতে চাও, যুক্তি দেখাইয়া সেই কাজ করিতে যাও, অমনি অসংখ্য অযাচিত প্রতিবাদে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিবে, তোমার উদ্দেশ্য চূর্ণ করিয়া দিবে, তুমি বিফল-মনোরথ হইবে। কাশীর এই বীভৎস সমাজেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেমন অসঙ্কোচে ইহারা স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় কাশীবাস করিতেছে, যেন ইহপরকালের কোন ভাবনা-চিন্তাই ইহাদের নাই! কর্ত্তা ছত্রে আহার করেন, আত্মপ্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্বদা নির্দ্দোষ সৎলোকের কুৎসা যেন ইঁহারা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য সৎজাতি, বৈদ্য বা কায়স্থ আদি ত দূরের কথা, একজন নবাগত যথার্থ

ব্রাহ্মণসন্তান আসিলেও তাঁহাদের পীড়নে তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে অতি হীনভাবে ছত্রে ভোজন করিতে হইবে। উপর্য্যুপরি ব্রাহ্মণের পরিচয়-প্রশ্নে তাঁহাকে তখন তাহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। তখন তাহাদের 'চোট্ পাট্' কথা শুনিলে মনে হইবে, ছত্রগুলি বুঝি ইহাদেরই চিরস্থায়ীরূপে অধিকৃত। এমন কি ছত্রেব অধ্যক্ষও সময় সময় তাহাদের আচারণে বাধা দিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ এই সকল দুর্দ্দান্ত লোক তাঁহাদের সহায় থাকিলে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের লাভ আছে। মধ্যাহ্নে ছত্রে আহারান্তে নিজের বাসায় যাইয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা ও বাজারে দাবাপাশা খেলিয়া ইহারা নিত্য দিনাতিপাত করে, সুবিধা মত যাত্রীদিগের দালালি করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেও বিরত হয় না বা তাহাই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। স্ত্রীলোকগণ বড় লোকের বাড়ীতে রন্ধন ও যাত্রীদিগের নিকট 'সধবা' বলিয়া পূজা প্রাপ্তও হয়। ইহাদের অধিক সংখ্যক পুত্র কন্যা হইলেও বিশেষ চিন্তা নাই। পুত্র, বড় হইতে না হইতে অষ্টম বর্ষে তাহাদের উপবীত হইয়া যায়, তাহা হইলেই বংশানুক্রমে তাহাদের ছত্রে অধিকার জন্মে, আর কন্যা, কুমারীরূপে অনেকদিন যাত্রীদিগের পূজা গ্রহণ করিতে থাকে। পুত্র বা কন্যা বড় হইলে প্রথম প্রথম সমশ্রেণীর মধ্যেই বিবাহাদি হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অবস্থা সামান্য উন্নত হইলে, পুত্র সভ্য ও শিক্ষিত হইলে, কন্যাদায়গ্রস্ত প্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সহজেই মিলিয়া যায়। যতদিন তাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারে, ততদিনই তাহারা "কেশেল" বলিয়া সামান্য হেয় হইয়া থাকে, কিন্তু সামাজিক সকল নিয়মই তখন বর্ণে বর্ণে

তাহারা মান্য করিয়া অতি সাবধানে দিনাতিপাত করে। পরে তাহারাও অনেককে "কেশেল". বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া নিজেদের নির্দ্দোষ প্রমাণ করে। বহু কাশীবাসী সৎব্রাহ্মণও গোপনে তাঁহাদের রক্ষিতা কাম-স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদিগের বিবাহে এই শ্রেণীর 'কেশেল' ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধার কর্ত্তা ও সহায়ক হইয়া থাকেন। কেবল বাঙ্গালী বলিয়া নহে এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এরূপ ঘটনা বহু দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডাদিগের মধ্যেও এভাবের যথেষ্টই বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আজ কাল বাঙ্গালী কায়স্থাদি দিগের মধ্যেও ধীরে ধীরে এই পাপ সংক্রামক হইতেছে। আর এক কথা এই সকল নবসৃষ্ট জাতির মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থাদি জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করে, তাহারা একেবারে কুলীন হইয়াই থাকে। সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি উভয়ই সমান। এই জন্যই বলিতে হয়, এক্ষণে 'কাশী' প্রকৃত পক্ষে ইহাদেরই প্রত্যক্ষ মুক্তিক্ষেত্র। তাহারা অসৎ হইয়াও এখানে সৎ ব্রাহ্মণাদি জাতিতে পরিণত হইতে পারে।

গৃহস্থের ন্যায় দণ্ডী, সাধু ও সন্ন্যাসী-শ্রেণীর মধ্যেও এই ভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সে সকল প্রত্যক্ষ কুৎসিৎ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না। ইহাতেই বোধ হয় কাশীর সমাজ সম্বন্ধে পাঠকের কতকটা জ্ঞান হইবে। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'শীতলাঘাট' প্রসঙ্গেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

ছত্রের মধ্যে সৎ-ব্রাহ্মণ, দণ্ডী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যে ভাল লোক আদৌ নাই, তাহা নহে; তবে এই সকল ভণ্ডের মধ্য হইতে সৎ লোক বাছিয়া লওয়া নিতান্তই কঠিন ব্যাপার!

কাশীর ছত্রগুলির মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবাণীর গোপালবাড়ী, কুচবিহারের কালীবাড়ী, পুঁটীয়ারাণীর, বিদ্যাময়ীর, রাজরাজেশ্বরী ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণের অন্নক্ষেত্র বা অন্নছত্রই বাঙ্গালীটোলায় বাঙ্গালী দানবীর দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কুচবিহার রাজার ছত্রটী যেন এখনও অবারিত দ্বার, যে কেহ যাইলে কেহই অন্নে বিমুখ হয় না।

আমবেড়িয়ার ছত্রে নিত্য ৫০।৬০ জন লোকের ভোজন ও প্রায় ৫০।৬০ জন লোককে মাধুকরী দেওয়া হয়।

পুঁটীয়ার ছত্রে ৪০।৫০ জন নিত্য ভোজন পায় ও তদনুরূপ মাধুকরী বিতরিত হয়।

বিদ্যাময়ীর ছত্রেরও ব্যবস্থা মন্দ নহে।

রাজরাজেশ্বরী ছত্রের ব্যবস্থা বেশ ভালই। নিত্য ২০।২৫ জন লোক বসিয়া ভোজন পায় ও মাধুকরীও ২৫।৩০ জনকে দেওয়া হয়।

রাণীভবাণীর ছত্রটীই পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখনও নিত্য ১০।১৫ জন ভোজন পাইয়া থাকে।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ছত্রের ব্যবস্থা খুব ভাল।

কাকিনার ছত্রও মন্দ নহে, অনেক লোক এখানে প্রতিপালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কাশীতে আরও ৫০।৬০টী বাঙ্গালীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রও আছে, যাহাতে নিত্য ৫।৭ জন করিয়া লোক সমাদরে অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী ছত্র ব্যতীত মাড়োয়ারী সেঠ্দিগের ছত্রও বিশেষ প্রশংসনীয়। অন্নপূর্ণাছত্র আদি নামে তাহাদের বহু ছত্রে বিদ্যার্থীদিগকে নিত্য অন্ন দেওয়া হয়।

দক্ষিণীদিগের নাটকোট ছত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু লোক তথায় নিত্য ভোজন পাইয়া থাকে।

কাশ্মীর-রাজার ছত্রেও বহু লোক অন্ন পাইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ-মন্দিরে সাধুদের জন্য-অন্ন ছত্র আছে।

ধ্রুবেশ্বর মঠের সাধুদিগের ছত্রে বহু সাধু নিত্য অন্ন পাইয়া থাকে।

পাটশ্বরী ছত্রে সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে বৈকালে ডাল রুটী দেওয়া হয়। ইহা হৃষীকেশের প্রসিদ্ধ কৈলাস-আশ্রমের মহান্ত-দ্বারা পরিচালিত।

বিকানিরের মন্দির-সংলগ্ন ছত্রও সাধুদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

আমেঠীরাজের ছত্রে ১০।১২ জন সাধু ও ব্রহ্মচারী নিত্য ভিক্ষা পাইয়া থাকে।

হাতুয়ারাজের ছত্রও উল্লেখ যোগ্য।

এই সমস্ত ও অন্যান্য ছোট বড় সকল ছত্র লইয়া কাশীতে অধুনা প্রায় হাজার ছত্র বিদ্যমান আছে। বহু বিদ্যার্থী, কাশীবাসী দীন-দরিদ্র ও সাধু-সন্ন্যাসিগণ নিত্য এই সমুদায় সেবা প্রাপ্ত হইয়া দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই সমুদায় ছত্রের পরিচালকগণ আজকাল কেবল হীন স্বার্থপরতার ফলে অতি কদর্য্য-ব্যবহার করিয়া দাতাদিগের উদার ও পবিত্র পুণ্য-কর্ম্মে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা তাঁহাদের সৎবুদ্ধি দিন।

কাশীর সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ :—

কাশীর সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ যে কত দিনের, তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে দুরূহ। তবে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থ কাশীর

সহিত বাঙ্গালীর যে অনাদিকাল হইতেই নানাসূত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধ সুদৃঢ়ভাবে বিজড়িত আছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ না পাইলেও, হিন্দুর দৃষ্টিতে তাহা অতি স্বাভাবিক ও সত্য কথা বলিতে হইবে। কাশী পুরাকালে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রাজগণের ন্যায় গৌড়-সম্রাট্-দিগেরও যে অধীন রাজ্য অথবা ইহা গৌড়-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃঃ পূর্ব্ব প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ আশোকের সময়ে কাশীতে বৌদ্ধ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু বাঙ্গালী বৌদ্ধ সারনাথের সন্নিকটে কাশীবাস করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী গৌড়-সম্রাটগণ যখন কাশীর বৌদ্ধ প্রভাব ধ্বংস করিয়া পুনরায় হিন্দুকীর্ত্তি সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণও সেই সময় দলে দলে কাশীতে প্রবাসী হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ-সাধারণতঃ গৌড় দ্রাবিড় ভেদে দ্বিবিধ। তাহা আবার পঞ্চ পঞ্চ অনুবিভাগে পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ দ্রাবিড় হইয়া দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। পঞ্চ গৌড় যথা :—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়াঃ মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

এই পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে গৌড় ব্রাহ্মণ যে, সেকালে শ্রেষ্ঠ বা কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার ভারতের ব্রাহ্মণগণই যে, চিরকাল সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাহা'ত বিশ্ববিশ্রুত। সকল কর্ম্মে তাঁহারাই অগ্রণী, উপদেষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহারাই কাশীধামে চিরদিন আর্য্য গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন সময়ে গৌড় ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা,

বুদ্ধি, প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা যথেষ্টই ছিল। মহাভারতের সময়েও গৌড়ের ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাব এত অধিক ছিল যে, মহারাজ জন্মেজয় তাঁহার সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে বঙ্গদেশ বা গৌড় হইতেও ঋত্বিক্ (ঋত্বিজ্) অর্থাৎ যজ্ঞের পুরোহিত ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রবাসী গৌড় ব্রাহ্মণগণ এখনও আপনাদিগকে জন্মেজয় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে আনীত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। একথা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের 'সেন্সস্‌রিপোর্টেও' বর্ণিত হইয়াছে।

গৌড় আবার বিভিন্ন বিভাগে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ নামেও সেকালে প্রসিদ্ধ ছিল। তখন কলিঙ্গের উত্তরাংশকেই উৎকলিঙ্গ বা 'উৎকল' বলিত। মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তখন মহাবল ভীমসেন পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও বঙ্গাধীন সমুদ্রসেনকে পরাজয় পূর্ব্বক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তীর্থ-যাত্রা সময়েও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বঙ্গে ও কলিঙ্গে যজ্ঞীয় গিরি শোভিত দ্বিজ ব্রাহ্মণ সেবিত ঋষিবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া ছিলেন। সুতরাং গৌড় বা বঙ্গ, ভারতের অতি প্রাচীন প্রদেশ। কাশীধাম যে অনেক সময় গৌড় বা বঙ্গের অন্তর্গত ও প্রভাবদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকথিত গৌড়ের গুপ্ত ও পাল বংশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের আধিপত্য সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশীতে গৌড় প্রভাব যথেষ্টই ছিল। তখন হইতে পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বিগ্রহ প্রস্তুত কারক বহু মৃৎ ও প্রস্তর-শিল্পীও গৌড় বা বঙ্গদেশের আধুনিক নদীয়া

আদি স্থান হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিয়াছিল। সুতরাং বহুকাল হইতেই কাশীতে যে বাঙ্গালীর নানাভাবে সম্বন্ধ ও তাঁহাদের দ্বারা বহু কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। তবে মোসলমান রাজাদিগের অধীনে কোন কোন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রাজপুরুষের তীব্র পীড়নে তাহার প্রায় সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই সমুদায়ের যাহা কিছু সামান্য ধ্বংসাবশেষ বা স্মৃতি-চিহ্ন আছে, তাহাতে বঙ্গ তথা ভারতের চির-গৌরব কয়েক জন কাশীবাসী মহাপুরুষের সময় হইতেই এ পর্য্যন্ত অনেক কথা জানিতে পারা যায়। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

জয়দেব ঃ—

"খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দু-বিল্ব নিবাসী পরম ভক্ত মহাকবি শ্রীমদ্ জয়দেব গোস্বামী মহাশয় তীর্থ-পর্য্যটন কালে এখানে কিছু দিন কাশীবাস করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে শ্রীভগবান জগন্নাথদেবের ইচ্ছায় গৃহী হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তাঁহার ভূমিতে এখনও একটী প্রাচীন মন্দির মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর যন্ত্র (শিলাময়ী) ও শিবলিঙ্গ বিগ্যমান আছে। জয়দেব পরে রাধা-মাধব-বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রণীত "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থ কেবল ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হইয়া বিশ্ব সংসার তাঁহার যশঃ সৌরভে আমোদিত হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার অতি পুণ্যবতী স্ত্রী সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন।"

কুল্লকভট্ট ও উদয়নাচার্য্য ঃ—

"খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার টীকাকার শ্রীমৎ কুল্লকভট্ট কাশীতে বাস করিবার সময় "মন্বর্থমুক্তাবলী" নামক সেই টীকা রচনা করেন। ইনি গৌড়-ব্রাহ্মণকুলগৌরব দিবাকর ভট্টের আত্মজ ছিলেন।" "গৌড়ে নন্দনাবাসী" বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

"বৌদ্ধবিজয়ী উদয়ানাচার্য্য মহাশয় ইহঁার সমসাময়িক ছিলেন। কাশীতে অবস্থান কালেই ইনি "কুসুমাঞ্জলি কিরণা-বলী, কনাদ সূত্রের টীকা, আত্মতত্ত্ববিবেক" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ঃ—

কাশীতে যতনবড়্ বা 'যতনবটে' "মহাপ্রভুর বৈঠক" উপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে চৈতন্য দেবের উল্লেখ করিয়াছি। কেদার-ঘাটের সংলগ্ন চৌকিঘাট যাহা সাধাণতঃ গোড়েনঘাট বলিয়া পরিচিত, তাহা গৌড় গৌরব 'গৌরঘাট' বা 'গোরাঙ্গঘাট' বলিয়া বহু প্রাচীন লোকের অভিমত। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুণী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধামে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইনি অশেষগুণসম্পন্ন প্রেমভক্তির প্রত্যক্ষমূর্ত্তি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতচন্দ্র, রূপ, সনাতন ও স্বরূপ আদি তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ও শিষ্যবর্গ সদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া জগতে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি চব্বিশবৎসর পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পরে আঠার বৎসর কাল

নীলাচলে থাকিয়াই লোক শিক্ষা প্রদান ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কাশীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গৃহী ও বৈরাগী সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপে মোসলমানদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকেই দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তখনকার বাঙ্গালার প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত 'বাসুদেব সার্ব্বভৌম' উৎকলে সবংশে চলিয়া গেলেন এবং তাহার পিতা 'মহেশ্বর বিশারদ' কাশীবাস করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু তীর্থ-পর্য্যটন কালে যখন কাশীধামে আসেন, তখন কাশীর দণ্ডী-সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে 'শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতী' বিদ্যাগৌরবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার এক শিষ্য 'হরি ভক্তি বিলাস' গ্রন্থ প্রণেতা 'গোপাল ভট্ট' চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ভক্তি-পথে গমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি চৈতন্যের প্রতি বিরূপ হন। চৈতন্যকে গালাগালি দেন। অনন্তর বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত হইয়াও চৈতন্যের ফাঁদে পাড়য়াছেন শুনিয়া আরও চটিয়া যান। চৈতন্যকে ঐন্দ্রজালিক মনে করেন ও সাধারণ্যে বহু নিন্দাবাদ প্রচার করেন। অনন্তর একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ একদা কাশীর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ তথায় হরিনাম করিতে করিতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার চির শত্রু হইলেও প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহাকে আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন। পরে গৌরাঙ্গের বিনয়-নম্র বচন, কমনীয় কান্তি ও নিতান্ত বিনীত ব্যবহারে মোহিত হইলেন। ক্রমে উভয়ে শাস্ত্রালোচনা হইতে লাগিল। তখন তিনি চৈতন্যের বিদ্যাবুদ্ধি বাক্ চাতুর্য্য ও বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যেরও আংশিক

দোষ প্রদর্শনসহ অপূর্ব্ব মুখ্যার্থ প্রতিপাদন শুনিয়া তিনি চৈতন্যকে ঈশ্বর বোধে ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। পরে তিনি চৈতন্যের ভাবে বিভোর হইয়া 'প্রবোধানন্দ' নামে অভিহিত হন। শুষ্ক বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ তখন ভক্তিরসে মজিয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞান-ভক্তির সমাহার হইল। যাহা হউক কাশীতে মহাপ্রভু পূর্ব্ব কথিত যতনবট্-মহল্লায় 'শ্রীকাশীনাথ মিশ্র' ও 'শ্রীতপন মিশ্রের' সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। এইরূপে পঞ্চগঙ্গাঘাটে ও হনুমানঘাটেও তাঁহার আসন বা বৈঠকের স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। ভক্ত বৈষ্ণবগণের ন্যায় বঙ্গবাসীমাত্রেরই তাহা যে পবিত্র বঙ্গ-গৌরব-স্মৃতি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রতাপাদিত্য ঃ—

মহাপ্রভুর পর কাশীর সহিত বঙ্গবাসীর অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় স্মৃতির পরিচয় যশোরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম শক্তি-উপাসক ও মহাপরাক্রান্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে, শ্রীশ্রীভগবতী ভবাণী, প্রতাপের ভক্তি-বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া যশোরে শিলাময়ী হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। প্রতাপ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বোধ হয় ১৫৭৮।৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্লের সহিত দিল্লীতে যাইয়া সম্রাটতনয় সেলিমের সহিত পরিচিত হন। ক্রমে কৌশলে সম্রাট-দত্ত 'সনন্দ' ও 'রাজা' উপাধি লইয়া প্রতাপ দেশে আসিলেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে কেহ কেহ বলেন ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা 'মানসিংহ' কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দীকৃত হন। প্রতাপ মহাপরাক্রান্ত বীর ছিলেন। মানসিংহকে তিনি যুদ্ধে নিহত করিতে

উদ্যত হইলে, তাঁহার খুল্লতাত পুত্র (মানসিংহকে গুপ্তভাবে সহায়দাতা) 'কচুরায়ের' দ্বারা অন্যায় ভাবে আহত হন; প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে মৃত বোধে ত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, সেই অবসরেই মোগল সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হয়। পরে মানসিংহ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় দিল্লী লইয়া যাইবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু মাতৃভক্ত বীরসাধক বারাণসীতে আসিয়াই দেহত্যাগ করেন। প্রতাপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাহার এক পৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন জয়তি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য।" অন্য পৃষ্ঠে "বাজৎ ছিক্কা রহিম জররে বাঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দ্দাল।" এইরূপ মুদ্রিত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইয়া বঙ্গ, বিহার ক্রমে প্রয়াগ পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি সেই সময়ে কাশীতে বহু কীর্ত্তি স্থাপনা করেন। কাশীর 'চৌষট্টিঘাটে' তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহিষমর্দ্দিণী ও ভদ্রকালীর মূর্ত্তিটী এখনও তাঁহার এক নিষ্ঠশক্তি-সাধনার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে। চতুঃষষ্টিযোগীনীর পাকা ঘাট্‌টীও তাঁহার কীর্ত্তিরাশির অন্যতম প্রমাণ চিহ্ন।

ভবানন্দ মজুমদার :—

যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে দিল্লীসম্রাট আকবরসাহ রাজা মানসিংহকে যখন সেনাপতি রূপে বঙ্গ বিজয় করিতে পাঠান, তখন ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের খুল্লতাত-পুত্র কচুরায়ের দেওয়ান ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি মানসিংহের

পক্ষ অবলম্বন করিয়া বঙ্গ-বিজয়ে তথা প্রতাপের নিধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কর্তৃক কতিপয় পরগণা ও 'রাজা' উপাধি পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। রাজা ভবানন্দ নবদ্বীপ-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই সংসারে অন্নপূর্ণাপূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশীধামের শ্রীশ্রীভবাণীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির জীর্ণোদ্ধার ও সংস্কার করিয়া অন্নপূর্ণা-ভবাণীরূপে শ্রীশ্রীজগন্ময়ীর নূতন ভাবে পূজা-বিধির তিনিই সূত্রপাত করিয়া যান। সেই অবধি কাশীখণ্ডের বর্ণিত ভবানীমূর্ত্তি 'অন্নপূর্ণা' নামেই প্রসিদ্ধা। পূর্ব্বে এ কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ :—

ঘাট-বর্ণনা-প্রসঙ্গে রাজা রাজবল্লভের উল্লেখ করিয়াছি। ইনি মণিকর্ণিকার পার্শ্বের শ্মশানঘাটটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, দশাশ্বমেধে শীতলার ঘাট ও ঘাটের উপর তাঁহার শিবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন ও সেই সঙ্গে দশাশ্বমেধের ঘাটটী ও তিনি আংশিক নির্ম্মাণ করেন।

নাটোর রাজবংশ ও রাণী-ভবানী :—

প্রাতস্মরনীয়া রাণী-ভবানী বাঙ্গলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রমণী। এমন বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, পুণ্যবতী, রাজনীতিজ্ঞা, দানশীলা ও পরোপকারিণী সতী স্ত্রীলোক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিপুল সম্মানের উপযুক্তা। এই বংশের আদি পুরুষ 'মথুর মৈত্র'। বঙ্গের ইতিহাসে নাটোর-রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইহা হইতে সপ্তম পুরুষ রঘুনন্দন মৈত্র সন ১১১৩ সালে এই রাজা

প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময়ে নাটোর রাজের ৫২ লক্ষ টাকা আয় ছিল। ১১৩১ সালে রাজা রামকান্ত নাটোরের অধিপতি হন। ইহাঁরাই সহধর্ম্মিনী ভুবনবিখ্যাতা রাণী-ভবানী। ইহাঁরাই পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত ভারত-বিখ্যাত রাজা রামকৃষ্ণ কপির. তপ ও সাধনা বলে মহাসিদ্ধিলাভ করিয়া মোক্ষধামে গমন করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দে রাণীভবানী কাশীবাস সময়ে ভুবনেশ্বর শিবমন্দির, দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড, কুরুক্ষেত্রতলাও, ভাস্কর পুষ্করতীর্থকুণ্ড, পিশাচমোচনতীর্থ, দশাশ্বমেধঘাট-আদি, কেশবের ঘাট, বহু ধর্ম্মশালা, অন্নক্ষেত্র বা অন্নছত্র, উদ্যান, বহু দেবমন্দির, চতুষ্পাঠী, ব্রাহ্মণাশ্রম, সাধুআশ্রম এবং সমগ্র পঞ্চক্রোশীর সমুদায় পথ ও পথিপার্শ্বস্থিত কূপ, কানন, ধর্ম্মশালা এবং প্রাচীন মন্দিরাদির সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বরাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কাশীধামের বাঙ্গালীটোলা একপ্রকার তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি এক বৎসরে ৩৮০ খানি বাটীর এক এক খানি সুসজ্জিত করিয়া এক সহস্র মুদ্রাসহ নিত্য দান করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণরা কাশীতে দান গ্রহণ সহসা স্বীকার না করায়, অধিকাংশ এদেশীয় ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীটোলার অধিকাংশ বাটী তাঁহারই নির্ম্মিত। ব্রহ্মপুরী ও ত্রিপুরা-ভৈরবী-মহল্লাও তাঁহারই নির্ম্মিত। তাঁহার কন্যা তারাদেবীও বহু সংকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। রাণীর রাজত্বসময়ে নাটোরের আয় দেড় কোটী টাকা ছিল। তিনি প্রতি বৎসর কেবল দরিদ্রদিগকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকগণের জন্য বহু টাকা বৃত্তিরূপে

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কাশীবাসীদিগের সুবিধার জন্য বহু সহায়তা করিতেন তাহাদের জন্য বাড়ী ও গ্রাসাচ্ছাদনের এবং অন্তে শ্রাদ্ধাদির সকল ব্যয় তখন তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে পঁচিশ মণ চাউল তিনি দরিদ্র দিগকে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নিত্য ১০৮ জন দণ্ডী-সাধু-পরমহংস ও সধবা স্ত্রীকে ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতেন। এই ভাবে তিনি প্রত্যহ প্রায় পাঁচ হাজার লোককে অন্নদান করিতেন। তিনি কাশীতে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বলিয়া পূজিতা হইয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তি শুনিতে পাওয়া যায়।

নাটোরের রাজসভার প্রধান পণ্ডিত কেবলরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপাল তর্কলঙ্কারকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাস করেন। তর্কলঙ্কার মহাশয় পরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

পুঁটীয়ার রাজবংশ :—

পুঁটীয়ার রাজবংশ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ সমাজের বিশিষ্ট ভূষণ-স্বরূপ। ইহা সমগ্র বঙ্গের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও ধনবান রাজ-বংশ বলিয়া খ্যাত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। রাজ-শাহী পরগণা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাধুরাম বাগচী নামক এক ব্যক্তি এই বংশের আদি পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর ৭ম পুরুষ নিম্নে বৎসরাচার্য্য নামে এক অতি সদাচারী ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরাচার্য্য হইতেই পুঁটিয়া রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার অষ্টাদশ সর্দ্দার সম্রাটের বিদ্রোহী হইলে, বাদসাহ তাহা দমনের জন্য যে সেনাপতিকে পাঠাইয়াছিলেন,

তিনি বৎসবাচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে সত্বর বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়া পুরস্কার স্বরূপ কিছু ভূমি-সম্পত্তি প্রদানের নিমিত্ত বাদসাহকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংসারে বিতশ্রদ্ধ সাধু-ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই বিশাল সম্পত্তি লইতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী যাইয়া আঠারটী পরগণার জমিদারী 'সনন্দ' লইয়া আসেন। ইঁহার পরে নীলাম্বর রাজা হন। শুনা যায় নীলাম্বরের এক উপপত্নী 'পুঁটী' নাম্নী এক স্ত্রীলোকের নামানুসারে আলিসাহী পরগণাকে তিনি পুঁটী বা পুঁটীয়া নামে পরিবর্ত্তিত করেন। সেই অবধি এই বংশ পুঁটীয়া রাজবংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই বংশের ভুবনেন্দ্র নারায়ণ রায় কাশীধামে কয়েকটী হাবেলী ও দুর্গাবাগান ক্রয় করেন। ১২১৩ সালে তিনি এক মাত্র পুত্র জগন্নারায়ণ রায়কে রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। জগন্নারায়ণ কাশীধামে প্রকাণ্ড ঘাট ও জগন্নারায়ণেশ্বর-শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার স্থাপিত অতিথিশালাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পত্নী রাণী ভুবনময়ী দেবীও অশেষ সদ্‌গুণ সম্পন্না ও পুণ্যবতী ছিলেন। কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটকে রাণী ভুবনময়ীই বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তরদ্বারা সুদৃঢ়রূপে বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘাটের উপর যে ব্রহ্মপুরী মন্দির ও শিবলিঙ্গ দেখা যায়, তাহাও রাণীমার অমর কীর্ত্তি। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ অন্নক্ষেত্র বা অন্নছত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এখনও বহু ব্রাহ্মণ, সাধু, দীন, দুঃখী, অতিথি প্রভৃতি নিত্য মধ্যাহ্নে তথায় পরিতোষে সেবা পাইয়া থাকে। এই বংশের পূর্ব্বকথিত পুরুষ বৎসবাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডাসন এখনও যথাস্থানে

বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ সাধু মহাত্মা শ্রীমৎ সদানন্দদেবের পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধ-সাধকপ্রবর রামমাণিক্য বিদ্যাসাগরমহাশয় ইঁহাদের বংশেরই কোন রাজার গুরু ছিলেন। রাজপ্রদত্ত বৃত্তি বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন। ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত রাজা তাঁহার সেই গুরুর আদেশে এক রাত্রিতে একলক্ষ কালীপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরীও এই বংশের প্রসিদ্ধা রাজবধূ। ইনিও কাশীতে অনেক পুণ্য কার্য্য করিয়াছেন।

হটীবিদ্যালঙ্কার :—

স্বর্গীয় ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত "বঙ্গের সেই একদিন ও এই একদিন" গ্রন্থে কাশীবাসিনী এই অসাধারণ বিদুষী ব্রাহ্মণকন্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, পরে তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যস্থানীয় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল ও একাল" গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি বর্দ্ধমানের সোঞাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিধবা অবস্থায় কাশীবাসকালে তিনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বিদ্যার্থীদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিতেন ও পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত হইয়া ন্যায় ও অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্রের বিচার করিতেন। তিনি অন্য সাধারণ পণ্ডিতদিগের ন্যায়ই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় পাইতেন।

ভূকৈলাসের রাজবংশ মহারাজ জয়নারায়ণ বাহাদুর :—

কলিকাতার অন্তর্গত গোবিন্দপুরে ইঁহাদের আদি বাস। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণকালে কন্দর্প ঘোষাল তাঁহাদের পূর্ব্ব

আবাস পরিত্যাগ করিয়া খিদিরপুরে নূতন বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর পুত্র গোকুল চন্দ্র বাঙ্গলার গভর্ণর ভার্লেষ্ট সাহেবের দেওয়ানী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট ইহাঁকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ইনিই ভূকৈলাসের রাজবাটী প্রস্তুত করান। ইনি 'কাশীখণ্ড,' 'করুণা-বিধানবিলাস' আদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ভূকৈলাসে যেমন "পতিত পাবনী" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কাশীধামেও তেমনি "করুণানিধান" নামক ঠাকুর বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের স্থাপনা করিয়াছেন। কাশীর গুরুধামের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও এই মহাত্মার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জয়নারায়ণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহার পুত্র রাজা কালীশঙ্কর রায় কাশীতে শিক্ষা-বিস্তার কমিটীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। ইহাঁর পূজনীয় পিতা মহারাজ জয়নারায়ণও ইহাঁর উদ্যোগেই সর্ব্বপ্রথম কাশীতে কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবিক উর্ব্বরমস্তিষ্ক বাঙ্গালী ভিন্ন এমন গুরুতর ও বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট পরিশ্রম জনক ব্যয় বহুল কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে? মহারাজার ও তাঁহার পুত্র রাজাবাহাদুরের সংবুদ্ধি, সতত দেশের ও দশের কল্যাণকর কার্য্য অতীব প্রশংসা যোগ্য। ইহাতে রাণী-ভবানীর ন্যায় ইহাঁরাও কাশীতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কাশীর প্রসিদ্ধ কুইন্সকলেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকার প্রথম 'নক্সাও' রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের সিদ্ধ-হস্ত রচিত। ইনি দশাশ্বমেধঘাটে এক যজ্ঞে বহু অর্থ ব্যয়

করিয়া তাহা সমাধা করিয়াছিলেন।

মহারাজ জয়নারায়ণ রাজকবি বলিয়া সেকালে পরিচিত ছিলেন। 'কাশীপরিক্রমার' সম্পাদক শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও কবিত্ব-শক্তির বিষয়ে সবিস্তারে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

নৃসিংহ দেব রায়, রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, বলরাম বাচস্পতি, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, উমাশঙ্কর তর্কলঙ্কার ও বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু কাশীবাসী বুধগণ কাশীপরিক্রমা সম্পাদনে মহারাজের সহায়ক ছিলেন।

এই সময় উক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার পুত্র উমাশঙ্কর তর্কলঙ্কার মহাশয় কাশীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া ও বহু প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় "কাশীযাত্রা-পদ্ধতি" প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত বিষ্ণুরাম তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলে নৃসিংহদেব রায় তাহা পদ্যে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

রাজা কালীশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত চৌকাঘাটের অন্ধাশ্রমের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি ইহার যাবতীয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

নৃসিংহদেব রায় ঃ—

পূর্ব্বকথিত নৃসিংহদেব রায় বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ রায় মহাশয় বংশোদ্ভব। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহার পিতা গোবিন্দদেব রায় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ বিঘা জমী দান করিয়াছিলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি কাশীবাসী হন। ইনি সাহিত্য, গীত ও চিত্রকলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি শক্তি-

উপাসক ছিলেন, উড্ডীশতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ ও শক্তি-বিষয়ক নানা সঙ্গীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় :—

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের ভগিনিপতি কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কাশীতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কালীপ্রসাদবাবু গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন। পরে কাশীতে ডেঃ কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার পুত্র হরগোবিন্দবাবুর কাশীতেই জন্ম হয়। ইনি অতি সজ্জন ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

চৌখাম্বার মিত্র বংশ :—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজসাহী কলেকটারের দেওয়ান বাবু আনন্দময় মিত্র সপরিবারে কাশীবাসী হন। কাশীতে চৌখাম্বা মহল্লায় তিনি প্রাসাদসম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ দেশের অনুরূপ বিধানে এখানে সমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপূজা আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র নাথ কাশীতে নানা জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিয়া রাজ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কুইন্স কলেজের সম্মুখ-দ্বার 'ফটকটী' ইঁহারই অর্থে বিনির্ম্মিত। ইঁহার পুত্র গুরুদাস ও বরদাদাস সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে কাশীস্থ ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। দেশহিতকর কার্য্যে ইঁহারা সততই মুক্তহস্ত ছিলেন। বরদাদাসের পুত্র রায় প্রমদাদাস বাহাদুর সুপণ্ডিত বলিয়া কাশীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাশীর মধ্যে কেবল ইঁহাদের বাটীতেই

কাশীর মহারাজ-বাহাদুর সময় সময় আগমন করেন। চৌখাম্বার প্রসিদ্ধ 'বসুবাবুরা' ইহঁাদেরই দৌহিত্র-সন্তান।

কাশিমবাজার রাজবংশ ঃ—

'ওয়ারেন হেষ্টিং' সাহেব ও কান্তবাবুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চেৎসিংহের সহিত যুদ্ধ-উপলক্ষে যখন হেষ্টিং সাহেব কাশীতে আসেন, তখন তাহার সহিত কান্তবাবুও ছিলেন। চেৎসিংহ প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ন করিলে, ইংরাজ সেনারা যখন রাজবাটী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, তখন কান্তবাবু কাশী-নরেশের অন্তঃপুরে মহিলাদের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য স্বয়ং দ্বার-দেশে উপস্থিত থাকিয়া পাল্‌কি করিয়া তাঁহাদের স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন। তাহাতে কাশীমহারাজের নানা বহুমূল্য রত্ন উপহার স্বরূপ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধর দানবীর প্রসিদ্ধ মহারাজ মনিন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর এক্ষণে কাশীর একজন বিশিষ্ট অধিবাসী। কাশীতে নানা সদনুষ্ঠানে ইনি মুক্তহস্ত। এই বংশের মহারাণী স্বর্ণময়ীও ইতিপূর্ব্বে কাশীবাস-উপলক্ষে বহু পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ ঠাকুর সদানন্দ দেব সরস্বতী ঃ—

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরমহংস-প্রবর শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ সরস্বতী দেব কাশীতে কিছুকাল 'ধনেশ্বরানন্দ' বাবা ও কিছুকাল মৌনীবাবা বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। ইনি কলি-কাতার সন্নিকট বরাহনগর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক অষ্টাদশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রেমচাঁদ বেদান্তবাগীশ ও মধ্যম সহোদর ঈশানচন্দ্র শিরোমণিও কিছুকাল কাশীবাস করিয়া-

ছিলেন। ইহঁাদের পিতামহী কাশীবাসী হইয়াছিলেন। ঠাকুর সদানন্দের পুর্ব্বনাম 'ঠাকুরদাস' ছিল। ইনি দৈব-উপদেশ-প্রাপ্ত অসাধারণ সাধক ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শুনা যায়। তিনি এখনও কৈলাসধামে অবস্থান করিতেছেন। "ঠাকুর সদানন্দের" প্রসিদ্ধ জীবনচরিত্র পাঠ করিলে সকলেই পুলকিত হইবেন। ইহঁার পূর্ব্বাশ্রমের দৌহিত্রবংশের অনেকে এক্ষণে কাশীবাসী হইয়া আছেন। ইহাঁর পুণ্যবতী মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাময়ী দেবী বহুকাল হইতে স্থায়ীভাবে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় নব্বই বৎসর হইবে। গঙ্গাদেবীর গর্ভসম্ভূত ইহঁার দুই জন দৌহিত্রও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একজন তাঁহারই পদাঙ্কানুশরণে সরস্বতীনামা সাধু, এক্ষণে পরমহংসাশ্রমী ত্যক্ত-দণ্ড সন্ন্যাসী, অন্যজন দৈবকৃপালব্ধ ব্রহ্মচারী সাধুরূপে উন্নত সাধক। তাঁহারাও অনেক সময়ে কাশীধামে অবস্থান করিয়া থাকেন।

দয়ারাম বিশ্বাস ঃ—

নোয়াখালির নিমকমহলের অবসর প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺দয়ারাম বিশ্বাস কাশীবাস করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানলে তাঁহার দেহের সৎকার হয়। তাহাতে কাশীর অধিবাসীরা প্রথমে বাধা দিয়াছিলেন, পরে বেনারস-মহারাজের সহায়তায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাহা সমাধা হইয়াছিল। কাশীতে বিশ্বাস বংশও এখন বিশেষভাবে পরিচিত।

রাজা রামমোহন রায় ঃ—

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় প্রায় দশ বার

বৎসর, কাশীতে অবস্থান করিয়া বেদ ও দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যায়ন করিয়া ছিলেন। বহু সংস্কৃত-শাস্ত্রের সংগ্রহ কার্য্যেও তিনি সেই সময় কাশীতে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি :—

প্রসিদ্ধ বাচস্পত্যাভিধানের সঙ্কলনকার তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কাশীতেই বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অন্তিমে কাশীতে আসিয়াই দেহত্যাগ করেন। তিনি কৃষি ও বানিজ্যাদি নানা বৈষয়িক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ও 'শব্দস্তোম মহানিধি' আদি নানা গ্রন্থ আছে। তাঁহার "বাচস্পত্যাভিধান" এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এত বড় সংস্কৃত অভিধান জগতে আর নাই। কাশীতে পণ্ডিতসমাজের মধ্যেও তাঁহার অসীম খ্যাতি ছিল।

কাশীর পণ্ডিত-সমাজে বাঙ্গালীর প্রভাব :—

বহুকাল হইতে কাশীতে বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের যথেষ্ট প্রভাব চলিয়া আসিতেছে। কাশীর সংস্কৃত-কলেজ স্থাপনা অবধি তাহা আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে। এই কলেজের প্রথম ও প্রধান অধ্যাপকপদে স্বর্গীয় চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় নিযুক্ত হন। পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র নিওগীও এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ আদি গ্রন্থ-প্রণেতা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কাশীবাসী হইলে, বেনারস-মহারাজ তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি দেন। বহু সাধু, ব্রহ্মচারী

ও বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য্য, তারাচাঁদ তর্করত্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ও মাতা কাশীলাভ করেন। শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন, যাদবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম সার্ব্ব-ভৌম, রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। স্বর্গীয় তারাচাঁদ তর্করত্ন মহাশয় মহারাজ বেনারসের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র সুপণ্ডিত প্রিয়নাথ তর্করত্ন ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ মহামহো-পাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। কাশীবাসী মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় তর্করত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরো-মণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কাশীতে অসাধারণ প্রতিপত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখনও বামাচরণ তর্কাচার্য্য প্রভৃতি ইহাঁদের ছাত্রবর্গ কাশীর প্রধান নৈয়ায়িক অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত। মহামহোপাধ্যায় অন্নদাপ্রসাদ চূড়ামণি প্রভৃতি এখনও কাশীতে অসাধারণ পণ্ডিত্বের পরিচয় দিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও শেষ জীবনে কাশীবাস করিয়া বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র সদানন্দ ও নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য অতি অমায়িক লোক।

সংস্কৃত-শাস্ত্রাধ্যাপনা ব্যতীত স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র সান্যাল, রায় অভয়চরণ সান্যাল বাহাদুর, নীলকমল ভট্টাচার্য্য, ফণিভূষণ অধিকারী, যাদবচন্দ্র প্রভৃতি গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরাজী দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনায় অসাধারণ কৃতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও

করিতেছেন।

রামকালী চৌধুরী :—

রামকালী চৌধুরী বাল্যকালে পিতৃহীন হইলে মাতার সহিত কাশীবাসী হন। কাশীতে অধ্যায়ন করিয়া সেকালের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তিলাভ করেন ও বেনারসের কমিসনারের নিকট আইন শিক্ষা করিয়া ক্রমে সদরালা ও জজের পদে উন্নতি-লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে কর্ম্মে অবসর লইয়া কাশীতে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র আনন্দচন্দ্র কাশীর প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণেল চৌধুরী এক্ষণে বেনারস মহারাজার প্রধান ডাক্তার।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় :—

রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় শেষ জীবনে কাশীতে বাস করেন। ইনি 'পুলিস ও লোকরক্ষা', 'আত্মচিন্তন', 'আচারচিন্তন' ও জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'জীবনচরিত' আদি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

লোকনাথ মৈত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী :—

কাশীতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় লোকনাথ মৈত্র মহাশয় দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার চিকিৎসার গুণে তখন কাশীর সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক-মাত্র শিষ্য কাশীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী এখনও তাঁহার সেই সুনাম রক্ষা করিতেছেন। লোকনাথবাবু বহু দরিদ্রের ও অসহায়ের সহায়তা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঃ—

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর স্বধর্ম্মপরায়ণ বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি কাশীতে দশাশ্বমেধের রোডের উপর সুরম্য প্রস্তরময় শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনী মহারাণী ত্রৈলোক্যমোহিনীদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরের সংলগ্ন অন্নক্ষেত্র বা অন্নসত্রে নিত্য বহু বিদ্যার্থী, কাশীবাসী ব্রাহ্মণ সাধুও ভোজন করিয়া থাকে। মন্দিরে নিত্য নহবৎ বাজে। দেবতার ভোগারুতিরও বেশ সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীমতী বিমলা দেবী ঃ—

মৈমনসিংয়ের প্রসিদ্ধ জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর মাতামহী শ্রীমতী বিমলা দেবী কাশীতে অনেক সদ্‌কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। কাশীবাস কালে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া ভরতপুরের মহারাণী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

দেওয়ান কমলাকান্ত রায়চৌধুরী ঃ—

ভাগ্য বিপর্য্যয়ে কমলাকান্ত বা কমলাপতি গৃহত্যাগ করিয়া গোরক্ষপুরে আসিয়া ইংরাজের অধীনে দেওয়ানী পদ লাভ করেন। সেই সূত্রে তিনি কাশীতে আসেন ও কাশীর দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদিগকে শাসন করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হন। তখন কাশীতে ভীষণ গুণ্ডার উপদ্রব ছিল সেই কারণ তিনি তাহাদের অত্যাচার নিবারণের জন্য কাশীতে স্থানে স্থানে সরকারি অর্থব্যয়ে চারিটী 'তোরণ' বা দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। রাত্রিকালে সেই দ্বার

রুদ্ধ করিয়া তখন কাশীবাসীকে নিরুপদ্রবে রক্ষা করা হইত। পুরাতন কাশীবাসীগণ ইহাকে "দেওয়ান কমলাপতিকা ফাটক" বলিয়া এখনও বর্ণন করিয়া থাকে। বাঙ্গালীটোলার মধ্যে প্রসিদ্ধ 'হাত্তীফটকা' তাহারই অন্যতম। তিনি টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদারবংশ-সম্ভূত। কাশীর দশাশ্বমেধের রাস্তার উপর তাঁহারই বংশের শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদপ্রতিম সুন্দর "টাকী নিবাস" শিব-মন্দির ও বাসভবন অবস্থিত। সূর্য্যকান্ত বাবু শিক্ষিত ধর্ম্ম-পরায়ণ ও অতি অমায়িক ব্যক্তি। এক্ষণে তিনি প্রায় কাশীতেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার অভিভাবক ও উপদেষ্টা স্বনামপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বসু মহাশয় এই সকল কীর্ত্তিকলাপে তাঁহাকে অনুপ্রাণীত ও সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু সূর্য্যকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠ ভগিনী-পতি ছিলেন।

গিরীশচন্দ্র দে :—

মিউটিনীর বহু পূর্ব্বে গিরীশবাবুর পিতা কাশীবাসী হন। গিরীশবাবু মহারাজ বেনারসের অতি প্রিয়পাত্র সচীব ও দেওয়ান ছিলেন। তিনি নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও অত্যন্ত শিল্পকলানু-রাগী ছিলেন। রামনগর দুর্গে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে কাশীনরেসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ও কনিষ্ঠ পুত্র কাশীর উকিল।

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় :—

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছুকাল বেনারস মহারাজের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার পুত্র জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ও বহুদিন হইতে মহারাজের উচ্চ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত আছেন।

ললিত মোহন সেন ঃ—

মহারাজ বেনারসের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীরূপে ললিতবাবু এক্ষণে কাশীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছেন। কাশীর নানা লোকহিতকর কার্য্যে তিনি সদাই অগ্রগণ্য। তাঁহার যত্নে কাশীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বারওয়ারী উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে।

মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব ঃ—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের" প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, শিল্পাচার্য্য, অদম্য নিষ্কাম কর্ম্মী ও দার্শনিক পণ্ডিত মন্মথনাথ স্বীয় পূজনীয়া পিতামহীর কাশীবাস উপলক্ষে প্রথমে কাশীতে আগমন করেন। তিনি কাশীতেও তাঁহার সেই অতীব প্রিয়-অনুষ্ঠান শিল্প-বিদ্যালয়ের একটী শাখা "সেণ্ট্রাল আর্টস্কুল" নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ বাবু আমীর সিং, বাবু দুর্গাপ্রসাদ বি. এ., বাবু সীতারাম এম. এ., রায় শিবপ্রসাদ, রাজা সত্যানন্দ, বাবু ঠাকুরদাস, কাশীনাথ বরাট্, শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নানকচাঁদ, শ্যামনারায়ণ শর্ম্মা প্রভৃতি তাঁহার সেই সময়েরই ছাত্র। কুইনস্‌কলেজ, সেণ্ট্রাল-হিন্দুকলেজ, হরিশ্চন্দ্র-হাইস্কুল, সনাতন-ধর্ম্ম স্কুল, থিয়োসফিক্যাল স্কুল প্রভৃতি কাশীর প্রায় সকল স্কুলেই তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রগণ চিত্রকলার শিক্ষকরূপে এখনও নিযুক্ত আছেন। কুইন্স কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক অভয়চরণ সান্ন্যাল সেণ্ট্রাল-হিন্দুকলেজের সর্ব্বপ্রথম অধ্যক্ষ বিজ্ঞানশাস্ত্রবিশারদ

ডাঃ রিচার্ডসন ও এই কলেজের অবৈতনিক সহকারী অধ্যক্ষ বাবু মাতাপ্রসাদ এম, এ, প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদেরই অনুরোধে তিনি কিছুদিন উক্ত হিন্দুকলেজে অবৈতনিকভাবে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে তিনি রাজা মাধোলাল প্রভৃতি তাঁহার বন্ধু ও কাশীবাসীগণের পক্ষ হইতে সম্রাটের অভি-নন্দনপত্র লইয়া নৈনিতালে লাটসাহেবের হস্তে অর্পণ করিতে যান। সেই অভিনন্দন পত্রের অপূর্ব্ব আধারটীও তাঁহারই উদ্ভাবনাপ্রসূত। বিলাতে তাঁহার খুব প্রশংসা হইয়াছিল। তিনি কাশীর শিল্পপ্রদর্শণীর অন্যতম সেক্রেটারীরূপে প্রদর্শণীর প্রধান সেক্রেটারী তাঁহার ছাত্র বাবু দুর্গাপ্রসাদকে সহায়তাপূর্ব্বক প্রদর্শণীর কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়া-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ কালীকৃষ্ণ বাবু বেনারস 'এড্ওয়ার্ড সেভেন্থ' গবর্ণমেণ্ট-হাঁসপাতালের অবৈতনিক চক্ষুপরীক্ষক, তাঁহার পূজনীয়া মাতার কাশীবাস উপলক্ষে এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছেন। কাব্য শিল্পবিশারদ শ্রীমান্ শ্যামলাল প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাও অনেক সময় কাশীতে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্যতম বন্ধু বাবু শ্যামসুন্দর দাস বি, এ, মহাশয়ের সহিত তিনি "কাশীনগরীপ্রচারিণী সভার" প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। হিন্দী-ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সচিত্র মাসিক-পত্রিকা "সরস্বতী" প্রকাশে তিনি শ্যামসুন্দরবাবুকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। হিন্দীভাষায় তাঁহার "আলোকচিত্রণ" নামক গ্রন্থ সেই 'সরস্বতী পত্রিকাতেই' প্রকাশিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ তীর্থ ও শিষ্যশ্রেণী ঃ—

বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ সর্ব্ববিদ্যার বংশ-সম্ভূত একজন ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী কাশীতে আসিয়া, দণ্ডীসন্ন্যাসী হইয়া পরে ষষ্ঠ মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী নামে পরিচিত হন ও কাশীধামের গণেশ-মহল্লায় শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শাখা সারদামঠের মহান্তরূপে অভিষিক্ত হন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্মীভূত হন। অনন্তর তাঁহার শিষ্য প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী উক্ত মঠের মহান্তরূপে বহু অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ১৭৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চেৎসিংহ যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংএর ভয়ে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, তখন ইংরাজ-সৈন্য মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মহিপনারায়ণকে গণেশমহল্লার মধ্য দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। প্রকাশানন্দ স্বামী তখন এক বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া উগ্রতপস্যায় শ্রীশ্রীভদ্রকালীর উপাসনায় রত ছিলেন। মহিপনারায়ণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার কৃপা হয়। তিনি তাঁহাকে 'অচিরে রাজা হইবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে আশীর্ব্বাদ তাঁহার সফল হইল, তিনি হেষ্টিংসাহেবের দ্বারা অবিলম্বে চেৎসিংহের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তখন মহিপনারায়ণ মহারাজ হইয়া সাধুর নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তদবধি এই মঠ রাজ-গুরুস্বামীর মঠ বলিয়া অভিহিত হইল। বাঙ্গালী দণ্ডী-সাধুদের দ্বারা পরিচালিত এই মঠটী এখনও বেনারস-মহারাজের বৃত্তি-প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রকাশানন্দ স্বামীর শিষ্য পুরুষোত্তমানন্দ স্বামী তাঁহার পর মহান্ত হন। 'মোরেশ্বর' ও 'মলুটীর' রাজারা ইঁহার শিষ্য হন।

অতঃপর তাঁহার শিষ্য সদাশিবানন্দ স্বামী মহান্ত হন। ইহাঁর পর বাসুদেবানন্দ স্বামী মহান্ত হন। ইনি বেদান্ত ও উপনিষদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনন্তর হরিহরানন্দ স্বামীকে কাশীর মহারাজ আসিয়া মঠের গদীতে বসাইয়া যান। ইনি মহারাজ উদিৎ নারায়ণের গুরু ছিলেন। কতিপয় দুষ্ট লোক মহারাজকে তাঁহার গুরুদেবের গ্লানিকর কথা বলিয়া কিছু বিচলিত করিয়া তুলিল। মহারাজ তাঁহার অভিন্নহৃদয়-বন্ধু চৌধাম্বানিবাসী স্বর্গীয় গুরুদাস মিত্র মহাশয়কে পত্র দিয়া তাঁহার গুরুদেবের আচরণ অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। একদিন চৈত্রমাসে ফলাহারী-অমাবস্যার রাত্রিতে সেই দুষ্ট লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া গুরুদাসবাবু সাধকের বেশ ধরিয়া সহসা সেই মঠের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করায় স্বামীজীর এক শিষ্য স্বামীজীর আদেশে দ্বার খুলিয়া দিল। গুরুদাসবাবু প্রণাম করিয়া মায়ের মন্দিরে জপ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। পূজা-হোমাদি সমাপ্ত হইলে স্বামীজী শিষ্যকে প্রসাদ বিতরণ করিতে বলিলেন। সিদ্ধবীরাচারী স্বামীজীর পঞ্চ-মকারের নির্দ্ধারিত মদ্যআদি প্রসাদ সমুদায়, উপাদেয় ফল ও অমৃতোপম সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া গুরুদাস-বাবু আদি সকলে চমৎকৃত হইলেন। সেই দুষ্টদিগকে তিনি তখন নানারূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তদবধি চৌধাম্বার মিত্রবংশেও ফলাহারী কালীপূজা চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার শিষ্য সত্যাসন্ধ্যানন্দতীর্থ, তৎশিষ্য ব্রহ্মানন্দতীর্থ। ইহাঁর পর রাঘবানন্দ স্বামী, শিবানন্দতীর্থ, ক্রমে বিশ্বেশ্বরানন্দ স্বামী ও

কালিকানন্দতীর্থ স্বামী মহান্ত হন। এক্ষণে সত্যানন্দতীর্থ স্বামী মঠের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। বাঙ্গালী দণ্ডী-সাধুদের এই মঠটী সকল বাঙ্গালীরই গৌরবের বস্তু। এই মঠের প্রাচীন পুঁথীগুলি শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ত ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীমৎ রামানন্দ তীর্থ স্বামী ঃ—

কামাখ্যা বা কামরূপ মঠের শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দতীর্থ, প্রবোধানন্দতীর্থ ও যোগানন্দতীর্থ প্রভৃতিও বহু কাল হইতে বাঙ্গালী দণ্ডী স্বামীদের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কাশীর নির্ব্বাণীমঠেও বহু কাল হইতে বাঙ্গালী নাগা-সাধুগণ বিশেষ সম্মানের সহিত অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভিরানন্দ সরস্বতী ঃ—

'হুগলি' জেলার অন্তর্গত 'হরিপালের' নিকট 'বলদবন্দ' গ্রামে ইহঁার জন্ম হয়। ইনি চির-কুমার ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই জামালপুরে রেল্ল অফিসে ইনি চাকুরি করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীও (শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) ঐ সময়ে জামালপুরে চাকুরি করিতেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল। ইনি অতি মিষ্টভাষী ছিলেন, সকলেই ইহঁাকে ভক্তি করিত, ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। প্রতিবেশী বালক-বালিকারা সকলেই "বামুনকাকা" বলিয়া ইহঁাকে আহ্বান করিত।

'জামালপুর-হরিসভায়' বিদেশী বক্তার শুভাগমন হইলে স্বামীজিরই পূর্ব্বাশ্রমের বাসায় থাকিতেন। ইনি সকল কার্য্যেই

একনিষ্ঠ ছিলেন, ব্যায়ামচর্য্যা ও গুপ্তভাবে ধর্ম্মচর্য্যা করা ইহাঁর ব্রত ছিল।

৪০।৪২ বৎসর বয়সে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট কাশীধামে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চাকুরির সময়ে ইহাঁর সংস্কৃত লেখাপড়া বিশেষ জানা ছিল না। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণান্তর দেখা গিয়াছে ইনি উচ্চজ্ঞান-বিষয়ের অলৌকিকভাবে সমাধান করিতেন।

ইনি পুষ্করতীর্থে দুই বৎসর অবস্থান করেন। সেই সময়ে ঐ তীর্থসংক্রান্ত অনেক জটিল বিষয়ের তিনি মীমাংসা করেন এবং সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। পুষ্করতীর্থ হইতে ৺কাশীধামে পুনরাগত হইয়া ২।১ বৎসর পরেই সমগ্র ভারতের যাবতীয় বিশিষ্ট তীর্থ-দর্শন-মানসে বহির্গত হন। তীর্থ-দর্শনান্তর ৺কাশীধামে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর আশ্রম মধ্যেই অবস্থান করেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইহাঁর দুইটী বৈদ্যজাতীয় বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এতই সম্প্রীতি ছিল, যে ইনি এক বন্ধুর বিয়োগান্তর, সেই বন্ধুর পুত্রের সহিত অপর বন্ধুর কন্যার বিবাহ দেন। সেই বৈদ্য-বন্ধুই ইহাঁর ৺কাশীধামের বাসের সময় সেবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকিতেন; ইহাঁকে ভিক্ষার জন্য অপরের দারস্থ হইতে হইত না। যে সকল বিদ্যার্থীরা ইহাঁর নিকট থাকিতেন, তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়া ইহাঁর ভিক্ষা প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

'যোগাশ্রম'-প্রতিষ্ঠার সময় ইনি উপস্থিত ছিলেন। দেহ-ত্যাগের সময় ইনি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত হইয়া যোগাবলম্বনে দেহ রক্ষা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন সরস্বতী :—

'চতুঃষষ্টি' ঘাটের নিকট 'গোপাল বাটী' নামক পল্লীতে এক উদ্যানবাটীতে শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন সরস্বতী বাঙ্গালী দণ্ডী-সন্ন্যাসী-মহারাজের আশ্রম ছিল। তিনি 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীতে বাঙ্গালী কবিরাজ বৃন্দ :—

প্রসিদ্ধ প্যারীমোহন কবিরাজ, পরেশ নাথ কবিরাজ, কালী কবিরাজ, উমাচরণ কবিরাজ ও ধর্ম্মদাস কবিরাজ, হারাণ-চন্দ্র প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় কাশীতে প্রভূত খ্যাতি ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালী কবিরাজগণই কাশীতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন।

হেতমপুরের রাজা ও পালধী-বংশ :—

হেতম পুরের প্রসিদ্ধ রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী যখন কাশীতে শিক্ষার জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় কেদার নাথ পালধী মহাশয় তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। এই পালধী-বংশ কাশীতে বহুদিনের অধিবাসী। রামনিধি পালধী, হরিনাথ পালধী প্রভৃতি এই বংশের যোগ্য সন্তান।

ইন্দ্রনারায়ণ বাপুলী :—

কাশীতে এই বাপুলী-বংশও বহু প্রাচীন। ইহাঁরাও কাশীতে অনেক কীর্ত্তি করিয়াছেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী :—

শ্রীনাথ ভাদুড়ী ও তাঁহার পুত্র সোমনাথ ভাদুড়ীরাও

বহুকাল কাশীবাসী। ইনি দ্বারভাঙ্গা-মহারাজের কাশীস্থিত জমিদারীর পরিদর্শক (ম্যানেজার)।

তাহেরপুর-রাজ ঃ—

'রাজসাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর কাশীতে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। ইনি ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনেকদিন সেক্রেটারী ছিলেন। পরে ত্রিশূল পত্রিকা সম্পাদন করেন। এক্ষণে 'মহামণ্ডল প্রেস' নিজ অধিকারে রাখিয়া বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। ইনি নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। কেদারঘাটে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা "তাহেরপুর ভবন" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কোদালের ভট্টাচার্য্য পরিবার ঃ—

কাশীতে বহুকাল হইতে ২৪ পরগণার অন্তর্গত 'কোদালে'-'রাজপুর' গ্রামের বৈদিক-ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বাস করিতেছেন। তাঁহারা কাশীর বাঙ্গালীদের বহুকালাবধি পৌরহিত্য করিয়া ও চতুষ্পাঠী রক্ষা করিয়া অতি পবিত্রভাবে বাঙ্গালীর সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রতিবৎসর তাঁহাদের পরিবার হইতে "কাশীর-পঞ্জিকা" নামে একখানি পঞ্জিকা বাহির হয়। তাহাতে কাশীবাসীর বার ব্রতাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে।

শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ঃ—

কাশীতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়. যোগ-সাধনায় সমাধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'হঠ' ও 'লয়' যোগে সিদ্ধমহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কৃপাতেই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার

সমাধিভাষার্থবোধক অপূর্ব্ব যোগরহস্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দজী, স্বামী প্রণবানন্দজী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বালানন্দস্বামী, সচ্চিদানন্দস্বামী, কামিণী-বাবু প্রভৃতি তাঁহারই কৃপায় যোগোপাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়িবাবুও যোগসাধন পরায়ণ। দোকড়ি-বাবু লাহেড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

বিশ্বাস বংশ ঃ—

কাশীতে চণ্ডীচরণ বিশ্বাস, চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতিরা বহু-কাল হইতে কাশীবাসী ও ইহাঁরা কাশীতে অতি সম্মানী বংশ বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা 'বিজয়নগরমের' রাজার কাশীস্থিত বিষয়ের পরিদর্শক (ম্যানেজার) ছিলেন।

কুচবিহার রাজবংশ ঃ—

কাশীতে কুচবিহারের মহারাজার বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের কালীবাড়ী ও অন্নক্ষেত্র বা অন্নসত্র অতি প্রসিদ্ধ। নিত্য বহু লোক সেই সত্রে ভোজন করিয়া থাকে। দীন দুঃখীর জন্য তাঁহাদের সত্রে যেন অবারিত দ্বার। কাহাকেই অন্নে বঞ্চিত হইয়া কোন দিন ফিরিতে হয় না।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ—

কাশীতে এই বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশও বহু দিন হইতে বাস করিতেছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীর নানা লোকহিতকর কার্য্যে চির দিন অগ্রগণ্য। ইনি অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি।

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী ঃ—

প্রসিদ্ধবাগ্মী ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন

মহাশয় পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যোগাশ্রমের' কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বিবেকানন্দ স্বামী :—

'শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান ভক্ত ও প্রচারক আমেরিকাপ্রত্যাগত বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দজীও কিছু দিন কাশীতে থাকিয়া তাঁহার সাধনা ও প্রচার কার্য্যে রত ছিলেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :—

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ কবিসম্রাট হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে অন্ধ অবস্থায় তাঁহার কাশীবাসী সহোদর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাঁড়ুজ্যে-মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া "চিত্তবিকাশ" নামক শেষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইঞ্জিনিয়র বিপিনবাবু, বাবু অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ওরফে মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জী প্রভৃতি কাশীর মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য-পরিচালনায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের অন্যতম উজ্জল রত্ন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর মহাশয় কাশীধামে দশাশ্বমেধস্থ "শূল-টঙ্কেশ্বরের" প্রাচীন মন্দির-সংলগ্ন সুন্দর সোপান-সমন্বিত ঘাট ও মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া এ দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালীর সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সৎকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষ ব্যবসায়ী নিবারণ চন্দ্র দাস কাশীবাস কালে 'কাশীখণ্ড', 'ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত' ও 'কাশীমাহাত্ম্য' আদি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তিই এক্ষণে রামকৃষ্ণ-মিশনে অর্পিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে কাশীতে দিন দিন বাঙ্গালীর বসবাস দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। সকলের পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব! ভবিষ্যতে এই "কাশীধামের" তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে তাহা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল। কাশীবাসী সহৃদয় পাঠকগণের এই কার্য্যে সাধ্যমত সহায়তা না হইলে, ইহা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য তাঁহারা সতত মনযোগী থাকিবেন ও এই পুস্তকের প্রকাশক মহাশয়ের নিকট যথাসাধ্য উহার উপাদান সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে যত্ন করিবেন।

কাশীতে প্রসিদ্ধ সাধুমহাত্মা :—

ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়-প্রসঙ্গে কাশীর অনেক প্রসিদ্ধ মহাত্মার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে দুই এক জন অসাধারণ মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী :—

সন ১৫২৯ শকাব্দায় মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত 'হোলিয়া' নামক গ্রামে মাদ্রাজী-ব্রাহ্মণ নৃসিংহদেবের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম "শিবরাম"। পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার যত্নে ইনি অল্প বয়সেই সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। মাতার অনুরোধে শিবরাম বিবাহ করিয়া সংসারী হন। মাতার মৃত্যু হইলে আটচল্লিস বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন ও যোগাভ্যাসে রত হন। সেতুবন্ধন-রামেশ্বর হইতে তিব্বত, কৈলাস, মানসরোবর ও নেপাল আদি প্রদেশের তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীধামে আসেন। প্রথমে দশাশ্বমেধঘাটে, পরে পঞ্চগঙ্গাঘাটে নিজ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান

করেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতেই ইনি অনাবৃত গাত্রে অবস্থান করিতেন। উগ্রতপস্যায় ইনি সিদ্ধ ছিলেন। যে যাহা দিত, তাহাই ইনি অবলীলাক্রমে পানাহার করিতেন। দুষ্ট লোক পরীক্ষা করিবার ছলে 'চূণ-গোলা শাদা জল' দুগ্ধ বলিয়া মুখে ধরিলেও ইনি পান করিয়া অনতিবিলম্বে প্রস্রাব করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেন। ইনি গঙ্গার জলের উপর কখন পদ্মাসনে বসিয়া ভাসিয়া যাইতেন, কখন উত্তপ্ত বালির চড়ায় বসিযা থাকিতেন। ইনি সদাই দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিতেন। ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি ইহাঁর অলৌকিক কার্য্য কলাপে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ইনি নির্ব্বিকার ভাবাতীত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। শেষ জীবনে মৌনী হইয়া থাকিতেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত আসন ও দেবী দক্ষিণকালিকা মূর্ত্তি এবং ইহাঁর অবিকল প্রস্তরময়ী নিজ-মূর্ত্তি পঞ্চগঙ্গাঘাটে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাঁর অনুরূপ সিদ্ধ-যোগী আমি আর জীবনে দর্শন করি নাই। ১৮০৯ শকাব্দায় দুই শত আশী বৎসর বয়সে ইনি দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পুর্ব্বে ইহাঁর শরীর কিছু খারাপ হয়। ইহাঁর অলৌকিক জীবনী পাঠ করিলে এখনও চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে এমন অনেক বিষয় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যাহা এখনও কোন গ্রন্থে প্রকাশ হয় নাই। এ পুস্তকে তাহা প্রকাশ করিবার স্থান নাই। সুবিধা হইলে অন্যত্র তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। "মহাবাক্যরত্নাবলী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়া ইনি নিজ সাধনা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ঃ—

সন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাবর্ত্তের কল্যাণী-গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম সঙ্গমলাল এবং মাতার নাম যমুনা দেবী ছিল। অল্প বয়সে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল বংশীধর। চারি বৎসর বয়সে ইনি মাতার নিকট পুস্তক প্রার্থনা করেন। ইহাঁর মাতুল ও আশ্রয় দাতা সবসুখরামজী এক খানি পুস্তক দিলে, ইনি বলিলেন "এ পুস্তক আমার নয়। সে পুস্তক পর্ণকুটীরে আছে।" "কাহার পর্ণকুটীর?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন কোন কথাই ইনি বলিতে পারেন নাই। পরে কল্যাণী হইতে ১০।১১ ক্রোশ দূরে ঔরাং নামক গ্রামে কীর্ণানদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিতে যাইলে, বালক 'বংশী' নিজ মাতুলকে বলেন যে ""ওই পর্ণকুটীরে আমার পুস্তক আছে।" কুটীর মধ্যে তখন এক যোগীপুরুষ অবস্থান করিতেছিলেন, সব-সুখরাম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বালকের কথা নিবেদন করিলে, যোগীবর বিস্মিত হইলেন। যোগীর আদেশে সবসুখরাম বহু অনুসন্ধান করিয়া কুটীরের চালে তালপাতায় লিখিত এক খানি পুরাতন পুথী প্রাপ্ত হইলেন। বংশী তাহা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। এই ব্যাপারে যোগী চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "আমার শ্রীগুরুদেব শেষ অবস্থায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে, আমাকে এই পুথী অনুসন্ধান করিতে বলেন, ইহা পাইলে তিনি সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। এ কথাও তিনি বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তখন ইহা পাওয়া গেল না। সুতরাং গুরুদেব জীবনে হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেহ-ত্যাগ করেন। এই বালকের কার্য্য-কলাপে বোধ হইতেছে, ইনি

পূর্ব্বজন্মে আমার গুরুদেব ছিলেন, সেই স্মৃতি এখনও ইহাঁর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন।" বালকের জন্মাবধি মৃগী-রোগ ছিল, এই পুস্তক পাইয়াই ইনি সেই রোগ হইতে মুক্ত হন।

বংশীধর যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। তের বৎসর বয়সেই ইনি ফার্সি ও মহারাষ্ট্র ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ষোল বৎসর বয়সে অশ্বারোহন ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া নবাব-সরকারের অশ্বশাসনে নিযুক্ত হন। কিন্তু একটী অশ্ব অল্প দিনের মধ্যেই মারা যাওয়াতে নবাব কর্ত্তৃক ইনি কারারুদ্ধ হন। কারামুক্ত হইলে, সংসারে বিতশ্রদ্ধ হইয়া নাসিকক্ষেত্রে আসিয়া ১৭ বৎসর বয়সে এক ব্রাহ্মণের নিকট ব্রহ্মচার্য্য গ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বরের মন্দিরে 'শিব-পঞ্চাক্ষর' মন্ত্র জপ-পুরশ্চরণ করিলে, ইঁহার কামনা পূর্ণ হয়। পরে নানা তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া হৃষীকেশে গোবিন্দস্বামীর নিকট পনের বৎসরকাল কঠোর যোগভ্যাসে রত থাকেন। অনন্তর কাশীধামে আসিয়া গৌড়-স্বামীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী' নামে পরিচিত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গৌড় স্বামী ব্রহ্মীভূত হইলে, ইনি গুরুর আসনে অভিষিক্ত হন। বেদান্তাদি সর্ব্বদর্শনে এত দূর অভিজ্ঞ ছিলেন যে, তখন ভারতে ইহাঁর তুল্য দার্শনিক সাধু আর কেহই ছিলেন না, এমন কি ইহাঁর জীবদ্দশার মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির শিক্ষিত জগদ্‌গুরুগণও তাঁহার সহিত শাস্ত্রার্থের বিচারে অসমর্থ বোধে কাশীধামে আসিতেন না। জার্ম্মাণ ও ফ্রান্স আদি পাশ্চাত্য প্রদেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণও সময় সময়

ইহাঁর দার্শনিক-মীমাংসা শুনিবার জন্য দর্শন করিতেন। ইনি ৯৩ বৎসর বয়সে ইং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যোগাসনে বসিয়া ব্রহ্মীভূত হন। ইহাঁর স্মৃতি-সম্মাণের জন্য ইহাঁর ভক্তমণ্ডলী কাশী ও অন্যান্য স্থলে স্বামীজীর নামে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী ঃ—

সন ১৮৯০ সম্বতে মিশ্রীলাল মিশ্র নামক এক সাম-বেদীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের ঔরসে মহাত্মা ভাস্করানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম 'মতিরাম'। অষ্টম বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার হইলে, গুরুগৃহে থাকিয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষে ইহাঁর বিবাহ হয়। সপ্তদশ বর্ষে একটী পুত্র সন্তান হইলে, শৈশবেই পুত্রটী কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহাতে মতিরাম অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়েন। ক্রমে ইহাঁর বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীতে আসিয়া গুরুর নিকট যোগভ্যাস করেন। অনন্তর শাত বৎসর গুজরাট মালব দেশে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পুনরায় উজ্জয়িনীতে আসিয়া সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী ভাস্করানন্দ নামে পরিচিত হন। কিছু দিন কাশীধামে দুর্গাবাড়ী-সন্নিহিত আনন্দবাগের আশ্রমে অবস্থান করিয়া কাণপুরে নিজ জন্মভূমি দর্শন করিতে যান। অনন্তর ইনি কৌপিনমাত্র পরিধান করিয়াই ভারতের সকল তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক ১৯২৫ সম্বতে পুনরায় কাশীতে সেই আনন্দবাগ-আশ্রমে আসিয়া দিগম্বররূপে বা নগ্নভাবে অবস্থান করিতেন। ইহাঁকে দর্শন করিবার জন্য কেবল ভারতের হিন্দু নহে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতেও বহু লোকের সমাগম

হইত। ইহাঁর অলৌকিক বিভূতি সময় সময় আপনাপনি প্রকাশ হইয়া পড়িত। ইহাঁর ভক্ত ও শিষ্যের সংখ্যা ছিলনা। ১০৫৬ সম্বতে ৬৬ বৎসর বয়সে ইনি সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। ইঁহার দেহ গঙ্গায় স্নান করাইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত টাকা বা সিন্দুকে ভরিয়া উক্ত আনন্দবাগ আশ্রমেই সমাহিত করা হয়। কাণপুর-বাসী ইহাঁর এক ভক্ত গয়াপ্রসাদজী এক লক্ষ টাকা দিয়া ইহাঁর সমাধি-মন্দির ও ইহাঁর স্মৃতি-সম্মার্থে "ভাস্করানন্দ-সংস্কৃত-পাঠশালা" প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইনি 'স্বারাজ্য-সিদ্ধি' নামক প্রাচীন গ্রন্থের অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যা ও টীকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

ভাস্বুরানন্দ স্বামী ঃ—

প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমৎ ভাস্বুরানন্দজী মহারাজ কাশীর পঞ্চগঙ্গাঘাটের নিকট বালাজীঘাটের উপর বালাজীর মন্দিরের নিম্নে একটী 'চক্রেশ' বা চক্রেশ্বর-মহাদেব স্থাপনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত মহাদেব পাতালে-শ্বর বলিয়াও অভিহিত। ইনি গম্ভীররায় দীক্ষিত ভারতীর পুত্র, প্রথমে শ্রীভাস্কররায় মহারাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বোম্বাই প্রান্তান্তর্গত সুরত-নিবাসী নৃসিংহ যজ্ঞাগুলের শিষ্য। শিবদত্ত শুক্লজী মহারাজ ইহাঁর পূর্ণাভিষেকাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। দীক্ষাভিষেকের সময় ইনি 'ভাস্করানন্দ' বা 'ভাস্বুরানন্দ বলিয়া পরিচিত হন। গুরুদেব কেবল 'ভাস্বুর' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি বামাচারী সিদ্ধ-সাধক ছিলেন। ইহার রচিত "সৌভাগ্য-ভাস্কর" নামক 'ললিতা-সহস্রনামের' ভাষ্য অসাধারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শস্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতশূন্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বক্ষাণ্ড-

পুরাণের উত্তর খণ্ডে "অগস্ত হয়গ্রীবসংবাদাত্মক" ললিতাদেবীর সেই সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। ইনি যখন কাশীবাস করিতেন, তখন ইহাঁর তুল্য দৈবীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সিদ্ধ-সাধক দ্বিতীয় ছিল না। কাশীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সাধু-সজ্জনগণ ইহাঁর বামাচার-সাধনার একান্ত বিরোধী ছিলেন। ইনি তাহাতে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না। বরং এক সময় ইনি কাশীর মধ্যস্থলেই প্রকাশ্য-পথের উপর বামাচার-বিধানানুগত-তত্ত্বসমূহের সমাবেশ করিয়া প্রকাশ্যভাবে নিজ অনুষ্ঠান করিবেন, এই বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়া দেন এবং কাশীবাসী পণ্ডিত ও সাধুমণ্ডলীকে তাঁহার কর্ম্মের প্রতিবাদ-মূলক শাস্ত্রার্থ করিতে আহ্বান করেন। কাশীর পণ্ডিত ও সাধুসমাজ তখন কাশীর সর্ব্বপ্রধান সিদ্ধ-সাধক দণ্ডী কুঙ্কুমানন্দ স্বামীজীকে সাধ্য সাধনা করিয়া সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করেন। স্বামীজী ভাস্বরানন্দ মহারাজের সাধনা ও সিদ্ধি অবগত হইয়া সেই সকল পণ্ডিত ও সাধুদের বলেন যে, তোমরা ইহাঁর বৃথা বিরুদ্ধাচরণ করিও না, ইনি মহাপুরুষ। তথাপি তাঁহাদের অনুরোধে তিনি ভাস্বরানন্দ মহারাজকে বলেন, "চতুঃষষ্ঠী-দেবীদের বর্ণনা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, আপনি তাহা বর্ণন করুন।" ভাস্বরানন্দ তখন বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে কেহ লিখিতে আরম্ভ করুন, আমি তাঁহাদের বর্ণনা করিতেছি।" তখন ইনি অনর্গলভাবে চতুঃষষ্ঠী-দেবীগণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন, একজন তাহা দ্রুত লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুঙ্কুমানন্দ স্বামীজী সেই অপূর্ব্ব বর্ণনা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন, পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অধিকতর চমৎকৃত হইয়া সমাগত সেই সাধু

ও পণ্ডিতগণকে বলিলেন—"তোমরা কি কিছু দেখিতে পাইতেছ?" তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"কৈ কিছুইত দেখিতে পাইতেছি না।" তখন স্বামীজী পুনরায় বলিলেন—"দেখিতেছ না—ভগবতী স্বয়ং ভাস্বরানন্দের স্কন্ধে অবস্থিতা হইয়া এই সব বর্ণনা করিতেছেন?" তাঁহারা দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া স্বামীজীর চরণে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও দেবী-দর্শনের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ভাস্বরানন্দের দ্বারা তাঁহাদের মস্তকে ঘটস্থিত সিদ্ধকারণ-বারিসহযোগে অভিষিক্ত করাইয়া দিলে, তাঁহারা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিয়া পুলকিত হইলেন ও ভাস্বরানন্দজীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই অবধি কাশীবাসী সকলেই ইহাঁর পরম ভক্ত হইয়া যাইলেন।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী :—

ইনিও একজন বাঙ্গালী সিদ্ধ-সাধক, বীরাচারী সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন। এখনও কাশীতে ইহাঁর বহু শিষ্য বিদ্যমান আছেন। এক সময় ইনি কেদারঘাটের উপর বসিয়া জগন্মাতার চরণ চিন্তা করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ হইতে আর কাহারও নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিব না ও কোথাও নড়িবও না। সেই সময় ইহাঁর পরিচিত আর একটী সাধুও কিছু দূরে তাঁহারই ন্যায় ভগবতীর চিন্তায় নিরত হইয়া বসিয়া রহিলেন। দুই দিন দুই রাত্রি অতীত হইল, ইহাঁরা অনাহারেই অতিবাহিত করিলেন, কেহই ইহাঁদের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি-পাতও করিলেন না। তৃতীয় দিবসের মধ্য-রাত্রিতে যখন ঘাটে

লোক জন প্রায় নাই, তখন এক মাতাজী ধীরে ধীরে পূর্ণানন্দ স্বামীজীর নিকট আসিয়া ইহঁাকে কিছু অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন—"মা আমার জন্য ত অন্ন দিয়া যাইতেছ, ওই সাধুটীও যে অভুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, উহাকেও কিছু দাও।" মাতা তখন বলিলেন—"বাবা পূর্ণানন্দ, তুই সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, তাই তোকেই আহার্য্য দিলাম, ও'র কৌপিনে যে তিন খানা গিনি বাঁধা আছে।" এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি চলিয়া গেলেন। তখন স্বামীজীর মনে যাহা উদয় হইল, তাহা অবর্ণনীয়। ইনি পর দিবস বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলেন, পূর্ব্ব দিবসে যে যে ব্যঞ্জন আদি দ্বারা মাতাজী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার ভোগ হইয়াছিল, ঠিক সেই সেই দ্রব্যই পূর্ণানন্দ-স্বামীজী গত রাত্রিতে প্রসাদরূপে পাইয়াছিলেন। সেই মাতাই যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা তাহাতে আর ইহঁার সন্দেহ থাকিল না।

কাশীতে আজকাল সাধু-সন্ন্যাসীর অভাব নাই। পথে ঘাটে মঠে মন্দিরে সর্ব্বত্রই সাধু, ব্রহ্মচারী, অবধূত ও পরমহংস আদিতে যেন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই কাশীবাসীদিগের মধ্যে একটী হিন্দী প্রবচন প্রচলিত আছে যে,—

"রাঁড় যাঁড় সিঁড়ি সন্ন্যাসী ইস্‌সে বাচে ত সেবে কাশী"।

বাস্তবিক কালধর্ম্ম প্রভাবে কাশীর আধুনিক অবস্থা এইরূপই শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। যথার্থ কর্ম্মী ত্যাগী ও জ্ঞানোন্নত সাধু-সজ্জনের প্রভাব আর প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। তবে সেরূপ মহাপুরুষ যে, কাশীতে আর নাই, তাহাও নহে। ভক্তের একান্ত ইচ্ছা হইলে, তাঁহারা কাহাকেও কাহাকেও সময়ে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সাধু দেখিয়া চিনিয়া

লওয়াও যা'র তা'র কর্ম্ম নহে। পূর্ব্বজন্মের তেমন উন্নত প্রারব্ধ থাকাও চাই।

কাশীতে এখনও অশি-প্রান্তে, বরণাতটে ও সহরের অপেক্ষাকৃত শান্তিময় অংশে কেহ কেহ অবস্থান করিয়া ভগবান বিশ্বেশ্বরের এই কৈলাসসম পবিত্র পুরীর সম্মান ও মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের নাম প্রচার করা অসম্ভব। ভক্তিমান্ ব্যক্তি সাধু-দর্শনের দৃঢ় ইচ্ছা পরিপুষ্ট হইয়া অতি দীন ও কাতর অন্তরে অন্বেষণ করিলে, অবশ্যই সময়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

কাশীর বাণিজ্য ও বাজার ঃ—

এ সম্বন্ধেও এই স্থলে কিছু বলা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথমেই কাশীর 'দশাশ্বমেধের বাজার' উল্লেখযোগ্য, ইহাই এক্ষণে যেন কাশীর কেন্দ্রস্থল। কারণ বাঙ্গালীটোলার সম্মুখে বিশেষ বাঙ্গালী প্রভৃতি শিক্ষিত সকলেরই আবশ্যকীয় সর্ব্ববিধ সামগ্রীই এখানে পাওয়া যায়। চাল, ডাল, তরি তরকারি, আমিষাদি বস্তুসমূহ দুধ, ঘি, মোণ্ডা-মিঠাই, কাপড়-চোপর, কাগজ, কলম, পুস্তক, সংবাদপত্র, খেলেনাদি সখের জিনিস, এমন কি সকল প্রকার স্বদেশী দ্রব্যও এখানে সমস্তই পাওয়া যায়। ডাক্তার, বৈদ্য, ঔষধ তাহাও এখানে অনায়াসলভ্য। বিশ্বনাথের গলিতে খেলেনা ও বাসনপত্র আদি যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। কাশীর নানা স্থানে খাবারের দোকান আছে, তবে বিশ্বনাথ মন্দিরের পূর্ব্বে ও উত্তরে 'কচুরি-গলির' দেশীয় হালুয়াইদের এবং কালীতলার বাঙ্গালী ময়রাদের খাবারই প্রসিদ্ধ, কচুরিগলিতে সকল রকম খাবার, চাট্‌নি ও মেওয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঙ্গালী-টোলায় ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া আদি বাঙ্গালীপসন্দ

বেশ ভাল ভাল খাবাব পাওয়া যায়। কচুরি-গলির পশ্চিমদিকে বিস্তৃত রাজপথের উপর 'চক্-বাজার', এখানেও নানাবিধ মনোহারি জিনিসপত্র, ফল, মেওয়া, সুরতী তামাক আদি পাওয়া যায়। তাহারও পশ্চিমে 'দালকামণ্ডীর' ও 'নারিয়েলটোলার' রাস্তা। এখানেও তামাক, সুরতি, নস্য, হুঁকা ও আরও কিয়দ্দূর পশ্চিমে গলির মধ্যে কাচের জিনিস পত্র—ঝাড়, লণ্ঠন, চিম্‌নি আদি যথেষ্ট বিক্রয় হয়। কচুরি-গলি বা উক্ত চক্-বাজারের পূর্ব্বদিকে 'লক্ষ্মী-চৌতারা' ও বাণীকুঁয়া প্রভৃতি স্থানে বেনারসী সাড়ী, দোপাট্টা, কম্বল, লুই, শাল, আলোয়ান আদির আড়ৎ। কিন্তু এ সকল স্থানে নিজে কোন দ্রব্য খরিদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চতুর্দ্দিকে এত প্রচ্ছন্ন এ-দেশীয় দালাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যে, কোন খরিদ্দারই তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। তাহারা খরিদ্দার বা দোকানদারকে মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলে না, কেবল পিছু পিছু গিয়া দাঁড়ায়। কেহ বা দোকানদারকে বলিল, 'জয়রাম' বা 'জয় সীতারাম', কেহ হয়ত বলিল—"ম্যাঁয় এক কোণেমে খড়া হুঁ"। এই সবই তাহাদের সাঁট বা সঙ্কেত, যেমন 'এক কোণে খাড়ার অর্থ—বিক্রয়ের এক কাণা বা চতুর্থাংশ 'কমিশন' অর্থাৎ দালালি চাই ইত্যাদি। কেহ কোন দ্রব্য খরিদ করিলেই, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দালালী দোকানদার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সময় ও অবস্থা বোধে কখন কখন খরিদ্দারকে এক টাকার জিনিস পাঁচ সিকায়, দেড় টাকাতে বা তাহার দ্বিগুণ মূল্যেও খরিদ করিতে হয়। সুতরাং কাশীবাসী কোন পরিচিতের দ্বারা বা কাশীর কোন প্রসিদ্ধ দোকানের সহায়তায় মূল্যবান জিনিস সমূহ ক্রয় করাই সুবিধাজনক। তাহাতে কাহাকেও তেমন ঠকিতে হইবে না।

উক্ত চকের আরও উত্তরে যাইলে 'ঠাটেরী বাজার'। এখানে পিতল, কাঁসা ও জর্ম্মান-সিলভারের বিবিধ বাসনের বাজার। কাশী বহুদিন হইতে ধাতুশিল্প ও বেনারসীসাড়ী প্রভৃতির জন্যও প্রসিদ্ধ। 'ধনতেরস্' বা দেওয়ালীর সময় ত্রয়োদশীর রাত্রিতে এখানে বাসনের বিরাট প্রদর্শনী হয়।

এতদ্ব্যতীত 'বিশ্বেশ্বরগঞ্জ' ডাল, চাল, আটা, ঘি প্রভৃতির বড় বাজার বড় আড়ৎ, খজুয়ার বাজারও ঐরূপ আড়তের জন্য প্রসিদ্ধ। 'দীনানাথের গলী' কেবল বেণেমশলার আড়ৎ। 'চেৎগঞ্জ' প্রভৃতিও কাশীর উল্লেখযোগ্য স্থান। কেণ্টনমেণ্টের নিকটেও অনেক বড় বড় দোকান আছে। তাহাতে ইংরাজপছন্দ দ্রব্যই বিক্রয় হয়।

কাশীদর্শনে ব্যয় :—

কলিকাতা হইতে 'কাশী'-ষ্টেশন 'বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট' ষ্টেশন পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ গাড়ীতে ভাড়া ৭৶১০, ডাকগাড়ীতে ১০।১০, মধ্যম শ্রেণীর সাধারণ গাড়ীতে ১০।১০, ডাকগাড়ীতে ১৩৶১০ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২৪৸৵১০। শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই রেলের ভাড়া আরও কম হইবে। পূজার সময় ও কখন কখন অন্যান্য বিশেষ কারণে মধ্যম শ্রেণীতে, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য রেল-কর্ত্তৃকপক্ষগণকর্ত্তৃক যাতায়াতের অল্প ভাড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আরও শুনা যাইতেছে, কাশী পর্য্যন্ত 'উইকেণ্ড' টিকিটেরও শীঘ্র ব্যবস্থা হইবে। অনেকে এইরূপ অবসরেই কাশী-দর্শনে বহির্গত হন।

কাশীতে দুইটী ষ্টেশন আছে, 'কাশী' ও 'বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট'। কাশী অপেক্ষা ক্যাণ্টনমেণ্ট-ষ্টেশনেই নামা বা উঠায় সাধারণের সুবিধা অধিক, কারণ এখানে গাড়ী অপেক্ষাকৃত

অধিকক্ষণ দাঁড়ায়। তবে যাহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন অথবা অধিক জিনিস পত্র নাই, তাঁহারা কাশী-ষ্টেসনেই নামিতে বা উঠিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত 'বেনারসসিটী' নামে বি,. এন, ডবলিউ, আর, (ছোট লাইনের) আর একটী ষ্টেসন আছে।

এই সকল ষ্টেশন হইতে সহরের ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া ৸৹ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু, অধিক যাত্রীর সমাগম হইলে, কখন কখন ১৷৷৹ টাকা ও ২৲ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

একা ভাড়া সাধারণতঃ সহর পর্য্যন্ত ৵৹ হইতে ।৵৹ ছয় আনা মাত্র। তবে সময় সময় কিছু অধিক দিতে হয়।

অনেকে কাশী ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া সহরে আসেন, কিন্তু তাহাতে আসিতে কিছু বিলম্বও হয়, অথচ ভাড়াও ।৹ আনা হইতে ৷৷৹ আট আনার কমে হয় না। তবে ঘাটের ধারে যাঁহাদের নামিতে হইবে, তাঁহাদের পক্ষে নৌকাতে আসাই ভাল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাশীতে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাদি দর্শনের জন্য বা পূজা-অর্চ্চনার জন্য বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই দিতে পারেন। অথবা না দিলেও কেহ কিছু পীড়ন করে না। তবে নূতন যাত্রী দেখিলে 'যাত্রা-ওয়ালা' ব্রাহ্মণগণ অযথা বিরক্ত করিয়া থাকে। এখানে মণি-কর্ণিকাকুণ্ডে স্নান করিলে ও যাত্রাওয়ালারা সমস্ত দেখাইয়া দিলে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ১।৹ পাঁচ সিকা করিয়া তাহাদিগকে দিতে হয়। সধবা-পূজা, কুমারী-পূজা, চণ্ডীপাঠ, সাধু দণ্ডী-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতির জন্য যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমনি ব্যয় করিতে পারেন। তবে কাশীতে কোন পরিচিত লোক থাকিলে, এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কোন কারণই থাকে না। নতুবা

প্রসিদ্ধ ও সজ্জন পাণ্ডার বাটিতে উঠিলেও কাহাকে বিশেষ বিড়ম্বিত হইতে হয় না।

কাশীতে কিছুদিন থাকিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যদি তাহা না করা হয়, তবে আজকাল এখানে কয়েকটী বাঙ্গালার হোটেল হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে। দশাশ্বমেধের নিকট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই তাহা বলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে দুই বেলা আহারাদির ব্যয় সাধারণতঃ ।৵০ বা ॥০ আনা পড়িতে পারে। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরেও যে কোন ভক্ত ইচ্ছা করিলে মধ্যাহ্নে মায়ের প্রসাদ পাইতে পারেন, তবে পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ ভোগের পূর্ব্বেই মহান্তজীর নিকট তাহার সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। সেই সময় প্রত্যেক কাশীবাসীর জন্য ।৵১০ এবং নবাগত যাত্রীর জন্য ॥১০ করিয়া জমা দিতে হয়। হোটেলে ঘর ভাড়া দুই এক দিনের জন্য প্রত্যহ ।০ আনা হইতে সময় সময় ১৲ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। মাসিক ৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে স্বতন্ত্র ছোট ছোট বাটী বা কোন বাটীর অংশ ভাড়া পাওয়া যায়। কাশীর 'ঘণ্টা হিসাবে' গাড়ী ভাড়া প্রায় কলিকাতার অনুরূপ। গোধুলিয়ার নিকট গাড়ির আড্ডায় 'মিউনিসিপাল-বোর্ডে' তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। 'নিত্য-যাত্রা' ও 'পঞ্চক্রোশী-যাত্রা' এ সকল বিষয় শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী-সঙ্কলিত "কাশী-মাহাত্ম্যে" বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে বিশ্বনাথের 'আরতি-স্তোত্র' প্রভৃতি অনেকগুলি স্তবও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক কাশী-যাত্রীরই তাহাও এক এক খানি সংগ্রহ করা আবশ্যক। কাশীর প্রসিদ্ধ পাণ্ডাদিগের নিকট এবং দশাশ্বমেধের

দোকানে তাহা পাওয়া যায়। পঞ্চক্রোশী-যাত্রার ব্যয় সর্ব্ব সমেৎ ১০৲।১৫৲ টাকার অধিক পড়ে না। পাঁচ দিনে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। এ সকল বিষয় পাণ্ডা বা যাত্রাওয়ালা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

বিদেশে সর্ব্বদা স্নানাহারের অনিয়মে অনেকেই সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে সহযাত্রীগণ নিতান্ত বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের খুব ধীর ভাবে সুনিয়মে অবস্থান করা বিধেয়। তবে কাশীতে সহসা অসুখ বিসুখ, হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দশাশ্বমেধের নিকট ডাক্তার বৈদ্য ও ঔষধালয়ের অভাব নাই। অনেকেই বেশ সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক। এখানের খ্যাতনামা ডাক্তার অমরনাথ, যদুনাথ গাঙ্গুলী, তৃষিত-বাবু, ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস কবিরাজ, প্রকাশ নাথ হালদার, শরৎ বাবু, কালী বাবু প্রভৃতি অনেকে বিশেষ যত্ন করিয়া সকলের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

কাশীযাত্রীদিগের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে সমস্তই এক প্রকার বলা হইল। অন্যান্য বিষয় কাশীতে আসিলেই সহজে সকলের পরিজ্ঞাত হইবে।

জয় বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার জয়, জয় বিশালাক্ষী, কাশী-
কোতোয়াল কালভৈরবের জয়, জয় কাশীতল-
বাহিনী গঙ্গা-মণিকর্ণিকার জয়।

ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

সমাপ্ত।

এবং চিত্তাকর্ষক।" (সাহিত্য-সংবাদ)—" ***ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতূহল-প্রদ।"*** (ব্রহ্মবিদ্যা)—"যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্যলিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না।***" ("THE BENGALI," 23-1-12)—"The book is full of valuable information about the sacred city—information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus." ("INDIAN DAILY NEWS." 10-9-12.)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that holy city." ("AMRITA BAZAR PATRIKA." 7-10-12)—"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various religious sects with their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest

have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the general get-up of the book excellent.*** ("THE TELEGRAPH.")—"**A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical, we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute descriptions and accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tires the patience of readers; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

বর্ণ-চিত্রণ—পেণ্টিং বা চিত্র-শিল্প-বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সাহিত্যের ন্যায়ই সকলের পাঠ্য।

ইহাও উক্ত আচার্য্য-প্রবর প্রবীন সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব প্রণীত একখানি অসাধারণ পুস্তক। মূল্য—বিলাতি বাঁধাই ১৲ এক টাকা মাত্র।

'বর্ণ-চিত্রণ' সম্বন্ধে কতিপয় সংক্ষিপ্ত অভিমত :—

(বঙ্গবাসী)—"কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে গ্রন্থ রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তীমহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উক্ত শক্তি দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। ... চিত্রবিদ্যায়

যাঁহাদের ঝোঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইবেই, সাহিত্য হিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরণীয়। এক কথায় বলি, 'বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ নাই' বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।" **(ব্যবসায়ী)**—"যাঁহারা চিত্রকলা-বিদ্যার অনুরাগী, তাঁহাদের সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।" **(এডুকেশন-গেজেট)**—"এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। ***গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক **।" **(সাহিত্য-সংবাদ)**—"***গ্রন্থখানিকে 'প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন।***" ("THE TELEGRAPH.")—"***The learned author has very elaborately dwelt upon the various stages of the art of painting as they ar being studied and taught in the Western countries dealing incidentally with the ancient art of painting in India which though now forgotten for want of culture is not exactly dead. Which is sure to be of invaluable help to learners as well as teachers. It is also sure to awaken an interest in the public mind in a subject which has hitherto remained dark for want of culture.***"

চিত্রবিজ্ঞান—রেখাঙ্কন বা 'ড্রয়িং' বিদ্যার ধারাবাহিক

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। ইহাও উক্ত আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিত্মার্ণব মহাশয় প্রণীত। ড্রয়িং আদি প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষার্থীর অতি অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

আলোকচিত্রণ—বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা (৫ম সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যকলাবিত্মার্ণব মহাশয় প্রণীত। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে ভারতের অধিকাংশ ফটোশিল্পীই এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

আলোকচিত্রণ সম্বন্ধে কতিপয় অভিমতঃ—

(**হিতবাদী**)—"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। *** "শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযুক্ত।" (**বঙ্গবাসী**)—"যাঁহারা ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী।" (**সময়**)—"এ শ্রেণীর পুস্তক এই নূতন।" (**বান্ধব**)—"***চক্রবর্ত্তী মহাশয় একই আধারে বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সুতরাং সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই সাদরপূজাস্পদ সুহৃৎ। এদেশে, ইদানীং বাঙ্গালীর জাতীয়-সাহিত্যের একটী বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্ম-শিল্পীরা 'আলোক চিত্রণ' প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা সূক্ষ্মশিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সে প্রতিমার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে।"

ছায়াবিজ্ঞান—ফটোগ্রাফি-শিক্ষার ২য় পুস্তক। ৪র্থ সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত

হইয়াছে। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত। আলোকচিত্রণে যে সকল বিষয় নাই, ছায়াবিজ্ঞানে তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ফটো-শিক্ষার্থীর ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

ঠাকুরমা—"ইহাও সাহিত্যকলাবিত্থার্ণব চক্রবর্ত্তীমহাশয় প্রণীত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক অতি উপাদেয় উপহার পুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য-বিলাতি বাঁধাই ৷৷০ আট আনা মাত্র।

ঠাকুরমা সম্বন্ধে কতিপয় সংক্ষিপ্ত অভিমত:—

(বঙ্গবাসী)—"গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙ্গালী পাঠক ইঁহার লিপিপটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের রচনায় ইঁহার শিল্প-নৈপুণ্য উজ্জ্বল। এখনকার অনেক মেয়ে, শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে, পরন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে বিগড়াইয়া যায়। ঠাকুরমার শিক্ষাপ্রভাব কমিতেছে, পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ বাড়িতেছে; কাজেই এখনকার মেয়েরা সেই হাওয়ায় উপদেবতাগ্রস্ত হইতেছে। চক্রবর্ত্তীমহাশয়, তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে, এই 'ঠাকুরমা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতিনীর কথোপকথন। ঠাকুরমা বেশ সোজা সরল ভাষায় নাতিনীকে গৃহস্থালীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি শিখাইয়া দিতেছেন। ***এই সব বিষয়ের রচনা পড়িতে পড়িতে লিপিমাধুর্য্যে মনে হয়, যেন উপন্যাস। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ। এ গ্রন্থ সাদরে পাঠ্য।" **(সময়)**—পুস্তকখানি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। শুধু শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই যে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তকখানি সুলিখিতও বটে। বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও

প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারে স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিতে পারে সংসার অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে *।"

(কাজের লোক)—"একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দুস্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রসূতি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটীই বাদ পড়ে নাই। "ঠাকুরমা" আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকা স্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ***"ঠাকুরমা" অত্যাবশ্যকীয় উচ্চ শ্রেনীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

('THE TELEGRAPH.')—"***We would highly recommend this book to the powers that be to select it for a text-book in all Hindu Girls' Schools in the Province." ('THE INDIAN STUDENT.')—"***It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended."

প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

সাধন বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী।

মন্ত্রাদি চতুর্ব্বিধ যোগ-তন্ত্র ও সাধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ সরল ও উপাদেয় পুস্তকাবলী ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয় নাই। সাধনার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহ যাহা তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই, তাহারই গূঢ় আভাষ এই সমস্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধক-সমাজে উচ্চভাবে প্রশংসিত।

সাধনপ্রদীপ—[সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। তৃতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

মহান্ উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণের উপযোগীরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক; নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্ত্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার শক্তি অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।"

পূজ্যপাদ উক্ত স্বামীজী মহারাজের প্রণীত নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

গুরুপ্রদীপ—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' (২য় খণ্ড)] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার বিধান ও গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺তারা-দেবীর স্বরঞ্জিত চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ)—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' (৩য় খণ্ড)] পঞ্চদেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। 'সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা,' 'যোগসমাহার,' 'মন্ত্রযোগ,' 'হঠযোগ,' 'লয়যোগ,' 'রাজযোগ,' 'পূর্ণদীক্ষাদি' ও 'বৈরাগ্য' সম্বন্ধে এরূপ সরল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। "তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির-প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।"

জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগ)—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য', (৩য় খণ্ড)] ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রণব-চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। 'বিরজা-সংস্কার ও অন্তিম-দীক্ষা,' 'সন্ন্যাসাশ্রম,' 'সন্ন্যাসীর ভেদ,' 'মঠাম্নায়রহস্য,' 'দর্শন-সমন্বয়,' 'সৃষ্টি-রহস্য,' 'আত্মতত্ত্বাদি-রহস্য,' 'প্রণব-রহস্য, 'মহাবাক্য' ও 'মুক্তিতত্ত্ব-রহস্যাদি'সহ জ্ঞান ও মুক্তির উপায়সম্বন্ধে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সন্ধ্যারহস্য বা (সন্ধ্যাপ্রদীপ)। ইহা প্রত্যেক দ্বিজ-কুমারেরই অবশ্যপাঠ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ মূল্য।/০ পাঁচ আনা মাত্র।